পথিকৃৎ

সাংস্কৃতিক দ্বিমাসিক

আগস্ট ২০২১

পথিকৃৎ

৮৮বি বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১২

পথিকৃৎ

সাংস্কৃতিক দ্বিমাসিক □ আগস্ট ২০২১

□ সম্পাদকীয় ৫

□ শ্রদ্ধার্ঘ : কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

□ ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন : বামপন্থা ও নৈতিকতা
— শিবদাস ঘোষ ৭

□ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি
— মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ৯

□ শরৎচন্দ্র ও তাঁর 'পথের দাবী' : কিছু চিন্তা, কিছু জিজ্ঞাসা ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা — চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য ১৯

□ সার্ধ-দ্বিশত জন্মবর্ষে রামমোহন — সুব্রত গৌড়ী ৩৩

□ প্যারি কমিউন : সার্ধশত বর্ষপূর্তি — মৃদুল দাস ৬৫

□ ভিক্টর হুগোর কবিতা 'ব্যারিকেড' — অনুবাদ : পার্থ মুখার্জি ৭৭

□ শতবর্ষে 'অভাগীর স্বর্গ' — অনিন্দিতা জানা ৮৮

□ 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের শতবর্ষ (প্রতিবেদন) ৮৯

□ প্রসঙ্গ : সিনেম্যাটোগ্রাফ আইন সংশোধন (প্রতিবেদন) ৯৩

□ প্রয়াত কবি শঙ্খ ঘোষ — সংঘমিত্রা চট্টোপাধ্যায় ৯৯

□ গল্প :
লকডাউন ও দুই চোর — চঞ্চল ঘোষ ১০২
হিয়ার মাঝে — নিশাস্মৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৬

সাতান্ন বর্ষ □ প্রথম সংখ্যা
শ্রাবণ ১৪২৮ □ আগস্ট ২০২১

প্রচ্ছদ চিত্র : **দানিশ সিদ্দিকী**

সম্পাদক : **মানিক মুখোপাধ্যায়**

পথিকৃৎ
৮৮বি বিপিন বিহারি গাঙ্গুলী স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১২
e-mail : pathikritpatrika@gmail.com

দাম : পঞ্চাশ টাকা

পথিকৃৎ

সাংস্কৃতিক দ্বি-মাসিক

- ☐ জীবন তথা সমাজ সম্পর্কে যে-কোনও মননশীল লেখা পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
- ☐ পথিকৃৎ-এ লেখা মনোনয়নের মাপকাঠি লেখা— লেখক নয়।
- ☐ বিভিন্ন বক্তব্য সম্পর্কে পাঠকের যুক্তিগ্রাহ্য মতামত, বিরোধী হলেও, ছাপানো হয়।
- ☐ অনুলিপি রেখে লেখা পাঠাতে ও লেখার সঙ্গে লেখকের ঠিকানা, ফোন ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
- ☐ রচনা মনোনয়ন সম্পর্কে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বিজ্ঞপ্তি (আগস্ট ২০২১)

পথিকৃৎ পত্রিকার উদ্যোগে ‘দ্য গোল্ডেন বুক অফ বিদ্যাসাগর’ পুনর্মুদ্রণের কাজ চলছে।

জুলাই ২০২০ সময়সীমার মধ্যে সে কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা থাকলেও

কোভিড-উনিশজনিত দীর্ঘ লকডাউনের কারণে তা হয়ে উঠতে পারেনি।

পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেই উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ গ্রাহকদের অবশ্যই জানানো হবে।

এক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

—পথিকৃৎ

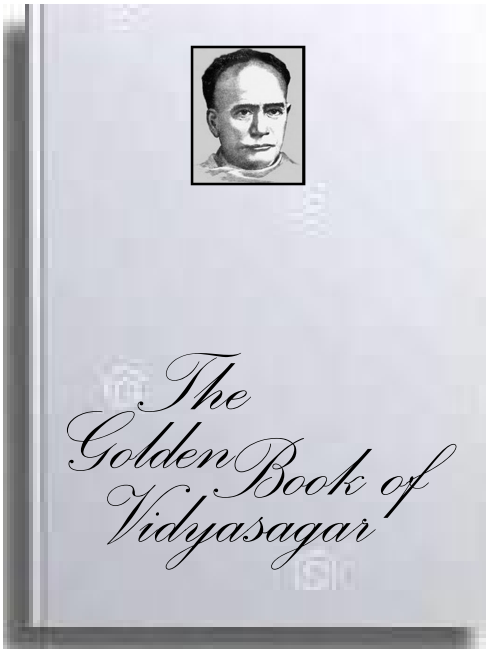

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'দ্য গোল্ডেন বুক অফ বিদ্যাসাগর' পুনর্মুদ্রণের কাজ চলছে।

১৯৯৩ সালে 'অল বেঙ্গল বিদ্যাসাগর ডেথ সেন্টেনারি কমিটি'র পক্ষ থেকে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছিল। অনেকদিন আগেই গ্রন্থটির সমস্ত কপি নিঃশেষিত হয়ে যায়। তারপর থেকে আজও অনেকে সেটি সংগ্রহ করার জন্য খোঁজ করেন। মূলত সেই অভাব পূরণের উদ্দেশেই এই উদ্যোগ। আগ্রহী সকলের সহযোগিতা, পরামর্শ একান্ত ভাবে কাম্য। করোনা পরিস্থিতি এবং অনিবার্য কয়েকটি কারণে এই গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

ধন্যবাদান্তে,
মানিক মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, পথিকৃৎ
মুখ্য সম্পাদক, দ্য গোল্ডেন বুক অফ বিদ্যাসাগর

মূল্য ৭৫০ টাকা
গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা

যোগাযোগ : পথিকৃৎ □ ৮৮বি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন ৯৪৩৩০৪৬২৮০/৮২৪০৭০৪৮৬৮ □ e-mail : pathikritpatrika@gmail.com

সম্পাদকীয়

গ্রিসের সাংবাদিক ও মানবতাবাদী সাহিত্যিক নিকোস কাজানজাকিস (১৮৮৩-১৯৫৭) তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'রিপোর্ট টু গ্রেকো'তে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন — ১৮৯৮ সালের ১০ জানুয়ারি। স্ট্যালিনের বয়স তখন কুড়ি। সেদিন জারের সেনারা জর্জিয়ার কুড়ি জন তরুণ রাজদ্রোহীকে মাঠে সারিবদ্ধ করে চাবুক মারছিল, যতক্ষণ না তারা লুটিয়ে মাটিতে পড়ে। এই কুড়ি জনের মধ্যে ছিলেন স্ট্যালিনও। উনিশ জন লুটিয়ে পড়ার পর স্ট্যালিনের পালা। স্ট্যালিনকে মারতে গেলে তিনি একটু সময় নিয়ে একটা কচি ঘাস নিজের দুই দাঁতের মধ্যে আলতোভাবে চেপে ধরে বললেন, 'এবার মারুন'। দু'জন চাবুক দিয়ে মারতে মারতে একসময় নিজেরাই মাঠে লুটিয়ে পড়ল। স্ট্যালিন বললেন, 'তোমরা এত মারলে কিন্তু দেখো আমি ঘাসের ওপর দাঁতের দাগ বসাইনি। আমাকে মারতে গিয়ে তোমারাই ক্লান্ত হয়ে পড়লে, আমি হইনি। মনে রেখো, তোদের এই শাসন-শোষণ একদিন ভেঙে দেবই।'

তরুণ স্ট্যালিনের সেই প্রত্যয় ইতিহাসের অনন্য নজির হয়ে আছে। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে রাশিয়াতে জারতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে মহান লেনিনের নেতৃত্বে মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হল। স্ট্যালিন তখন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিনিধি। কিছু দিন পর ঘটনাচক্রে পেত্রোগ্রাদে ক্যাপ্টেন ইভানভের দেখা পেলেন স্ট্যালিন। বয়স্ক ইভানভের কেউ নেই। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাহীন সে। স্ট্যালিন বললেন, 'আপনার কেউ নেই যখন আজ থেকে আমিই আপনার সন্তান। আপনাকে দেখভাল করব।' ইভানভ বিস্মিত, 'আমাকে শাস্তি দেবেন না?' স্ট্যালিন বললেন, 'না। কারণ আমাকে মারার দিন, আমার কথা শুনে, আপনার চোখে জল দেখেছিলাম।'

ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দেয় স্ট্যালিনের চরিত্রের মহত্ব ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বকে। আর তারই পাশাপাশি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকাকে বিচার করলে দেখা যাবে তারা কতখানি নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। বর্তমানে এর অন্যতম নজির আমাদের এই ভারতবর্ষের তথাকথিত গণতন্ত্রের চেহারা। আজ ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো রকম বিরোধিতা করলেই জুটছে দেশদ্রোহী তকমা। প্রতিবাদীদের বিনাবিচারে আটক করে রাখা হচ্ছে, কংগ্রেস সরকারের আমলে রচিত কালা আইনের বলে। সম্প্রতি এ দেশের বিশিষ্ট সমাজকর্মী স্ট্যান স্বামী'র মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা আরও একবার এ ভারতীয় গণতন্ত্রের চেহারাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

১৮১৮ সালে মহারাষ্ট্রের ভীমা কোরেগাঁও অঞ্চলে দলিতদের বাহিনী উচ্চবর্ণের পেশোয়ার বাহিনীকে পরাজিত করে। সেই যুদ্ধের একটি স্মারক আছে সেখানে। তাকে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর জমায়েত হয় সেখানে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি ভীমা

কোরেগাঁওতে দলিত সমাবেশকে কেন্দ্র করে ছড়িয়েছিল অশান্তি। দক্ষিণপন্থী একটি গোষ্ঠী এবং দলিতদের সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠেছিল মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই ঘটনাতেই অনেকের সাথে কেন্দ্রীয় সরকার অভিযুক্ত হিসাবে নাম জড়িয়ে দিয়েছিল স্ট্যান স্বামীর। ২০২০ সালের ৮ অক্টোবর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৮৪ বছরের এই বৃদ্ধ সমাজকর্মীর সাথে রাষ্ট্র যে ব্যবহার করেছে তা চরম নিষ্ঠুরতারই নামান্তর। অসুস্থ মানুষটির খাবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সিপার এবং স্ট্র, এমনকি তার চশমাটাও দিতে টালবাহানা চলেছে। তাঁকে জামিন দেওয়া হয়নি। শারীরিক পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং সেখানে গত ৫ জুলাই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মানববাধিকার লঙঘনের এমন নির্মম ঘটনা নানাভাবে ঘটে চলেছে। বিনা বিচারের বছরের পর বছর রাজনৈতিক বন্দীদের জেলে দুঃসহ পরিবেশে রেখে দেওয়ার ঘটনা আকছার ঘটে চলেছে। তাই সমাজকর্মী স্ট্যান স্বামীর মৃত্যু আদতে রাষ্ট্রের দ্বারা একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ হত্যা ছাড়া কিছুই নয়।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ব্রিটিশ সরকার যে ১২৪এ ধারায় (রাষ্ট্রদ্রোহ আইন) 'পথের দাবী'কে নিষিদ্ধ করেছিল, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও সে আইন বহাল রয়েছে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরের গলাটিপে ধরার রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন চরিতার্থ করার কারণেই।

গণতন্ত্রের স্বঘোষিত ঠিকাদার সাম্রাজ্যবাদীরা কতটা নিষ্ঠুর, কতটা রক্তলোলুপ হতে পারে তার প্রমাণ এই বিশ্ব কম দেখেনি। সম্প্রতি কিউবার বুকে মার্কিন ষড়যন্ত্রে আবার তা দেখা গেল। প্রায় ছ-দশক ধরে মার্কিন ও তার মিত্রদের অন্যায় অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্যে থাকলেও কিউবা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটিয়েছে। একে অর্থনৈতিক অবরোধ তায় বিশ্বজুড়ে করোনা সংকট কিউবাতেও কিছু সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তা সত্ত্বেও গোটা বিশ্ব জানে, কিউবা সরকার করোনা মহামারিতে নিজের দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি ইতালি, ফ্রান্স সহ ২৭টি দেশে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী পাঠিয়ে বিশ্ব মানবতাকে রক্ষা করেছে। ভ্যাকসিন বাণিজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পাঁচটি ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে। কিউবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জনগণের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই কিউবাকে অস্থির করে দেওয়ার জন্য এই মহামারির মধ্যে সংকটের ধুয়ো তুলে মার্কিন শাসকরা কিছু এজেন্টকে প্ররোচনা দিয়ে বিক্ষোভে নামিয়ে ছিল। তারা সেখানে রাস্তায় নামামাত্রই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরে বসে জেনে গেলেন, কিউবার জনগণ একনায়কতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি চায়! সে দেশের জনগণের পাশে যুক্তরাষ্ট্র আছে। যদিও দেশের আপামর জনতা বিশাল মিছিল করে পথে নেমে এই মার্কিন অপপ্রচার এবং অপচেষ্টাকে বরাবরের মতোই রুখে দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আসল সম্পদ হল মানুষ। কিউবার জনগণই যে দেশের সবচেয়ে মহার্ঘ সম্পদ। মুনাফালোভী ধনতন্ত্র এ মনুষ্যত্ব, স্বাধীন মানবসত্তার সন্ধান পাবে কী করে? এখানেই তো সমাজতন্ত্রের আসল শ্রেষ্ঠত্ব।

শ্রদ্ধার্ঘ
কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

আর শুনতে পাবো না সেই কণ্ঠস্বর— 'কই হে, পথিকৃৎ বের করলা? কী লেখা দিয়েছ এবার?' ৬ জুলাই রাত ১০টা ৫০ (ভারতীয় সময় রাত ১০টা ২০) চিরতরে থেমে গেছে সেই কণ্ঠ। যদিও হায়দার ভাই কথা বলে চলেছেন অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে। মুক্তিকামী অসংখ্য হৃদয়ে আরও বহুকাল তিনি সজীব থাকবেন। বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে নতুন ধরনের মানুষ গড়ে তোলার কারিগর কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী স্বপ্ন বুনে দিয়েছেন শত শত তরুণ প্রাণে। পুঁজিবাদী শোষণের জোয়ালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে শয়ে শয়ে তাঁরা ঘর ছেড়েছেন, উজ্জ্বল কেরিয়ার আরাম আয়েসের জীবনের হাতছানিকে হেলায় দূরে ঠেলে বেছে নিয়েছেন আপাত কঠিন, অথচ গভীর আনন্দ ও মর্যাদাময় বিপ্লবী জীবনের পথ। বাংলাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি গভীর ছাপ ফেলে গেছেন ভারতের হাজার হাজার বিপ্লবী কর্মীর হৃদয়েও।

বাসদ মার্কসবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বাংলাদেশের যুব সমাজকে এক নতুন জীবনবোধের সন্ধান দিয়েছেন। এ কাজে তাঁর হাতিয়ার ছিল মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা হল আজকের যুগে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট সমৃদ্ধ রূপ।

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত ভারতে চট্টগ্রাম জেলার বাড়বকুণ্ডতে জন্মগ্রহণ করলেও শৈশবেই তিনি চলে আসেন কলকাতার খিদিরপুরে তাঁর এক দাদার কাছে। ১৯৫১ সালে এই খিদিরপুরেই তাঁর সাথে যোগাযোগ ঘটে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক ও মহান বিপ্লবী নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের। ওই সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ যৌবনে তত্ত্বের জটিল কথাগুলি সব না বুঝলেও, কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক আদর্শের মধ্যে প্রতিভাত উচ্চসংস্কৃতির সুর তাঁকে টেনেছিল। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রণসত্ত্বা হল তার উচ্চস্তরের সংস্কৃতির ভিত। ব্যক্তিস্বার্থ-মুক্ত এই মহান সর্বহারা সংস্কৃতির সুরটি কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই প্রচলিত স্বচ্ছন্দ জীবনের আহ্বান আর তাঁকে টানতে পারেনি। বেছে নিয়েছিলেন বিপ্লবী জীবন।

তাঁর বিপ্লবী জীবনের সুচনা কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। কৃষক ও ক্ষেতমজুর আন্দোলন, যুব সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এর মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সুদক্ষ সংগঠক। দিল্লি এবং হরিয়ানা রাজ্যে শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার বিস্তারে তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্য দিয়ে তিনি শুধু সুদক্ষ সংগঠকই হয়ে ওঠেননি, শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার বিস্তার ও তার ভিত্তিতে বিপ্লবী দল গড়ে তোলাই হয়ে ওঠে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান।

১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে ত্রাণ কার্য পরিচালনা করতে করতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবিরে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে বিপ্লবী দল গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে তিনি তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে যান। একাকী এক অনন্য সংগ্রাম তিনি শুরু করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগ্রামে তিনিই ছিলেন প্রধান চালিকাশক্তি, কিন্তু সর্বদাই চেষ্টা করেছেন অপেক্ষাকৃত তরুণদের সামনে নিয়ে এসে নিজে প্রচারের আড়ালে থাকতে।

প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ না পেলেও মহান নেতা শিবদাস ঘোষের দেখানো পথে সংগ্রাম করতে করতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় তিনি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান অথচ সহজ সরল প্রকাশ ভঙ্গিমা অসংখ্য মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। সঙ্গীত, কবিতা, সাহিত্য সংস্কৃতির নানা বিষয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি তরুণদের অনুপ্রাণিত করতেন সমাজের যথার্থ প্রয়োজনকে সামনে রেখে সংস্কৃতির চর্চা করতে। জানার অহঙ্কার তাঁকে স্পর্শ করা দূরে থাক, সর্বদাই সকলের থেকে শেখার মন নিয়ে চলতেন। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য আশেপাশের মানুষকে প্রভাবিত করত, আকর্ষণ করত। যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁদের কথায়— একজন সাদা চুলের বৃদ্ধ মানুষকে ঘিরে চুম্বক অকর্ষণ বোধ করছে আধুনিক ছাত্র-যুবর দল এ যেন ভাবাই যায় না! অথচ এটাই ছিল বাস্তব সত্য। ৮৭ বছর বয়সেও বিপ্লবী উদ্দীপনা, উদ্যোগ এবং গভীর আবেগ সব কিছু নিয়ে প্রাণবন্ত সতেজ মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। যা সঞ্চারিত করতে পারতেন ছাত্র-যুবকদের মধ্যে। তাদের বিপ্লবী জীবনের স্বপ্ন দেখাতে পারতেন। তাঁর সংস্পর্শে থাকা মানুষগুলির রুচি-সংস্কৃতির আধারটাকে অনেক অনেক বড় করে তুলতে পারতেন। শিল্পী মন নিয়ে গড়ে তুলতে চেষ্টা করতেন নতুন ধরনের মনুষ্যত্বের অধিকারী এক একজন মানুষকে। যে মানুষ লিপ্ত ব্যক্তিসম্পত্তিজনিত মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত মন অর্জনে, স্বার্থপরতা, ব্যক্তিসর্বস্বতা থেকে মুক্ত হওয়ার সচেতন সংগ্রামে। এ যুগের সর্বোন্নত সংস্কৃতি, সর্বহারা সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে একজন যথার্থ আধুনিক মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার সংগ্রামে লিপ্ত এমন বহু বিপ্লবী কর্মী গড়ে তুলেছেন তিনি।

সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে ইউরোপে এবং আরবভূমিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা প্রচারে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সংগঠনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন।

ভারত এবং বাংলাদেশের মেহনতী জনগণ সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের জোয়াল থেকে তাদের মুক্তি সংগ্রামে এই বিপ্লবী নেতার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে বহুকাল।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী
লাল সেলাম

ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন : বামপন্থা ও নৈতিকতা

শিবদাস ঘোষ

(ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন, বামপন্থা ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ গত শতাব্দীর ছয় ও সাতের দশকের বিভিন্ন সময়ে যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন, সেখান থেকে কিছু অংশ বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে তার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করে এখানে সংকলিত করা হয়েছে। সংকলনজনিত ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার পরিপূর্ণ দায়িত্ব একান্তভাবে আমাদেরই — সম্পাদক)

"...কোনো আন্দোলনই তো শুধুমাত্র বুদ্ধির কারবার নয় — বুদ্ধি এবং হৃদয়বৃত্তির কারবার। বিপ্লবটাও তাই। চিন্তা এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে হৃদয়বৃত্তির আধারটা নিচুস্তরে নেমে থাকলে তো ব্যবধান হয়ে যাবে। তাহলে আন্দোলন এবং চিন্তাও শেষ পর্যন্ত বিপথগামী হবে। ফলে, পথ পাওয়া যাবে না। আজকের দিনে ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের স্তরে স্তরে যে নীতি-নৈতিকতা নেই — এ সত্য আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছি।"

"...আমাদের দেশের গণআন্দোলনের ভিতরেই আজ প্রতারণা বাসা বেঁধেছে। তার প্রতি স্তরে বিভ্রান্তি। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে নৈতিক মান, রাজনৈতিক নীতিবোধ, আদর্শগত মান ধসে যেতে বসেছে। আমরা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়া নিয়ে এখানে লড়াই করি একথা সত্য কিন্তু সেই লড়াইয়ের সাথে সাথে আমরা যারা এই লড়াইতে অংশগ্রহণ করছি, সমাজের প্রতিও তাদের যে একটা কর্তব্যবোধ এবং দায়িত্ববোধ আছে, তা ভুলে যাই। এই সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে রুচিগত মান যা আমরা প্রতিফলিত করছি তা হচ্ছে, কেউ আমার বন্ধু হলে বা আমার মতকে সমর্থন করলে আমরা তাকে যা হয় বলে তারিফ করি। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন নেতা এবং সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও কারও সাথে আমাদের সামান্য মতপার্থক্য হলে তাকে যে কোনো ভাষায় গালাগালি করতেও আমাদের এতটুকু বাধে না। আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক নীতিবোধ ও রুচিগত মান আজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।"

"...তাই আমি বলতে চাই, আন্দোলনের সামনে আমাদের একটা সুস্পষ্ট আদর্শ চাই-ই। এই আদর্শ আমাদের কী? আমাদের এ আদর্শ সমাজতন্ত্র এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ। ...তারপরে দেখতে হবে, এই সমাজবাদী আদর্শের প্রয়োগ এবং ভারতীয় বাস্তব অবস্থা, ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার সুষ্ঠু এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তারা করতে পেরেছে কি না। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ, ভারতবর্ষের নৈতিক অধঃপতন, ভারতীয় সমাজের রোগকে তারা ধরতে পেরেছে কি না। সে রোগ কী?

নৈতিক অবনতির ক্ষেত্রে রোগ হল আদর্শের ক্ষেত্রে সংকট। আমরা একটা সময়ে দেখেছি, ক্ষুদিরামের যুগে, এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের 'ফ্লাওয়ার্স অব বেঙ্গল' বলা হত। ঘর ঘর থেকে 'কেরিয়ার' ছেড়ে দিয়ে স্কুল-কলেজের ছেলেরা সব রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল স্বাধীনতার জন্য। ফাঁসিকাঠকে ভয় করেনি, জেলকে ভয় করেনি, অত্যাচারকে ভয় করেনি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কাব্য, সাহিত্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি মানুষের নতুন নতুন অভিযান। কিন্তু আজ দেখছি কাব্য সাহিত্য সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে চলছে মালিকশ্রেণি, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণির তোষণবাদ। তোষণবাদের মধ্য দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট প্রগতির চর্চা! এমন প্রগতি করতে হবে, যে প্রগতিতে গলাটি বাঁধা পড়বে না। প্রগতিও হবে কিন্তু গলা বাঁধা পড়বার সম্ভাবনা নেই, জেলে যাওয়ার ভয় নেই এবং মালিকশ্রেণির ডাণ্ডার ভয় নেই। তেমন নির্ঝঞ্ঝাট প্রগতির চর্চা করতে হবে। রেখে-ঢেকে করতে হবে। সংকটটা হচ্ছে এই আদর্শের সংকট, সাংস্কৃতিক সংকট। আর এই সংকটের বুনিয়াদই হচ্ছে অর্থনৈতিক সংকট যা আমি পূর্বেই আপনাদের সামনে আলোচনা করেছি। ওই আমেরিকায়ও তাই। টিন এজারদের সমস্যা নিয়ে তারা যে চিৎকার করছে, এটা একটা সমস্যা। এ সমস্যার মূল কারণ তাদের সমাজের বুনিয়াদ-এর মধ্যে। অর্থাৎ আমেরিকান সমাজ আদর্শের সংকটে আজ হাবুডুবু খাচ্ছে। তার আদর্শবাদ সে হারিয়ে ফেলেছে। যে জেফারসন, লিংকনের জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ, গণতন্ত্রের আদর্শ একদিন আমেরিকান জাতিকে স্বাধীনতাকামী জাতি হিসাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং বিশ্বকে আকর্ষণ করেছিল, সেই স্বাধীনতার ধারণা আজ একটি প্রিভিলেজ-এ পরিণত হয়েছে, আজ এই ব্যক্তিস্বাধীনতা আমেরিকান সমাজে একটা সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে। কাজেই যখন কোনো একটা আদর্শ সময়ের গতিপথে সুবিধাবাদে পর্যবসিত হয়ে যায় তখন সে তার বিপ্লবাত্মক এবং প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়ে ফেলে। আপনাদের মনে রাখা দরকার, সমাজের অভ্যন্তরে পরস্পরবিরোধী মূল শক্তিগুলোর সংঘাতের ভিতর দিয়ে ইতিহাসে একটা আদর্শ আসে পুরনো আদর্শকে ভেঙে ফেলে দিয়ে একটা নতুন সমাজব্যবস্থা গড়বার জন্য। কিন্তু সেই আদর্শটাও আবার চলতে চলতে একদিন কায়েমী স্বার্থবাদের আদর্শে রূপান্তরিত হয়। তখন সে হয়ে যায় কায়েমী স্বার্থবাদীদের সুবিধা, প্রিভিলেজ। যখন তা প্রিভিলেজ হয়ে যায় তখন সে আর কোনো জাতিকে বা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। তখন সে শুধু কেনা দাস, কতকগুলো চাকরের সৃষ্টি করে, মাইনে করা চাকরের সৃষ্টি করে। কাজেই আজ কাব্য জগতের ক্ষেত্রে, শিক্ষা জগতের ক্ষেত্রে, নাট্য জগতের ক্ষেত্রে, ছাত্রদের মধ্যে সমস্ত জায়গায় শৃঙ্খলার মানে দাঁড়িয়েছে অফিসের আইন-কানুন মেনে চলা আর লেফট-রাইট করা। শিক্ষা মানে হচ্ছে গভর্নমেন্টের ভাল চাকরি পাওয়া, শিক্ষা মানে হচ্ছে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কারিগরি শিক্ষা এমন অর্জন করা যাতে আমি বড় মিস্ত্রি হতে পারি, বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে পারি। আমার মানবিক মূল্যবোধ কত, ইতিহাস সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কত এবং ইতিহাসের তাৎপর্য আমি কত বুঝি, সমাজের মূল্যবোধ আমার মধ্যে কতখানি আছে, মানুষ হিসাবে আমি কী ধরনের — অত কথা দেখার দরকার নেই। কারণ আমি মস্ত বড় শিক্ষিত লোক, আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, আমি নাটবল্টু ঘোরাতে পারি, আমি চার হাজার টাকা রোজগার করি। এই হল সমাজের মনন। এই মননে জাতির মেরুদন্ড ভেঙে যাচ্ছে।

"...আমি দেখাতে চেয়েছি, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও সমাজজীবনে যতটুকু নীতি-নৈতিকতার মান ছিল, তা কীভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তারপরে '৬৭ সালে বামপন্থীরা ক্ষমতা পাওয়ার পর, এমনকী সি পি আই(এম) -এর মতো বিপ্লবী বলে যাঁরা নিজেদের দাবি করেন, তাঁদের র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলের মধ্যে সেই সাহস, মনোবল, শক্তি, নীতি-নৈতিকতা সমস্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে — যার ফলে, কেন তাঁরা আন্দোলন করতে পারছেন না, সে সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করছেন। আসলে তাঁরা পারছেন না এই কারণেই যে শুধু লড়াইয়ের স্লোগানগুলো তুলে মানুষগুলোকে লড়াইয়ের ময়দানে নামিয়ে দিলেই আপনা-আপনি 'অটোমেটিক' (স্বতঃস্ফূর্ত) প্রক্রিয়ায় বিপ্লবী চরিত্র গড়ে উঠবে — এরকম একটা তত্ত্বে, তাঁরা বলুন বা না বলুন, হয় তাঁরা বিশ্বাসী, অথবা তাঁরা এই 'ফেনোমেননটিকে (বিষয়টিকে) ধরতেই পারেননি যে, গোটা সমাজজীবনে 'কালচারাল

ডিগ্রেডেশন' (সাংস্কৃতিক অধঃপতন) যদি ব্যাপক আকারে ঘটে এবং বিপ্লবী আন্দোলন তার বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্যে সেই সাংস্কৃতিক মানকে যদি তোলবার চেষ্টা না করে, তাহলে বিপ্লব গড়েই উঠতে পারে না। **বিপ্লবের সমস্ত আয়োজনের সঙ্গে বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতির দিকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই মানসিক প্রস্তুতির বিষয়টি সংস্কৃতির সঙ্গে নীতি-নৈতিকতার সঙ্গে সরাসরি জড়িত।** লেনিন বলেছেন, 'কালচারাল রেভোলিউশন প্রিসিড্স্ টেকনিক্যাল রেভোলিউশন' — অর্থাৎ সব বিপ্লব গড়ে তোলবার আগে বিপ্লবের উপযোগী মানসিক কাঠামো, আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক মনন গড়ে তোলা দরকার। তার জন্য একটা 'পেইনস্টেকিং ইডিওলজিক্যাল স্ট্রাগ্ল্' (কষ্টসাধ্য আদর্শগত সংগ্রাম) একেবারে 'কালচারাল লেভেল' (সংস্কৃতির স্তর) পর্যন্ত ব্যাপ্ত করে গড়ে তুলতে হবে — যেটা রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্কৃতির সুরটাকে গড়ে তুলবে। 'ডাইরেক্টলি' (সরাসরি) একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন যদি না-ও হয় — কারণ এটা কখন কীভাবে করতে হবে এবং কতগুলি 'উইং'-এ (শাখায়) হবে, এগুলো তার 'ডিটেইল্স্' (পুঙ্খানুপুঙ্খ) আলোচনার বিষয় — কিন্তু এই আদর্শগত সংগ্রামটা গড়ে তুলতে হবে। এটাকে অবহেলা করে, 'বিপ্লব করব' এই ভাবনাটা আছে বলেই শুধু সেইটাকে সম্বল করে যদি কেউ বিপ্লব করতে যান, তাহলে একদিন তাঁর এই ফাঁকি ধরা পড়বেই এবং সেই ফাঁকির শিকার তিনি নিজেই বনে যাবেন। তার ফলে একদিন যে চারিত্রিক সম্পদের অধিকারী তিনি ছিলেন, লড়বার যে ক্ষমতা তাঁর ছিল, সেগুলোও ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের সমস্ত সমস্যার মধ্যে নীতি-নৈতিকতার এই সমস্যাটিই আমার মতে বর্তমানে একটা অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে।"

"... মার্কস বলেছেন যে, যারা সর্বহারা, তারাই একমাত্র এই দুনিয়াকে পাল্টাতে পারে। তিনিই প্রথম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে দুনিয়াকে পাল্টাবার বিজ্ঞানসম্মত পথের সন্ধান দিলেন। বললেন, মজুররা দুনিয়াকে পাল্টাতে পারে, কথাটার মানে এই নয় যে মজুর সর্বহারা বলেই সে পাল্টাতে পারবে। যে কোনো রকমে হাজার হাজার প্রলেতারিয়েত সংগঠিত হয়ে বিপ্লবের নারা (ধ্বনি) লাগালেই পারে না। সেই প্রলেতারিয়েতই পারে, যে নিজেকে পরিবর্তিত করে বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তুলেছে।

শুধু রাজনৈতিক ভাবে নয়, স্লোগানে নয় — আচার-আচরণে, নীতি-নৈতিকতায়, সংস্কৃতি-রুচিতে বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্ত করে নিজের মধ্যে বিপ্লবী নেতৃত্বের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে যে প্রলেতারিয়েত, সেই একমাত্র দুনিয়াকে পরিবর্তিত করতে পারে। বুর্জোয়া পরিবেশ থেকে অর্জিত বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ, ভাবধারা ও অপসংস্কৃতির প্রভাব থেকে মজুররা যতদিন না মুক্ত হয়, ততদিন আর্থিক দুর্গতি বাড়লেও সে বিপ্লব করতে পারে না। বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির যে রূপ আমরা মজুরদের মধ্যে দেখি, মজুর বলেই সে সংস্কৃতি প্রলেতারিয়েত সংস্কৃতি নয়। একসময় 'ফিলান্থ্রপিক আইডিয়া' থেকে কিছু লোক এসেছিল যারা মনে করত — মজুরের মধ্যে যা কিছু সবই বিপ্লবী। তাই মার্কস থেকে লেনিন সবাই তাদের কান মলে দিয়ে বলেছেন যে, 'প্রোলেতারিয়ান কাল্চার' (সর্বহারা সংস্কৃতি) মানে 'কালচার ইট্সেল্ফ্ প্রোলেতারিয়েত' হবে না (সংস্কৃতিটা সর্বহারা হবে না)। প্রলেতারিয়ান কালচারের অর্থ এ নয় যে খোদ কালচারই প্রলেতারিয়েত! তাঁরা বলেছেন যে, বুর্জোয়া বিপ্লববাদের আধারে মানবতাবাদী মূল্যবোধ ও উদারতার কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল। শ্রমিক বিপ্লবের যুগে, শ্রমিক বিপ্লবের আদর্শকে কেন্দ্র করে, প্রলেতারিয়ান সংস্কৃতি অর্জন করার অর্থ — অজ্ঞ, অশিক্ষিত, বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত প্রলেতারিয়েতদের ভাষাগুলি, অভ্যাসগুলি রপ্ত করা নয়। বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের মধ্যে পর্যুদস্ত হয়ে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে, এই জীবনকেই সত্য বলে, নিয়ম বলে, মেনে চলছে যে মজুর, অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের গোলকধাঁধায় ফেঁসে আছে যে মজুর — তার থেকে মুক্ত করে অমিত তেজে তাকে খাড়া করে, নতুন আদর্শে বলীয়ান করে, তাকে কমিউনিস্ট করার জন্যই প্রলেতারিয়ান সংস্কৃতি।"

"...যতদিন বিপ্লব না হয়, জনতা ইলেকশন চাক বা না চাক, পছন্দ করুক আর নাই করুক, ভাল লাগুক, মন্দ লাগুক, জনতাকে টেনে আনা হয়, জনতা এসে যায়। বিপ্লব মানে হল, যখন জনতা বুঝে ফেলেছে ইলেকশন-এর প্রয়োজনীয়তা নেই, যখন সকলে এই চেতনার

ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে গেছে এবং সংগঠিত ভাবে ইলেকশন বর্জন করছে, নেগেটিভলি বর্জন করছে না, পজিটিভলি তারা আপরাইজিং গণঅভ্যুত্থান করার জায়গায় চলে গেছে, যখন সে বলে, না ইলেকশন নয়, ক্ষমতা দখল, তখনই একমাত্র ইলেকশন অকার্যকরী হতে পারে, না হলে ইলেকশনে জনতা বার বার ফেঁসে যায়। আর জনতার সঙ্গে থাকবার জন্য বিপ্লবী হোক, অবিপ্লবী হোক সকলকেই ইলেকশন-এ যেতে হয়, সত্যিকারের বিপ্লবীকেও যেতে হয়। শুধু ওইসব সেকটেরিয়ান ট্রুইজম-এর চর্চা যারা করে, যারা বিপ্লবের চর্চা করে না, তারা গা বাঁচায়, না হলে সকলকেই যেতে হয়। তাহলে গেলে সকলের কি দৃষ্টিভঙ্গি এক হবে? ইলেকশন তো সকলেই করছে, বাইরের দিক থেকে দেখলে, আমি করছি, বিপ্লবী লেনিনবাদীরাও করছি, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরাও করছে, খাঁটিরাও করছে, মেকিরাও করছে, বুর্জোয়ারাও করছে, মেকি সমাজতন্ত্রীরাও করছে। আর সকলেরই কথা হবে আমি ঠিক, বিপক্ষ দল বেঠিক। তাহলে বিপক্ষ দলকে হারাবার জন্য যে কোনও কৌশলটাই হচ্ছে সঠিক, কারণ আমি সঠিক। এইভাবে যদি আপনি যুক্তি করতে থাকেন, তাহলে বুর্জোয়া আর আপনার মধ্যে কোনও শ্রেণিগত পার্থক্য থাকে না, দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য থাকে না, অথচ গভীর বিচার-বিশ্লেষণে এটা ভুল প্রমাণ হয়।

আসলে বুর্জোয়া আর প্রোলেতারিয়েত এ দু'জনেরই লড়াইয়ের কলা-কৌশল, কায়দা, সংগঠন পদ্ধতি, ইলেকশন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি, জেতা-হারার কলা-কৌশলটি ঠিক করাও দেশের বাস্তব বিপ্লবী আন্দোলন, গণচেতনার স্তরের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। বুর্জোয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচনী আসন দখল করা এবং করে ক্ষমতায় যাওয়া। ক্ষমতায় গিয়ে নানা রিফর্মস (সংস্কারমূলক কাজ) করে, নানা স্লোগান তুলে এই এগ্‌জিসটিং সিস্টেম-কেই (বর্তমান ব্যবস্থা) টিকিয়ে রাখা। যেমন করে বললে আমি জনতার মধ্যে প্রগতিশীল সেজে কিছু দিন তাকে বিভ্রান্ত করতে পারি, বোকা বানাতে পারি এবং এই ব্যবস্থাটাকেই দীর্ঘস্থায়ী করতে পারি — এ হল তাদের উদ্দেশ্য। তাহলে তার মূল লক্ষ্য হয়, যেভাবেই হোক সর্বাধিক নির্বাচনী আসন দখল কর। এটা ছাড়া রাজনৈতিক কর্মসূচি, আশু কর্মসূচি এগুলোও সে দেয়। এই প্রোগ্রাম ও স্লোগান তাদের যাই হোক, তাদের মূল কথা হচ্ছে, গ্র্যাব ম্যাক্সিমাম সিটস।

আর বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতার লক্ষ্য থেকে প্রোলেটারিয়েট যখন অনন্যোপায় হয়ে জনতার সঙ্গে থাকার জন্য নির্বাচনী লড়াইয়ে যায়, তখন সে একটা জনতার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে যায়। সিট জেতবার জন্য সেও চেষ্টা করে সাধ্যমতো। কিন্তু তার উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দুটা কখনোই যেভাবেই হোক সর্বাধিক আসন দখল করা হয় না। তার মেইন ফোকাল পয়েন্ট-টা হয়, পিপ্‌ল-কে, জনতাকে, একটা মাস রেভোলিউশনারি লাইন-এর (জনতার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের) ভিত্তিতে ইলেকশন লড়াই করতে শেখানো এবং এইটা করতে গিয়ে ম্যাক্সিমাম সিট পাই পাব, যদি না পাই, একটাও না পাই, না পাব। যদি দশটা রক্ষা করতে পারি, দশটাই করব, কিন্তু তার সেন্ট্রাল ফোকাল পয়েন্ট কখনোই হবে না — যেন তেন প্রকারেণ, যে কোনও উপায়ে কতকগুলো সিট গ্র্যাব করা।

হোয়াট ইজ দ্যাট মাস লাইন অ্যান্ড মাস স্টাইল অব অ্যাক্টিভিটি? জনতার সেই বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতিটি কী, যেটা ইলেকশনে জনসাধারণের কাছে আমি নিয়ে যাব? জনতার মধ্যে আমি যাব এই কথা নিয়ে — তুমি যখন ইলেকশন করছই তখন পিপ্‌ল-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তোমাকে বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে ইলেকশন করতে হবে। সেটা করতে গিয়ে তোমার নিজের ঘাঁটিগুলি তুমি নিজে সামাল দাও। যে কয়টা সিট পাও, যতগুলো ম্যাক্সিমাম পারো, এমনকী যদি সব সিটই জিততে পারো, এর ভিত্তিতে এই লাইনের ভিত্তিতেই জেতো। কিন্তু একমাত্র এর ভিত্তিতেই, এটাকে গোলমাল করে দিয়ে নয়। শত্রুকে হারাবার জন্য যা দরকার তাই করো — এ সব যুক্তি যদি তুমি তোলো, আর বিপ্লবী তক্‌মা এঁটে তোলো, তাহলে কিন্তু বুর্জোয়ারা যেভাবে ইলেকশন ফাইট করে, তুমিও আসলে সেই কৌশলটি, সেই কায়দাটি এবং সেই একই ট্যাকটিক্সটাকেই বিপ্লবের নামে চালু করার চেষ্টা করবে। এতে কি বিপ্লবী হওয়া যায়? এর দ্বারা কি বিপ্লবের কাজ এগোয়? না, এতে বিপ্লবী হওয়া যায় না এবং এর দ্বারা বিপ্লবী কাজও এগোয় না। এর ফলে,

আমরা যে বলি ইলেকশন-এর মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি পলিটিক্সকে এক্সপোজ করব, তা হয় কি? এই কথাটা মুখে বলা আর কাজে করা এক জিনিস নাকি? একদল শুধু মুখে বলে, আর একদল বাস্তবে করে। কাজেই কারা এটা শুধু মৌখিকভাবে বলছে, আর কারা প্রকৃতই সেই অনুযায়ী কাজ করছে, এ সম্পর্কে পিপ্‌লকে, জনতাকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করাটাই হল আসল জিনিস।"

"... শুধু স্লোগান দিয়ে কোনও দেশে বিপ্লব হয়নি। বিপ্লবের জন্য মানুষের একটা সুস্থ এবং সুষ্ঠু নৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন আছে। মানুষগুলো যদি স্লোগান-মঙ্গার (স্লোগান সর্বস্ব) হয়, দলবদ্ধ থাকলে সাহসী, দলবদ্ধ না থাকলে যদি কুঁকড়ে যায়, কুকুর-বেড়ালের মতো লাঠি দেখলেই পালায় আবার নিজের হাতে লাঠি থাকলে মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে না, তাদের উপর হামলা করে, তাহলে এই মানুষগুলোর দ্বারা বিপ্লব হয় নাকি? এই যে ব্লাডি ম্যানিয়াক (রক্তলোলুপতার) প্রবণতা, এতো বিপ্লবের বিরুদ্ধ শক্তি। এর দ্বারা সমাজ পরিবেশের মধ্যে ফ্যাসিস্ট মানসিকতা তৈরি হয়। মজুর আন্দোলনে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে আজ এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর আচরণ চলছে। শুধু বাইরের লোকের বিরুদ্ধে নয়, দলের অভ্যন্তরে, দলের বাইরে, যা কিছু ফিল্‌দি (নোংরা), যা মানুষকে বড় করতে, মহৎ করতে সাহায্য করে না, তার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম হওয়া উচিত এবং এই সংগ্রাম শুধু বাইরের লোকের বিরুদ্ধেই নয়, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও।"

"... অন্ধতার রাস্তা তো কমিউনিস্টরা, মার্কসবাদীরা চর্চা করে না। এ কারা চর্চা করে? করে ফ্যাসিস্টরা। ফ্যাসিস্টরা চায় মোর দ্য ব্লাইন্ডনেস, মোর দ্য ফ্যানাটিসিজম। অন্ধতা যত বাড়বে, উগ্র মতান্ধতা তত বাড়বে। এ তত্ত্ব ফ্যাসিস্টরা মানে। তাই তারা চায় সারা জাতটা অন্ধ গোঁয়ারের মতো হয়ে যাক। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্ধতা এনে দাও, একটা হুজুগ এনে দাও, স্লোগান তুলে দাও, নানারকম কথা তুলে আসল কথাগুলোকে চাপা দিয়ে দাও এবং জনতাকে উত্তেজিত করে নিয়ে যাও। তার ফলে কী হয় ? জনতাও প্রচারে প্রচারে উন্মত্ত হয়ে যায়, উন্মত্ত হয়ে দৌড়তে থাকে। দৌড়ে গিয়ে তারা গর্তে পড়বে, না কোথায় পড়বে তা খেয়াল করে না। যেমন করে অতবড় ঐতিহ্যময় দেশ জার্মানি ডুবে গেল। এই জার্মানি দেশটা ভারতবর্ষের মতো পিছিয়ে-পড়া দেশ নয়। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, শিল্পে পৃথিবীর মধ্যে একটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। এতবড় একটা দেশের মানুষগুলোকে, জ্ঞানী লোকগুলোকে, পাগলের মতো খেপিয়ে তুলে হিটলার দেশটাকে কোথায় নিয়ে গেল! আর তারই পরিণতিতে আজ জার্মান জাতির কী অবস্থা! দেশটা দু'ভাগ হয়ে গেল, তার সে ইজ্জত চলে গেল।

কাজেই অন্ধতা কমিউনিস্টদের রাস্তা নয়। গরম করে দেওয়া, খামোকা উত্তেজিত করে দেওয়া, মগজটাকে গুলিয়ে দেওয়া, আলোচনায় অধৈর্য হওয়া, উত্তর না করে গালগালি করা — এগুলি প্রতিক্রিয়াশীলদের রাস্তা। যাদের আদর্শগত দুর্বলতা রয়েছে, তারাই উত্তেজনার রাস্তা নেয়, কেবল স্লোগান দেওয়ার রাস্তা নেয়, স্লোগান তুলে তত্ত্বকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যারা দুর্বল নয় তারা প্রশ্নের জবাব দেয়, প্রশ্নকে চাপা দেয় না, প্রশ্নের উত্তর দেয়।"

"... আপনারা জানেন, অনেক লাল দুর্গ গোটা দেশে গড়ে উঠেছিল এমনভাবে যেন সেগুলো কোনো বিশেষ দল বা সংগঠনের জমিদারি — সেখানে অন্য আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হত না। তা আমি বলি, কেউ ভাল কথা কিছু বললেও যেহেতু সে দলের লোক নয়, যেহেতু এটা আমাদের দুর্গ, সেহেতু তাকে ঢুকতে দেব না বা তার ভাল কথাতেও কান দেব না সেটা কেমন কথা? সমালোচনাটা হয়ত মুক্তি আন্দোলনেরই কাজে লাগত, কিন্তু যেহেতু দুর্গ গড়া হয়েছে, সেই হেতু কানে তালা লাগানো কি কাজের কথা নাকি? নেতারা বলেছে বিভাগে বিভাগে দুর্গ গড়ে তোলো — তার মানে কি এই যে, বুদ্ধিও যাতে নাক গলাতে না পারে! এর ফল কী হয়েছে? এর ফলে অন্ধতা বাড়ছে। অন্ধতার মনোবৃত্তি ফ্যাসিস্টসুলভ — তা বুর্জোয়াদের সাহায্য করে। শ্রমিক আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন অজ্ঞতার কারবার করে না। তারা যুক্তি, তর্কাতর্কি, আলাপ আলোচনা ও মতাদর্শগত সংঘর্ষে বিশ্বাস করে, কারণ তারা সত্যানুসন্ধানী। আলোচনা, যুক্তি, তর্কাতর্কিতে তারা ভয় পায় না। আলোচনাকে চাপতে চায়, নিরুৎসাহিত করে তারাই যারা 'রং' (ভুল) জায়গায় আছে, যারা প্রতিক্রিয়াপন্থী। তাই তারা কখনো শৃঙ্খলার দোহাই

দিয়ে, কখনো বা ঐক্যের দোহাই দিয়ে, দুর্গ-টুর্গ গড়তে হবে এসব কথা বলে আসলে তারা আলাপ আলোচনা চাপা দিতে চায়। তারা তর্ক-বিতর্কে ভয় পায়, যুক্তি বিশ্লেষণে ভয় পায়। তারা একটা মানুষকে বক্তৃতায় বিশ্লেষণ করতে দেখলে ঠাট্টা করে, বলে — ক্লাস নিচ্ছে। যেন শুধু খেপানোর জন্য বক্তৃতা করা দরকার।"

"...নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ অপরকে বুঝিয়ে, আদর্শের জোরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যদি কেউ নেতৃত্বে আসে তাহলে আপত্তির কী থাকতে পারে? ...আপনি যেমন আপনার মতে বিশ্বাস করেন, অপরে ভুল হলেও তার নিজের একটা মত আছে, সে তাতে বিশ্বাস করে। এই দু'টি মতের খোলাখুলি সংঘর্ষের সুযোগ থাকা দরকার। আপনি আমার উপর আপনার মত চাপাতে চাইলে, আমি তা মানতে পারি না। তাই খোলাখুলি মত বিনিময় হলে, প্রকাশ্য আলোচনা-সমালোচনা হলে, জনসাধারণের সুযোগ থাকে — কে ঠিক আর কে বেঠিক বোঝবার। আপনি যদি ঠিক থাকেন, আলোচনায় আপনার তো কোনো ভয়ের কারণ নেই। বরং আলোচনায় আপনার জয় তো সুনিশ্চিত। যে ভুল জায়গায় আছে, মিথ্যা আঁকড়ে আছে, যার দুর্বলতা আছে সে-ই আলাপ-আলোচনা, মতাদর্শগত সংঘর্ষে ভয় পায়। শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে, ঐক্যের নামে নানা অজুহাতে সেই কেবল কর্মী ও সমর্থকদের এই খোলাখুলি আলোচনার বাইরে রাখে। জনসাধারণকেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। আপনারা সেই পথ পরিত্যাগ করুন। মতের বিনিময় ঘটান।"

"... চিন্তাভাবনা, যুক্তিবিজ্ঞানের চর্চা — গোটা দেশ থেকে উবে যাচ্ছে। ফলে সমাজজীবনে এই যুক্তিহীন মানসিকতা ও অন্ধ আনুগত্যের ঝোঁক সর্বনাশা ফ্যাসিবাদেরই জমি তৈরি করছে।"

"... শুধু অত্যাচার একটা দেশের এত ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু ফ্যাসিবাদ হচ্ছে একটি সর্বাত্মক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান। একদিকে সে মানুষের চিন্তাভাবনাগুলোকে মেরে দিয়ে তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, মানুষের জ্ঞানবিদ্যাবুদ্ধিকে কারিগরিমুখী করে তোলে, অর্থাৎ দেশে একদল টেকনোক্র্যাট (শিক্ষিত কারিগর) সৃষ্টি করে — যারা মানবিক লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত, মানুষের প্রতি এবং সমাজের প্রতি যাদের কোনো দায়িত্ববোধ নেই, যারা চাকরিকে এবং গোলামিকেই সর্বস্ব বলে মনে করে, পয়সার বিনিময়ে তারা যা কিছু করতে পারে এবং এইভাবে বিজ্ঞানের চর্চা ও বিদ্যাকে তারা প্রতিহত করে। অপরদিকে যত অধ্যাত্মবাদ, সেকেলে যত রকমের কুসংস্কার, যত যুক্তিহীন মানসিকতা এবং অন্ধতাকে গড়ে তোলে। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ, তমসাচ্ছন্ন ভাবনাধারণা এবং যুক্তিহীনতার সাথে কারিগরি বৈজ্ঞানিক বিদ্যার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এরকম ঘটনা যখন দেশে ঘটে তখন যুক্তিবাদী মন দেশে মরে যায়। তাই বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কেও আমি হুঁশিয়ার করে বলেছিলাম, যে বামপন্থীরা শক্তিবৃদ্ধির জন্য আলাপ-আলোচনার দ্বার বন্ধ করে দিয়ে গায়ের জোর প্রয়োগ করার নীতি গ্রহণ করে, যেহেতু তাদের শক্তি এবং দলবল বেশি বলে তা তখনকার মতো ডিভিডেন্ড (সুবিধা) দেয়, তারা কাউকে মুখ খুলতে দেয় না, কোনো যুক্তিতে কর্ণপাত করে না, তাদের কর্মীরা নিজেরা যুক্তি করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে এবং অপর মানুষের মধ্যেও এই মানসিকতা নষ্ট করে দেয় — তারা কি জানে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া কী? অসম্ভব মনে হলেও বাস্তব সত্য এই যে, যারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে, যারা কমিউনিজমের কথা বলছে, যারা বামপন্থার কথা, সংগ্রাম-বিপ্লবের কথা বলছে এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ছে, তারাই আবার তাদের আচার-আচরণের দ্বারা এমন একটা যুক্তিহীন মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করছে যার পরিণতিতে গিয়ে সেই বামপন্থারই কবর খোঁড়া হবে, ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান হবে। কারণ, দেশের জমিতে যখন যুক্তিবাদী মন মরে যায় তখনই প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা সমাজজীবনে প্রবেশের সহজ রাস্তা সৃষ্টি হয়।

"... বহুদিন আগে, ১৯৬৬ সালে — তখনও বামপন্থীরা পশ্চিমবাংলায় সরকারে যায়নি — এই ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে-ই আমি একটা কথা বলেছিলাম। আমার সেই কথা শুনে সেদিন অন্যান্য সমস্ত বামপন্থী দলের নেতারাই খুব চটে গিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, বামপন্থী দলগুলো কংগ্রেসের দুর্নীতি নিয়ে বক্তৃতা করছে, ঠিকই করছে — এ নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই; কারণ ক্ষমতা পাওয়ার পর কংগ্রেস নেতৃত্বের চরিত্রই তাই হয়ে গিয়েছিল; যেহেতু কংগ্রেস পুঁজিবাদকে

প্রতিষ্ঠিত ও সংহত করার চেষ্টা করেছে, সেজন্য আজকের যুগে এটাই তাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি — এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।"

"...কিন্তু বামপন্থীদের আমি সেই '৬৬ সালে বলেছিলাম যে, তাঁরা কি আয়নায় নিজেদের মুখ দেখেছেন? তাঁরা তো তখনও ক্ষমতায় যাননি। কিন্তু লক্ষ্য করেছেন কি, ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই তাঁদের ঘরের মধ্যে হু হু করে বানের জলের মত দুর্নীতি ঢুকে বসে আছে? তাঁরা তো তখনই দুর্নীতিপরায়ণ। তাহলে তাঁদের নিজেদের ঘরে যে দুর্নীতি ঢুকেছে, আমি বলেছিলাম, তার বিরুদ্ধে লড়াই করুন। বলেছিলাম, ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই যাঁরা দুর্নীতিপরায়ণ, ক্ষমতা পেলে তাঁরা কী করবেন? তাঁরা তো সর্বনাশ করে ছাড়বেন। বামপন্থার ঝাণ্ডা উড়িয়েই তো তাঁরা গোটা দেশকে উচ্ছন্নে নিয়ে যাবেন। আমার একথা শুনে বামপন্থী নেতারা খেপে গেলেন। নানান ঘটনা থেকে আমি সেদিন এই যে কথাটা বলেছিলাম, সেই ইতিহাসের মধ্যে এখন আর যেতে চাই না। আমি বলেছিলাম, বামপন্থী আন্দোলন একটা বাস্তুঘুঘুর আড্ডা হয়েছে। তাঁরা বলেন একটা, করেন আর একটা। তাঁদের মধ্যে কোনো রকমের স্ক্রুপ্‌ল্‌ নেই। এমনকী 'ওয়ার্ড অব অনার' (কথার দাম) বলে বুর্জোয়া রাজনীতির যে একটা সাধারণ রীতি ছিল, সেই জিনিসটুকুরও কোনো মূল্য তাঁরা দেন না। যদি কেউ তাঁদের প্রশ্ন করে — 'আপনারা বলেছিলেন এইরকম, এখন আর একরকম করছেন কেন?' সঙ্গে সঙ্গে নির্বিকারচিত্তে তাঁরা হেসে উত্তর দেন — 'ও বলেছিলাম নাকি? তা বলেছিলাম তো কী হয়েছে। এইরকম হয়েই থাকে।' অথবা সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদের তত্ত্বকথা আউড়ে বলে দেন, 'সত্য তো পরিবর্তনশীল। বলেছিলাম বলেই যে বিপ্লবের প্রয়োজনে কথাটা রাখতে হবে, তার কী মানে আছে?' অর্থাৎ তাঁদের ব্যাপারটা অনেকটা 'আর্ষ প্রয়োগে'র মতোন — যখন যা বলেন, সেটাই ঠিক। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ থেকে তাঁরা সুবিধা অনুযায়ী অন্তত এইটুকু বুঝেছেন যে, যেহেতু ভগবান নেই, ধর্মীয় অর্থে পাপ-পুণ্যের বালাই নেই, নরকবাসের বালাই নেই — সুতরাং ভয় কী? ফলে, তাঁদের হচ্ছে, যখন যেমন তখন তেমন — অর্থাৎ তাঁদের নীতিরও কোনো বালাই নেই।"

"... আমাদের দেশে যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে তার কারণ, পুঁজিবাদ এবং বুর্জোয়াদের ষড়যন্ত্রই শুধু নয়, বুর্জোয়া ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবক্ষয়ী সংস্কৃতি বামপন্থী আন্দোলন এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনের ভিতরে পর্যন্ত ঢুকে তাকে মেরে দেওয়ার চক্রান্ত করছে এবং ইতিমধ্যেই তা ভিতরে ঢুকেছে। অসহিষ্ণুতা, অশালীনতা, গালাগালি, অপর দলের রাজনীতির সমালোচনা করে ভুল দেখানো নয়, অপরের বিরুদ্ধে যা নয় তাই বলা, যে কথা সত্য নয় সে কথা বলা, মিথ্যে কথাকে গল্পের মতো করে বলা, কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রবণতা, জিদ, উগ্রতা, অন্ধতা — এইসব মানসিকতা বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেও যে আজকাল দেখা যাচ্ছে, এটা কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বুর্জোয়াদের ষড়যন্ত্র হলেও, বুর্জোয়া ষড়যন্ত্রের কুফল হলেও, এ আমাদের বামপন্থীদের ভিতরেও ঢুকেছে। বামপন্থী দলগুলিও অনুরূপ আচরণের দ্বারা এই অবক্ষয়ের ধারাকেই ত্বরান্বিত করছে এবং বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে ঘুণ ধরিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের কোমর ভেঙে দিচ্ছে। তাই এগুলোর বিরুদ্ধেও আমাদের লড়তে হবে।"

"... বুর্জোয়াদের চক্রান্ত হচ্ছে, অতি সুকৌশলে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দাও, নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দাও। লোভ, কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রবণতা, অশালীনতা, হীনমন্যতা, তোষামোদ, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তোষামোদ — তোষামোদ করা একটা অপরাধ, আর যারা তোষামোদ করে তাদের খাতির করা তার চেয়েও ঘৃণিত অপরাধ — এই সমস্ত নীচ বৃত্তিগুলো অতি স্বাভাবিকরূপে সমাজের মানুষের মধ্যে চালু করে দাও। তাই তারা অতি সুন্দরভাবে সংস্কৃতির স্বাধীনতার নামে নানা যুক্তিজাল বিস্তার করে মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটাতে সমস্ত দিক থেকে সাহায্য করছে। তারা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চাইছে, মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে দিতে চাইছে, মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে অনীহা এনে দিতে চাইছে এবং তাদের মূল্যবোধগুলিকে ধুলিসাৎ করে দিতে চাইছে।

তাই দেখবেন, আমাদের দেশে যুবকরা বলে, পয়সা না দিলে কাজ করা যায় না। ও কংগ্রেসও দেয়,

কমিউনিস্টরাও দেয়। পয়সা ছাড়া কি আবার কাজ করা যায় নাকি? এস ইউ সি আই-এর কর্মীরা যখন মুখে রক্ত তুলে রাস্তা-ঘাটে অর্থ সংগ্রহ করে, ওদের ধারণা এরা সব পয়সা পায়। তারা আমাদের কর্মীদের জিজ্ঞেস করে। কারা জিজ্ঞেস করে জানেন? শুধু কংগ্রেসীরা নয়, অনেক তথাকথিত বামপন্থী, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং সমাজতন্ত্রী দলের কর্মী-সমর্থকরা পর্যন্ত আমাদের কর্মীদের প্রশ্ন করে, আপনাদের কত দেয়? আমাদের কর্মীরা বলে, আমাদের কিছু দেয় না। আমরা আমাদের আর্দশের জন্য লড়ি। তারা বিশ্বাস করতে চায় না। বলে, এইরকম হয় নাকি? আমাদের কর্মীরা প্রশ্ন করে, কেন ক্ষুদিরাম লড়েনি? তারা বলে, ওসব বড় বড় কথা ছাড়ুন, ওসব শুনতে ভাল, কিন্তু ওসব হয় না। যারা রাজনীতি করছে, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, তাদের মধ্যেও এই মানসিকতার বিস্তার হয়ে যাচ্ছে। তারা বলছে, পয়সা দাও তবে কাজ হবে। ভলান্টিয়ার হবো, পয়সা দাও। দলের কাজ করবো, পয়সা দাও। পোস্টার লাগাবো, পয়সা দাও। ইলেকশনে কাজ করবো, পাঁচ টাকা করে রোজ দাও। দলের হয়ে মারপিট করবো, দু'টাকা করে দাও। একটা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে রূপান্তরিত হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। এই মানসিকতা কংগ্রেসই প্রথম সৃষ্টি করেছে। এটা একটা মারাত্মক জিনিস। ইউরোপে এইভাবেই ফ্যাসিজম এসেছিল। এই যে বেকার সম্প্রদায়, তার একটা বিরাট বাহিনীকে সেখানে মুসোলিনী এবং হিটলার টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে দুর্ধর্ষ নাৎসি বাহিনীতে রূপান্তরিত করেছিল। কংগ্রেসও সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছে।"

"... যখন পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখনও আমি এ বিষয়ে বারবার বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তখন আমাদের কথা কেউ শুনতে চায়নি। বরং আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে, আমরা নাকি ডিস্‌রাপ্‌টার (বিভেদকামী), আমরা ঐক্য নষ্ট করছি। ঐক্যের স্বার্থে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের স্বার্থে যখনই কোনো দলের কোনো ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমরা বলতে গিয়েছি তখনই ঐক্যবিরোধী বলে ব্যুয়িং করে, শোরগোল করে আমাদের বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। অথচ, সেই ঐক্য গড়ে উঠে কী হল? ঐক্য তো গড়ে উঠেছিল। লক্ষ লক্ষ লোক এখানে সমবেত হয়েছিল। তাদের সমর্থনও যুক্তফ্রন্টের পিছনে ছিল। তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল কী করে? আমার মনে পড়ে, আমি তখনও এই বিপুল জনসমর্থনের নৈতিকতার মানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলাম যে, এই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের সমর্থন দেখে যাদের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তারা দুনিয়ার ইতিহাসের গতি লক্ষ করেনি। তাদের বোঝা দরকার যে, এই সমর্থনটাই আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, এই বিপুল জনসমর্থনের রাজনৈতিক চেতনার মান, সাংস্কৃতিক মান ও নৈতিক মান কতটুকু? যে মানুষগুলোর সমর্থন আমরা পাচ্ছি সেই মানুষগুলোর নিম্নগামী সংস্কৃতিগত মানের দিকে আমরা এতটুকু লক্ষ রেখেছি? বরং তারা আমাদের সমর্থন করছে বলে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে আমাদের অসুবিধে হবে বলে তাদের যে কোনো কাজকেই আমরা সমর্থন করেছি।

"... সি পি আই (এম) যখন সরকারি ক্ষমতায় ছিল, পুলিশ যখন তাদের পিছনে ছিল — আমি ১৯৬৯-৭০ সালের কথা বলছি — তখন তাদের দলের কর্মীদের মধ্যে ছিল ভয়ানক বিপ্লবী ভাব, লড়াকু ভাব, একেবারে 'লড়কে লেঙ্গে' ভাব। সমস্ত কথায় 'বাঁচতে গেলে লড়তে হবে' স্লোগান ছাড়া কোনো কিছু তাঁরা বলতেন না। এখন অবশ্য এ সব স্লোগান তাঁরা তোলেন না। এখন তাঁরা একটা অদ্ভুত তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, এখন আন্দোলনের সময় নয়। তাঁদের দলের যারা কর্মী বা যুব সম্প্রদায়, যাঁদের ধরা হয় যে, আদর্শের জন্যই তাঁরা লড়ছেন, তাঁদের দলে গিয়েছেন — যদি আদর্শের জন্যই দল তাঁরা করে থাকেন, তাহলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করে, বিপ্লবী আদর্শ গ্রহণ করে লড়বার জন্য, প্রয়োজন হলে মরবার জন্যই তো তাঁরা সংগঠন করতে এসেছেন? অথচ তাঁদের যিনি নেতা, আন্দোলনের মর‍্যাল যিনি দেবেন, তিনি এক মুখে বলছেন, তাঁরা বিপ্লব চান, তাঁরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী — যদিও এ কথাগুলোর তাৎপর্য কী, তা তাঁরা বোঝেন কি না সেসব আলাদা কথা — আবার সেই নেতাই আর এক মুখে বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন আন্দোলন হতে পারে না। কারণ তাঁরা বলছেন, এখন আন্দোলন হলে বহু লোকের প্রাণ যাবে, রক্তারক্তি হবে, বহু লোক মারা যাবে। তাহলে তাঁদের

কথার মানে তো এটাই দাঁড়ায় যে, তেমন সময়েই আন্দোলন হবে, বা তেমন আন্দোলনই তাঁরা করবেন, যাতে লোকজন কেউ মারা যাবে না, অথবা যদি কেউ মারাও যায়, তাহলে অপরপক্ষই শুধু মারা যাবে, তাঁদের কেউ মরবে না। এরকম একটা পরিস্থিতি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের মতে পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন হতে পারে না। এসব বক্তব্যের সাথে বিপ্লববাদের বা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সম্পর্ক কী, তা এইসব বড় বড় নেতারাই ভাল জানেন। আমি এত বড়ও নই, আর বুদ্ধিশুদ্ধিও আমার এত নেই। আমি এইসব বুঝতেই পারি না।

আমি সোজা কথাটা বুঝি যে, বিপ্লবী আন্দোলন এবং লড়াই যারা গড়ে তোলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা লড়াই শুরু করে, প্রথমে তাদের দিতে হয় বেশি, মরতে হয় বেশি, ত্যাগ করতে হয় বেশি। 'শুধু মারব সেজন্য লড়ব, মারতে না পারলে ভেগে যাব' — এই মনোভাব নিয়ে তারা লড়াই শুরু করতে পারে না। দরকার হলে মরবার জন্য প্রস্তুত হয়েই তারা লড়তে আসে। তাদের মনোভাব থাকে, তারা মরবে তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে, তবু তারা লড়াই ছাড়বে না। এই মানসিকতার ভিত্তিতেই সব দেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং বিপ্লবী আন্দোলনের জমি তৈরি হয়েছে। এইভাবেই একটি একটি ইঁট গেঁথে বিপ্লবীরা বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করেছে, তবে বিপ্লব হয়েছে। আর এখানে সাহসের ভিত্তি বা মূলমন্ত্র হ'ল পুলিশের 'প্রোটেকশন'! পুলিশের প্রোটেকশন ছাড়া তাঁরা লড়াই করতে পারেন না। অথচ বিপ্লব সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাঁরাই জানেন, পুলিশ তো কোন ছার, বিপ্লবে আসল লড়াই হবে সশস্ত্র মিলিটারি বাহিনীর সঙ্গে, রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে। এই প্রবল রাষ্ট্রশক্তির তুলনায় পুলিশ যে কিছুই নয় — এই কাণ্ডজ্ঞানও যাদের নেই, তাদের তো বিপ্লবের কথা চিন্তা করাই চলে না। বিপ্লব হচ্ছে, একটা সংগঠিত, সশস্ত্র রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে জনগণের লাগাতার, দীর্ঘস্থায়ী, সচেতন, সংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রাম। যতক্ষণ সশস্ত্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তি রয়েছে ততক্ষণ শাসকশ্রেণি বিনা লড়াইয়ে এবং বিনা প্রতিরোধে বিপ্লবের রাস্তা ছেড়ে দেবে না। এই তো হ'ল বিপ্লবের 'ভেরি ফান্ডামেন্টাল, এলিমেন্টারি, সিম্প্‌ল্' (একেবারে মৌলিক, প্রাথমিক এবং সহজ সরল) কথা। তারপরে তো বিপ্লবের নানা জটিল তত্ত্ব ও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের প্রশ্ন।

"... ভারতবর্ষের মানুষ বারবার মার খাচ্ছে। তারা বারবার আন্দোলনে আসছে, বারবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আবার তারা আন্দোলনে আসবে। কিন্তু, এই কাজটি না হলে অতীতেও আন্দোলনগুলোর যে পরিণতি ঘটেছে, ভবিষ্যতেও আবার তাই-ই হবে। আমি শুধু আন্দোলনে পরাজয় হয়েছে বলেই এইকথা বলিনি। আমি জানি, সমস্ত দেশের বিপ্লবী নেতারাও জানতেন এবং এ যুগের একজন মহান বিপ্লবী নেতা তাঁর নিজের একটা বিখ্যাত লেখায় বলেছেন যে, সমস্ত দেশের বিপ্লবী আন্দোলনই প্রথমে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। আবার আসে তার পরাজয়। আবার আসে তার পরাজয়। আবার সে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। এইভাবে একটার পর একটা পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হতে শেষপর্যন্ত বিপ্লব বিজয়প্রাপ্ত হয়। এই কথাটার দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি পরাজয় প্রথমে এইজন্যই হয় যে, বিপ্লবের পক্ষে জনসমর্থন যতই থাকুক এবং বিপ্লবের আয়োজনটা সশস্ত্র সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই হোক, আর শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের সংগঠনের রূপেই হোক — যে যে মতের পৃষ্ঠপোষকই হোন না কেন — প্রথম অবস্থায় দুর্দান্ত রাষ্ট্রশক্তির সাথে তুলনায় সে থাকে দুর্বল। ফলে, আঘাত আসে, পরাজয় আসে। কিন্তু, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক লাইন সঠিক থাকলে, নেতৃত্ব সঠিক থাকলে, প্রতিটি পরাজয়ের মধ্য দিয়ে জনশক্তি হয় আরও সংগঠিত, আরও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এবং জনগণের সংগঠন হয় আরও শক্তিশালী। ফলে, প্রতিটি পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সে ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করে।"

"...আমাদের নতুন আদর্শ চাই। সমাজ একটা নতুন আদর্শের জন্ম দেওয়ার যন্ত্রণায় কাঁপছে। কী সেই আদর্শ, যে এই জগদ্দল পাথরের শৃঙ্খলকে ভাঙতে পারে? তা হল সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ, সর্বহারা বিপ্লবের আদর্শ, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের আদর্শ। এই আদর্শে যদি দেশের মানুষকে আমরা উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করতে পারি, সংগ্রামকে গড়ে তুলতে পারি তাহলে দেখব আবার দেশের মধ্যে সেই নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।"

"... একটু চোখ বুজে আমাদের দেশের ইতিহাসটা

ভাবতে থাকুন, দেখবেন এ দেশে লড়াই বার বার হয়েছে। এ কথা তো কেউ বলতে পারবে না যে এদেশের যুবকরা, শ্রমিকরা, দেশের মেহনতী জনসাধারণ লড়তে চায়নি, ময়দানে লড়তে নামেনি, জেলে যেতে তারা ভয় পেয়েছে, জান দিতে তারা ভয় পেয়েছে, কোরবানি করতে ভয় পেয়েছে। এ কথা বলার সাহস কারোরই হবে না।"

"... সংগ্রাম আপনাদের করতেই হবে। এমন কথা নয় যে আপনারা লড়বেন না। পেট বড় বালাই। আজ যদি ভাবেনও যে লড়াই করে কিছু হবে না — দু'দিন বাদেই আবার লড়াইয়ের ময়দানে নামতে আপনাদের হবেই। ইতিমধ্যেই তার আভাস দেখা যাচ্ছে। হাজার হাজার লোক মাঠে-ময়দানে আসবেন, লড়াই শুরু করবেন কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হবে না। অবস্থা পরিবর্তন করতে গেলে দরকার সেই তিনটি জিনিস — সঠিক মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব এবং সঠিক বিপ্লবী পার্টি। এ যদি না থাকে, রাস্তা যদি ভুল হয়, তাহলে সততা, কোরবানি, সংগ্রাম কোনো কিছুর দ্বারাই আপনারা সামনে দিকে এগোতে পারবেন না। তাই আবার সেই লেনিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলি — যত গণতান্ত্রিক আন্দোলনই করুন, যত দাবিদাওয়া নিয়ে লড়ুন, শহিদ দিবস করুন, বুকের রক্ত ঢেলে দিন, ধর্মঘট ও আন্দোলনে পুলিশের সাথে যতই মোকাবিলা করুন — আপনারা যে গোলাম সেই গোলামই থাকবেন। যে পুঁজিবাদ সেই পুঁজিবাদই থাকবে, শোষণ অব্যাহত থাকবে। দশ টাকা, তিরিশ টাকা মাইনে হয়তো বাড়বে। কিন্তু বাজারে জিনিসপত্রের দাম এমনিই বেশি, এর উপর বাড়বে অনেকগুণ বেশি। আবার মাইনে বাড়ানোর জন্য লড়বেন, রক্ত ঢালবেন, পাঁচ টাকা বাড়াবেন, ফের জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। শুধু তাই নয় — এই অনিশ্চয়তা, উদ্দেশ্যহীনতা নৈতিক জীবনেও অবক্ষয় ডেকে আনবে। যে সুখের স্বপ্ন দিয়ে পরিবার গড়ে তুলেছেন, পরিবারের মধ্যে, আপনার একান্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেও বর্তমান সমাজের যে 'সোস্যাল ম্যালাডি' (সামাজিক ব্যাধি) রয়েছে তার ছাপ পড়বে, সেগুলো ঢুকে যাবে। আপনি সুখের পরিকল্পনা করে, অনেক স্বপ্ন নিয়ে ঘর গড়েছিলেন। ঘরে গিয়ে দেখবেন সে সংসারও থাকছে না। যে স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতে যাচ্ছেন সেখানেও দেখবেন শান্তি নেই, ভালবাসা নেই। যে সন্তান-সন্ততির জন্য নিজে কষ্ট স্বীকার কম করছেন না, এমনকী কোনো কিছুরই পরোয়া করেননি, সেগুলিই দেখবেন — এক একটা এক এক মূর্তি — কোনটা চিত্রাভিনেতার চেলা, কোনটি কোথাকার কোন্ খেলোয়াড়ের চেলা হয়ে বসে আছে। অর্থাৎ এক কথায় আপনি আপনার 'কিথ্ অ্যান্ড কিন্'-দের (আত্মীয় পরিজনদের) নিয়ে একদম বিচ্ছিন্নভাবে — সাতে নেই, পাঁচে নেই, ঝুট্ঝামেলায়, রাজনীতিতে কোনো কিছুতেই নেই, শুধু চাকরি-বাকরি আর খাওয়া-দাওয়া ঘুমের মধ্যে থেকেও নিজেকে এর হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না। সামাজিক সমস্যার ভূত আপনার ঘরে গিয়ে ঢুকবে। আপনার ব্যক্তিগত জীবন বিষাক্ত করে দেবে। ভালবাসা নষ্ট করে দেবে। আপনার স্নেহ-মমতা পর্যন্ত ধ্বংস করে দেবে। বাঁচতে হলে লড়াই আপনাদের করতেই হবে। আর এই লড়াইটা করতে হবে বিপ্লবের রাস্তায়। বিপ্লবের রাস্তা মানে 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলে শুধু চিৎকার নয়। বিপ্লবের সঠিক স্তর, রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে সঠিক সুস্পষ্ট ধারণাকে ভিত্তি করে, সঠিক বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে মজুরদের যদি সংগঠিত করতে পারেন, উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষায় যদি শিক্ষিত করে তুলতে পারেন তবেই আপনারা জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে পারবেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তখনই আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, ভারতবর্ষের কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষগুলো দেখবে বিপ্লবের মুখ। তার আগে পর্যন্ত শুধু বিক্ষোভ আর পরাজয়। শুধু বিস্ফোরণ আর পরাজয়। এর হাত থেকে মুক্তি, সমাজের মুক্তি, মানুষের মুক্তির রাস্তা একটাই — তা হ'ল বিপ্লবের রাস্তা। এছাড়া ভিন্ন কোন পথ নেই।" □

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

(১১ ও ১২ জুন ২০১৬, বাংলাদেশের 'চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে'র প্রথম কেন্দ্রীয় কর্মশালা ও শিক্ষাশিবিরে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক মুবিনুল হায়দার চৌধুরী দুটি অধিবেশনে একটি অমূল্য আলোচনা করেন।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তিনি তুলে ধরেন। ভারতের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের কাছেও এই আলোচনাটি অত্যন্ত মূল্যবান। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের এটি পড়া দরকার বলে আমরা মনে করি। 'চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে'র পক্ষ থেকে পুস্তিকা আকার এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই মূল্যবান সামান্য সম্পাদনা সহ আলোচনাটি আমরা এই সংখ্যা পথিকৃৎ-এ প্রকাশ করছি।— সম্পাদক, পথিকৃৎ)

কমরেড সভাপতি, পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ, সারা দেশ থেকে আসা চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রতিনিধিবৃন্দ,

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে উৎসাহী কমরেডরা এখানে সমবেত হয়েছেন। এদের কেউ কেউ পারফর্মিং আর্টে কিছুটা অংশ নিতে পারেন, সবাই নন। সবাই যে পারফর্মার হবে তা নয়, অনেকেই সংগঠক হিসেবে থাকবে, শলা-পরামর্শ দেওয়ার জন্য থাকবে। আমরা দলের বিভিন্ন ফ্রন্টে যখন কাজ করি তখন কিছু মানুষের বিশেষ ধরনের পেশা, বিশেষ ধরনের শ্রেণি অবস্থানকে কেন্দ্র করেই মূলত কাজটা করি। এ সব জায়গায় ঘুরতে গিয়েও আমরা কিছু মানুষ পাবো যারা এই ক্ষেত্রটিতে উৎসাহী। তাদেরকেও তখন আমরা এ ক্ষেত্রে যুক্ত করব। ফলে অন্য সকল ফ্রন্টের কাজের সাথে এই ফ্রন্টের কাজ বিরোধাত্মক নয়, বরং ঠিক ভাবে বুঝলে সব জায়গা থেকেই আমরা কিছু লোক বের করতে পারব।

এই কথাটা আমি শুরু করলাম এই কারণে যে, আমাদের দলে কর্মী সংখ্যা এমনিতেই কম। সারা দেশের তুলনায় আমাদের দল খুবই ছোট। ফলে একজনকেই অনেক কাজ করতে হয়। এখানে উপস্থিত 'চারণে'র অনেক কর্মীই একাধিক ফ্রন্টের সাথে যুক্ত। তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানে একটা প্রশ্ন এসেছে যে, একজন কর্মী এতগুলো কাজ ঠিকভাবে সমন্বয় করতে পারবে কি না এবং একজনকে এতগুলো কাজে লাগানো ঠিক কি না?

আমি আমার শুরুর কথার সাথে এটাও যোগ করতে চাই যে, প্রতিটি ক্ষেত্রের আন্দোলন একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত। এটি না বুঝে, একটির সাথে আরেকটির সংযোগ সাধন না করে যদি আমরা আংশিকভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিরাট কিছু করে ফেলতে চাই তাহলে সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনে নিজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা পালন করতে পারব না। কোনো মানুষের যদি দশটি কাজ থাকে, তাহলে দশটি কাজই তার কাছে সমান হয় না। এর মধ্যে প্রধান কাজ কোনটি? এটি কে নির্ধারণ করে? যে সামাজিক সংগ্রাম থেকে কাজের প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছে সেই সামাজিক প্রয়োজন থেকেই তা নির্ধারিত হয়। কিন্তু প্রত্যেকটিই দরকার। এটি না বুঝলে এই দরকারের ক্ষেত্রে আমার যে ভূমিকা সেটি যথার্থভাবে পার্টি আদায় করতে পারবে না। ছাত্র ফ্রন্ট যারা করে তারা কি নারীদের সংগঠনে ভূমিকা রাখতে পারবে না? পারবে। একজন ছাত্র ফ্রন্টের সংগঠক যেমন ছাত্রদের দাবি-দাওয়া, অধিকার ইত্যাদি নিয়ে লড়াই করবে, তেমনি যে প্রতিষ্ঠানে সে কাজ করে সেখানে নারীদের বিভিন্ন সমস্যা-সংকটকেও সে তুলে ধরবে। কিন্তু বাস্তবেই তা করবে কি না তা নির্ভর করে নারীদের অপমান-অবমাননা, তাদের উপর নির্যাতন — সেটি সে কতখানি নিজে বুঝে অন্যের মধ্যে তা সঞ্চারিত করতে পারে। অর্থাৎ আমি নিজে কতটা এই ব্যথা বেদনা অনুভব করে তার সঠিক প্রকাশ ঘটাতে পারছি এবং তার মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদে অন্যকে যুক্ত করতে পারি। আবার যেহেতু একজনের দুই-তিন এমনকি চারটে কাজও থাকে, সেহেতু একটির সাথে আরেকটির দ্বন্দ্ব হয়, তখন ঠিক করতে হয় তখনকার সময়ে কোনটি প্রায়র, কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ সবের সামাজিক প্রয়োজনবোধ না থাকলে নিজের মন মতো মতামত দেবেন। এটি চিন্তার গণ্ডগোল। এরকম হা-হুতাশ যারা করতে থাকেন তারা আসলে বিপ্লবী রাজনীতির যে মাহাত্ম্য, যে সৌন্দর্য, তার যে রসবোধ, যে হৃদয়বৃত্তি — তার খোঁজই পাননি। যে মানুষ উচ্চ মানবিকতায়, মূল্যবোধে উজ্জীবিত — তার কাজের আবার ফর্মা বাঁধা থাকে নাকি? যাকে যেখানে পাবে, যে ভাবে, যে প্রক্রিয়ায় তাকে বিপ্লবের কথা বোঝানো যায়— একজন বিপ্লবী সবসময় সেই চেষ্টাই করবে। ধরা যাক একজন আইনজীবীকে সে পেলো, তাকে সে তখন আইনের যে অসামঞ্জস্যতা অর্থাৎ কনট্রাডিকশন অব জুরিস্প্রুডেন্স বোঝাবে। একজন বিজ্ঞানীকে পেলে সে বিজ্ঞানের যে সংকট সেটি বোঝাবে। বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটছে না। বিজ্ঞানকে পুঁজিবাদ তার মুনাফার বৃত্তে আটকে রেখেছে। বিজ্ঞানের মুক্তির জন্যে সে বিজ্ঞানীদের উদ্বুদ্ধ করবে।

উপলব্ধি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন রাজনীতি সচেতন কমরেডকে বিপ্লবী রাজনীতির সার্বিক প্রয়োজনকে বুঝতে হবে। আপনারা সে ভাবেই বিষয়টিকে দেখবেন। আমি আর এ ব্যাপারে কথা বাড়াবো না।

শুধু অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, মননের ক্ষেত্রে, মানবিকতা-মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে কষ্ট-দুঃখ এগুলো দিয়েও মানুষকে উজ্জীবিত করা যায়। মানুষকে দেখাতে হবে, আপনার যে মানসিক কষ্ট, তা কোথা থেকে সৃষ্টি হল? আপনি কি মানসিক কষ্টের মধ্যেই জন্মেছেন? তা যদি না হয় তাহলে জন্মাবার পরবর্তীকালে আপনার যে মানসিক যন্ত্রণা সেটি কিন্তু সামাজিক কারণ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, আমাদের দেশটা সকল দিক থেকেই একটা শ্রেণিবিভক্ত দেশ। এটি বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণি অর্থাৎ শোষক ও শোষিত শ্রেণি — এই দুই ভাগে বিভাজিত। আমরা জানি বা না জানি পরস্পরবিরোধী দুটি শ্রেণির লড়াই গোটা সমাজের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে চলছে। সমাজ অভ্যন্তরে 'অবজেক্টিভ ল' হিসেবেই তা চালু আছে। শোষক শ্রেণি জনগণকে তার আধিপত্যের মধ্যে রাখতে চায়। এ জন্য জীবনের যত ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থান আছে, সকল ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে তার চিন্তাধারা আছে। শাসকশ্রেণি তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ রক্ষাকারী রুচি-সংস্কৃতি, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধা এগুলি তৈরি করেছে। অর্থাৎ শোষক বুর্জোয়াশ্রেণির স্বার্থভিত্তিক যে সামাজিক ব্যবস্থা তার প্রয়োজনীয় ভাবাদর্শ তারা তৈরি করেছে। সকল মানুষ, সে জানুক বা না জানুক এই ভাবাদর্শগত কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের মধ্যেই বিরাজ করে। অর্থাৎ সে যা দেখে ভালবাসে, যা দেখে স্নেহ-মমতা প্রকাশ করে, যা দেখে শ্রদ্ধা-সম্মান দেয় তার পুরো কাঠামোটিই, এই সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে শোষকশ্রেণি যে ভাবগত পরিমণ্ডলটি তৈরি করেছে তার ভেতরে অবস্থান করে।

আমরা এখানে যারা মিলিত হয়েছি, আমাদের মধ্যেও তার প্রভাব আছে। কারণ, আমরা এ সমাজেই বাস করি। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে পেটিবুর্জোয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র বুর্জোয়া হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। এটি অতীতের ক্ষুদ্র মালিকানার সাথে সম্পর্কিত। আবার গ্রাম ও শহরে আমরা যাদের নিয়ে লড়ি, তাদের মধ্যে আছে গ্রামের দরিদ্র চাষি ও ভূমিহীন সর্বহারা আর শহরে কল-কারখানাভিত্তিক সর্বহারা শ্রমিক। এদের মধ্যেও অতীত সমাজের নানারকম শ্রেণিগত, রুচিগত, সংস্কৃতিগত সংযোগ আছে, তার রেশ আছে। এইভাবে সমাজের পেটিবুর্জোয়া অংশ, গ্রামের দরিদ্র চাষি ও ভূমিহীন সর্বহারা এবং শহরের সর্বহারা শ্রমিক এই সমস্তটা মিলে আমরা যে একটা বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করছি, তাতে আমরা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ভাবাদর্শগত পরিমণ্ডল ত্যাগ করে এই বিরাট, বিশাল বিপ্লবী সংগ্রামের পরিপূরক ভাবাদর্শ গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। অর্থাৎ নতুন সমাজের নতুন চিন্তা, তার রুচি-সংস্কৃতি, তার নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা ইত্যাদি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে একটা বিকল্প জীবন গড়ে তোলার লড়াই আমরা করছি। এই বিরাট জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে এই লক্ষ্যেই আমরা

সংগ্রাম পরিচালনা করছি।

এই মহাসংগ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণিকে উৎখাত করার জন্য, তার চিন্তাধারার বিপরীতে মানুষের মনোজগতে বিপ্লবের চিন্তা ক্রিয়া করার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "বিপ্লবের সমস্ত আয়োজনের সঙ্গে বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতির দিকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই মানসিক প্রস্তুতির বিষয়টি সংস্কৃতির সঙ্গে, নীতি নৈতিকতার সঙ্গে সরাসরি জড়িত।" এই সংগ্রামে সাংস্কৃতিক সংগঠনের দরকার কী? দরকার এই জন্য যে, প্রতিটি শ্রেণির নিজস্ব ভাবধারাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্য নিজস্ব সংগঠন দরকার। বুর্জোয়া ব্যবস্থার যত প্রভাব, যত রকমভাবে মানুষের আবেগের উপর তার ক্রিয়া করার ক্ষমতা আছে, তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সর্বহারা শ্রেণির ক্রিয়া করার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। বুর্জোয়াদের এরকম সংগঠন প্রচুর আছে। মধ্যবিত্ত পেটিবুর্জোয়াদেরও আছে। কিন্তু সর্বহারা শ্রেণির চিন্তা ধারণ করার মতো সংগঠন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ দেশে নেই। কারণ সর্বহারা শ্রেণির এরকম সাংস্কৃতিক সংগঠন সর্বহারা শ্রেণির পার্টি ব্যতিরেকে, তার ভাবগত পরিমণ্ডলে অবস্থান করা ব্যতিরেকে, সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির লড়াইয়ে অর্থাৎ শ্রেণিসংগ্রামে নানাভাবে অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে গড়ে উঠতে পারে না। 'চারণ'কে আমরা সেই সংগঠনরূপে দাঁড় করাতে চাই।

তাই, এটা অন্য যে কোনো ফ্রন্টের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এর লক্ষ্যও শ্রেণি উদ্দেশ্য ও শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করা। অন্যান্য গণসংগঠনের সাথে তার মূল দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পার্থক্য নেই। শুধু 'ফর্ম অব অ্যাকটিভিটির' অর্থাৎ কাজের ধরনের পার্থক্য আছে।

মনে রাখতে হবে যুগে যুগে যারাই সমাজকে পরিবর্তন করতে চেয়েছে, তাকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছে, তাদেরকে সেই উন্নত চিন্তাভাবনার পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছে। বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তির মুক্তি, ব্যক্তির স্বাধীনতা এই সকল চিন্তা সমাজে নিয়ে এসেছিল। কারণ সামন্ত সমাজে ব্যক্তি সামন্তী জবরদস্তির কাছে পুরোপুরি বন্দী ছিল। সেই ব্যক্তির নিজের স্বাতন্ত্র্য, পছন্দের স্বাধীনতা, ভালবাসার স্বাধীনতা, ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তি ধারণের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে তার অধিকারের কথা বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা নিয়ে এল। সামন্তি খবরদারিতে বন্দি মানুষ এরকম করে জীবনকে ভাবতও না। বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা তাদের এই সকল জিনিসের খবর দিল। সে তখন জীবনের আরেক রূপ দেখল। সেদিন বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা মানুষকে ভালবাসার জন্য কাঁদিয়েছে। সামন্ত সমাজে নারী-পুরুষ নিজেদের পছন্দের ভিত্তিতে পরস্পর সম্পর্কিত হতে পারত না, বাধা ছিল। বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা সাহিত্য সৃষ্টি করে সেই বাধা সম্পর্কে তার মধ্যে ব্যথা, বেদনা, কষ্ট নিয়ে এল। তাকে বিয়োগান্তক রূপ দিয়ে, বিচ্ছেদের বেদনা সৃষ্টি করে, মানুষের মধ্যে যন্ত্রণা তৈরি করে সেই সামাজিক ব্যবস্থাকে পাল্টাবার সংগ্রাম করল। এই কারণেই মানুষের সভ্যতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে রেনেসাঁর ভূমিকা বিরাট। রেনেসাঁ মানুষের মধ্যে 'ফ্রিডম অব চয়েস' অর্থাৎ পছন্দের স্বাধীনতার ধারণা নিয়ে এল। এই প্রশ্নে বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা যখন লড়ল, তখন সে তার ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য লড়েনি। সেটা আজকের 'ফ্রিডম অব চয়েস' দিয়ে বোঝা যাবে না। আজকের 'ফ্রিডম অব চয়েস' একটা সুবিধাবাদ। কিন্তু সেদিন সেটা ছিল একটা সামাজিক প্রয়োজন। সেদিনের প্রেমে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছিল ঠিক, কিন্তু সামাজিক বাধার বিরুদ্ধেও তাকে লড়তে হয়েছে। অর্থাৎ সামাজিকভাবে মানুষের এই অধিকার দরকার, এটা প্রতিষ্ঠার জন্যও তাকে লড়াই করতে হয়েছে। সামন্তী স্বৈরাচারী শাসনের মধ্যে যেহেতু পছন্দের স্বাধীনতা ছিল না, তাই সেদিন সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত পছন্দের স্বাধীনতা অর্জন অভিন্ন অবস্থানে ছিল। সামাজিক প্রয়োজন আর ব্যক্তিগত সুবিধা— এ দু'য়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। এটাকে আমাদের বুঝতে হবে।

বুর্জোয়া মানবতাবাদের উত্থানকালে তাই গোটা বিশ্বে যত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে এর সমস্তটাই মানুষকে কাঁদানোর জন্য। মানুষের মধ্যে অপ্রাপ্তির ব্যথা জাগিয়ে তোলার জন্য। তার যে অভাব, যে যন্ত্রণা, তাকে সাহিত্যের মাধ্যমে উন্নত শিল্প

ও শৈলীতে বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা প্রকাশ করেছে। আমরা শেক্সপিয়রের রোমিও-জুলিয়েট পড়লে দেখব, রোমিও ও জুলিয়েট দুই আলাদা সামাজিক-পারিবারিক অবস্থানের মানুষ হওয়ার কারণে তাদের মিলনে সামাজিক বাধা ছিল। কিন্তু 'ফ্রিডম অব চয়েস' এর জন্য লড়াই করতে গিয়ে তারা প্রাণ দিল। কেন দিল? তারা নবীন যুবক-যুবতী, পরস্পরকে ভালবেসেছে। কারণ, জাতপাত ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠে পরস্পরকে ভালবাসার সামাজিক আকাঙ্ক্ষা তখন তৈরি হয়েছে। সমাজচিন্তাকে ব্যক্তি বিশেষীকৃতভাবে ধারণ করে। সামাজিক যে আকাঙ্ক্ষা, যে দুঃখ, যে কষ্ট, যে বঞ্চনা ব্যক্তি তাকে ধারণ করে, তাকে প্রকাশ করে। তখন পুরনো সমাজ কর্তৃত্ব করতে এলে সে রুখে দাঁড়ায়। রোমিও-জুলিয়েটও এই বিদ্রোহ করতে গিয়ে জীবন দিল। কেবলই ব্যক্তিগত কারণে জীবন দেয়নি। শেক্সপিয়র এই দুটি সুকোমল যুবক-যুবতীকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সমাজের মধ্যে ব্যথা সৃষ্টি করতে চাইলেন। দেখাতে চাইলেন যে খুবই স্বাভাবিক-সাবলীল মানবিক অধিকার থেকে সমাজ তাদের বঞ্চিত করছে। বলতে চাইলেন যে, দেখো, তোমাদের সমাজ কত অকার্যকরী হয়ে গেছে, এ দিয়ে আর চলবে না, নতুন সমাজ লাগবে।

এই বুর্জোয়ারা 'ফ্রিডম অব চয়েস' এর সাথে সাথে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারের কথাও আনল, যাকে আমরা 'ইন্ডিভিজুয়াল রাইট টু প্রপার্টি' বলি। এই মালিকানার ধারণা পূর্বের সকল সমাজের মালিকানার ধারণা থেকে পৃথক। কারণ, সামন্তী সমাজে ভূমিদাসদের সম্পত্তির উপর মালিকানা ছিল না। সম্পত্তি ছিল ভূস্বামীর। সেই ভূস্বামী জমিতে কাজ করে ভূমিদাস জীবন চালাত। কিন্তু বুর্জোয়ারাই প্রথম সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা নিয়ে এল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চিন্তা নিয়ে এল।

সেটা রেনেসাঁর সময়, যখন বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন বুর্জোয়াদের কর্তৃত্বে এল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল, তখন তা ব্যক্তি মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবেই এল। তখন শ্রমিক সমাজের প্রয়োজনেই উৎপাদন করে, কিন্তু তার ফল ব্যক্তি মালিক আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ শ্রমের চরিত্র সামাজিক, কিন্তু মালিকানা ব্যক্তিগত। জনাকয়েক পুঁজির মালিক ছাড়া বাকি সবাই নিঃস্ব, সর্বহারা। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমালিকানা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লড়াইয়ের এই হল পরিণতি। সামন্তী সমাজের ভূমিদাসত্ব থেকে মানুষ মুক্ত হল, কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে এসে তারা মজুরি দাসে পরিণত হল। ফলে সমাজে তখন এক নতুন ধরনের দ্বন্দ্ব দেখা দিল। যে বুর্জোয়ারা ব্যক্তির মুক্তি, ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তিমালিকানা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এ সকল জিনিস সমাজে নিয়ে এসেছিল, তারা আর শেষ পর্যন্ত সমাজকে সেগুলো দিতে পারল না। ব্যক্তির মুক্তি শেষ পর্যন্ত আর হল না। কারণ বুর্জোয়ারা একটা শোষণমূলক সমাজ নিয়ে এসে ব্যক্তির শ্রমকে দাসত্বে আবদ্ধ করল। মানুষের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে দাসত্বের এই যে প্রভাব (যা দাস সমাজ থেকে শুরু হয়েছিল), তা যতক্ষণ চলতে থাকবে রকমের ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে। সামাজিক মালিকানা আসার পরও, অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ব্যক্তিমালিকানা না থাকলেও, মানুষের ভাবজগতে এর প্রভাব বহুদিন ধরে চলতে থাকবে। ব্যক্তির সাথে সমাজের পুরোপুরি আইডেন্টিফিকেশনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত অর্থে ব্যক্তির মুক্তি ঘটবে। দমনের যন্ত্র হিসেবে ইতিহাসে রাষ্ট্রের ভূমিকাও নিঃশেষ হবে। সেটা আরেকটা বড় বিষয়। সে সব নিয়ে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অপূর্ব আলোচনা আছে।

তাহলে, সমস্ত প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই যারা করবে, তারা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কী রকম আন্দোলন তৈরি করবে? এ দেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন যারা করেছে, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন যারা করেছে, তারা নাটক, গান ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের উপর প্রভাব ফেলবার চেষ্টা করেছে। কারণ তারা দেখেছে যে, অতীতে ধর্মীয় ভাবাদর্শ মানুষকে যাত্রা, গান, সুর করে পুঁথি পাঠ প্রভৃতি দিয়ে প্রভাবিত করেছে। ধর্ম প্রচারকেরা পায়ে হেঁটে হেঁটে, গান গাইতে গাইতে, ভক্তির সঙ্গে, রসের সঙ্গে ধর্ম প্রচার করেছেন।

এর পেছনেও ছিল সেই সময়ের সামাজিক প্রয়োজন। ইতিহাসের বহু কথা আমরা এখানে আলোচনা করতে পারব না। কারণ সে সময় নেই, তা না হলে আমরা দেখাতে পারতাম যে, মানব ইতিহাসে ধর্ম একসময় সামাজিক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে কী ভাবে সমাজে এসেছে, আবার চলতে চলতে ইতিহাসের আরেকটি পর্যায়ে কী ভাবে সে অবক্ষয়ী হয়ে গেল! ধর্ম যে অবক্ষয়ী হয়ে গেছে। সে ব্যাপারে একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সকলের আছে, সেটা প্র্যাকটিকাল অভিজ্ঞতা। তা হল এই যে, আজকের দিনে মানুষ ধর্ম মানে না। মানে না কেন? আগে মেনেছিল কেন? আবার কোনো নীতি আদর্শ না মেনে কি মানুষ মানুষ থাকতে পারবে? উচ্চতর মানবিক জীবনের দিকে যেতে পারবে? নীতি-আদর্শ মানতে হবে। মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নীতি-আদর্শ নৈতিকতা-অনুশাসন-বিধান ইত্যাদি ছাড়া মানুষের চলে না। জন্তু-জানোয়ারের মতো মানুষের চলে না। মানুষ সভ্য এবং মানুষের জীবনে একটা কালেকটিভনেস অর্থাৎ যৌথতা আছে। এ কারণে তাদের যৌথভাবে চলতে হয়। এই ঐক্যবদ্ধতা তৈরি করার জন্য ধর্ম সমাজে এসেছিলে। বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে সুশৃঙ্খল অবস্থা আনার জন্য ধর্মের একটা ভূমিকা সমাজে ছিল। আবার ধর্ম যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে সেবা করার জন্য, শক্তি দেওয়ার জন্য এসেছিল — সেই সামাজিক ব্যবস্থাটা অকার্যকরী হয়ে গেছে। তার পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের অভ্যুত্থান ঘটেছে। পুঁজিবাদের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা, তার রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যক্তিগত অধিকার — এই সকল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বুর্জোয়া মানবতাবাদের জন্ম হয়েছে। ওই যে ফ্রিডম অব চয়েসের কথা আলোচনা করলাম তার ভিত্তি তৈরি হয়েছে। এটি বললাম, এ কথা বোঝাবার জন্য যে, যত আদর্শ সমাজে এসেছে সকল আদর্শই একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তার উপরিকাঠামো হিসেবেই গড়ে উঠেছে, সেটার পক্ষে মানুষকে আনার জন্য সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য, গল্প, কাহিনী ইত্যাদি তৈরি করেছে।

তাই যে কোনো আদর্শ, যে কোনো মূল্যবোধ প্রচার করতে, তার প্রতি আবেগ সৃষ্টি করতে সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদির বিরাট ভূমিকা আছে। বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় পঞ্চকবির গানের উৎকর্ষতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, ডি এল রায় ও রজনীকান্ত — এই পঞ্চকবি। নজরুল, ডি এল রায়, অতুল প্রসাদের গান শুনলে আপনারা দেখবেন কী আবেগ, কী অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন তাঁরা গানে! দেশের প্রতি ভালবাসা থেকে কী অনন্য সুন্দর করে ভাষা সাজিয়েছেন! কী মমতা তাদের দেশের জন্য! গানের কথা, বাঁধুনি, সুর, লয় কী অপূর্ব! তার মধ্যে তেজ ও ভক্তি — দু'য়েরই সমন্বয় আছে। সার্থক গানে দুটোর মিলন প্রয়োজন হয়। এ দু'টোর মিশেলে আবেগ তৈরি করতে হবে।

রজনীকান্ত মূলত ভক্তিমূলক গানই লিখেছেন। তবে দেশাত্মবোধক গানও কিছু আছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তার লেখা গান 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু দেশপ্রেমের গান আছে নাড়িয়ে দেয়ার মতো। সে ব্যতীত তাঁর বেশিরভাগ গানই নিসর্গ ও আধ্যাত্মিকতার উপর। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার গানও যখন তিনি গভীরে ঢুকে করেছেন, তখন গানের মধ্যে যে প্রবল ভক্তি সৃষ্টি করছেন — সেটা লক্ষণীয়। ভক্তি কিন্তু একটা রস। উচ্চতর মানবিক রস। ভক্তি সমস্ত আদর্শের জন্যই দরকার। কেউ যখন সকল রকম সচেতনতার মধ্য দিয়ে একটি আদর্শকে সুনির্দিষ্টরূপে বোঝে, তার প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রকাশ করে, ধরতে পারে কোন চরিত্র এই আদর্শকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে — তখন তার প্রতি ভালবাসা ভক্তির রূপে, রসের রূপে প্রকাশ পায়। আন্দোলনে সেটি অনেক শক্তি-সামর্থ্য তৈরি করে।

পঞ্চকবির ধারায় বাংলায় আধুনিক গান সৃষ্টি করেছেন হিমাংশু দত্ত, কমল দাশগুপ্ত, সুধীন দাশগুপ্ত প্রমুখ। শিল্পী হিসেবে সুধীর লাল চক্রবর্তী, অখিল বন্ধু ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা সরকার, অঞ্জলী মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা ব্যানার্জী, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এবং পল্লীগীতিতে আব্বাস উদ্দিনসহ আরও অনেক শিল্পীর কণ্ঠে গাওয়া গানসমূহ বিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু সেই সময়ের গান, তার

সুরমাধুর্য, মনের আবেগকে প্রকাশ করার জন্য সুন্দর-সুললিত ভাষার প্রয়োগ এ সবকিছুর অস্তিত্ব এখন প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। এখনকার বাংলা গান সেই ধারার যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারেনি।

বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে রামপ্রসাদ বিসমিল, মুকুন্দ দাস গান লিখেছেন, গানে সুর দিয়েছেন। এদের গানে তেজোদ্দীপ্ততা ছিলো। সারা ভারতে এমন অনেকেই ছিলেন, যাদের কথা আমরা জানি না। হেমাঙ্গ বিশ্বাস মধ্যবিত্ত লোকেদের মনে জীবন সম্পর্কে সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সমস্ত দিক থেকে সর্বহারা শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে পারেননি, সেজন্য তাঁর প্রতিভা তাঁর সম্ভাবনার পরিপূর্ণ স্ফুরণ তিনি ঘটাতে পারেননি। আদর্শের বিকাশের যথার্থ নিয়মকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা, তাকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আছে এমন কোনো যথার্থ বিপ্লবী পার্টির গাইডেন্স তিনি পাননি। যেটা ছাড়া আজকের দিনে কেউ ব্যক্তিগতভাবে কিছু করতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে করে ফেলার ক্ষমতা একদিন বুর্জোয়াদের ছিল যখন বুর্জোয়ারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তির মুক্তির জন্য লড়াই করেছিল। এখন আর সেটা সম্ভব নয়। এটা আমি সাধারণ সত্য হিসেবে বলছি। কখনও কোনো জায়গায় কারও মধ্য দিয়ে কোনো ভাল জিনিস বেরিয়ে আসতেও পারে। যেহেতু মানুষের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা এখনও অপূরিত রয়ে গেছে, তাই কখনও বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে কারও মাধ্যমে কোনো সুন্দর শিল্প সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

তাই সঙ্গীত যারা তৈরি করবে, যারা চর্চা করবে তাদের শ্রেণিসচেতন হতে হবে। অনেকে আবার প্রশ্ন করেন যে সঙ্গীতের মধ্যে আবার শ্রেণি কী? আমি বলছি, আছে। একটা গান শুনে মানুষ ভীষণ হতাশায় ভুগতে পারে। কেউ হয়তো সে রকম গান সারাক্ষণ গুণগুণ গুণগুণ করতে করতে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। বিরহ-ব্যথা তাকে এমনভাবে মুহ্যমান করে দেয় যে, তাকে সমস্ত মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে গান বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কোনো ব্যথা, কাউকে হারানোর ব্যথা এতখানি বড় হওয়া উচিত নয় যে, তা জীবনে বেঁচে থাকার, মানুষের জন্য বেঁচে থাকার, কর্তব্যের জন্য বেঁচে থাকার যে তাৎপর্য, তার সবকিছুকে ধুলিসাৎ করে দেয়। গান অনেক বড় মানুষ তৈরি করতে পারে, অনেক মানুষকে বড় করতে সহায়তা করতে পারে। গান মানুষের মনুষ্যত্বকে নাড়িয়ে জাগিয়ে দিতে পারে, তাকে শৌর্যে-বীর্যে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে, তাকে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। আবার গান মানুষের প্রবৃত্তির শক্তিকে নাড়িয়ে দুলিয়ে তাকে ক্ষেপিয়ে তুলে কামুকে পরিণত করতে পারে, নেশাগ্রস্ত করতে পারে, বিরহ বেদনা-বিচ্ছেদে হতাশ করে দিতে পারে। সুতরাং সঙ্গীতের একটা রূপ সমাজ অভ্যন্তরে চলতে থাকা বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামে শিল্পরূপে প্রলেতারিয়েতকে সাহায্য করতে পারে। আবার আরেকটা রূপ যুবশক্তিকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হয়ে বুর্জোয়াদের সহায়তা করতে পারে। ফলে গান শুধু গান নয়, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে গানের শ্রেণি চরিত্র আছে। আপনাকে ঠিক করতে হবে শোষক শোষিতের মধ্যে যে শ্রেণিসংগ্রাম সমাজে নিয়ত চলছে তাতে আপনি কোন পক্ষের। যখন আপনি আপনার পক্ষ ঠিক করতে পারবেন তখনই আপনি এটাও ঠিক করতে পারবেন যে, কোন ধরনের গান সমাজের মধ্যে, সমাজের যুবশক্তির মধ্যে প্রসার লাভ করা উচিত। এই যে আমার কখনও এটা ভাল লাগে, কখনও ওটা ভাল লাগে, কখনও সবই ভাল লাগে, কখন যে কোনটা ভাল লাগে তা যেন আমি নিজেই বুঝতে পারি না— এসব যে আমাদের হয়, এটা হয় সমাজ সচেতনতার অভাবের কারণে। অন্ধের মতো ভাল লাগা নির্ধারণ করার কারণে। মনে রাখবেন দুই শ্রেণির যুদ্ধের বাইরে আমরা নেই। আমাদের প্রতিটি অনুভূতির মধ্যেই তা ক্রিয়া করে। তাই শ্রেণি সচেতন মানুষ হিসেবে আমাদের একটা সচেতন ভূমিকা যেমন অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে থাকে, তেমনি গানের ক্ষেত্রেও থাকতে হবে। আমরা বুর্জোয়া শ্রেণির প্রাধান্যের মধ্যে এই সমাজে অবস্থান করি বলে তার প্রাধান্যরক্ষাকারী সঙ্গীত, ছন্দ, ধ্বনি এগুলোর দিকে আমাদের টান বেশি, কারণ এর প্রচারও বেশি এবং ছোটবেলা থেকেই শুনতে শুনতে আমাদের পছন্দের একটি ধারা তৈরি হয়েছে।

ক্লাসিক্যাল গান যখন সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স হয়ে

উঠছে, সেখানেও দুই ধারা আছে। সেখানে যদি বেশি কালোয়াতি থাকে, যদি দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে, যদি মানুষকে এর মাধুর্য, এর রসবোধ, এর সূক্ষ্ম মানবিকতাতে আকর্ষিত করবার লক্ষ্যে পরিচালিত না হয়ে শুধু জটিল ফর্মের জন্ম দেয়, তখন সেই ধারাটি বিভ্রম তৈরি করে। তা মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা, উৎসাহ তৈরি করে না, মানুষকে আত্মত্যাগের জন্য উজ্জীবিত করে না। আবার আরেকটি ধারা ভারি সুন্দর হয়ে, অপরূপ হয়ে হৃদয়ের ভেতরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি সমূহ নিয়ে আসে। কারণ সূক্ষ্ম সুর ও ধ্বনি সহযোগে সঙ্গীত মানুষের মননের সূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহ বিকশিত করতে সহায়তা করে। কোনো মানুষের মধ্যে এই অনুভূতিগুলো সঙ্গীত সাধন নিয়ে আসে তখন সেই মানুষ আর বিবেক বিরোধী কোনো কাজ করতে পারে না। অন্যায় করতে পাবে না। কোনো নিষ্ঠুরতা করতে পারে না। এই সূক্ষ্ম মন ক্ল্যাসিকাল মিউজিক তৈরি করতে পারে। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খাঁ প্রমুখ বড় সঙ্গীতজ্ঞদের বাজনা মানুষের রুচির মানকে এই স্তরে নিয়ে যেতে পারে।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর ক্ষেত্রে কী হয়েছিল? গোঁড়া হিন্দু লোকেরাও আলাউদ্দীনকে বাবা বলে ডাকত, বাবার মতোই সম্মান করত। সে সময়ের সঙ্গীতের সকল লোক, তাঁর ছাত্র বা ছাত্র নয় — সবাই তাঁকে পিতা বলেই সম্বোধন করত, পিতার মতোই ভক্তি করত। এমন গভীর শ্রদ্ধা সঙ্গীত তৈরি করতে পারে। আর এর মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি কূপমণ্ডুক বোধকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। আলাউদ্দীন হলেন এর প্রমাণ। তাঁর মেয়ে অন্নপূর্ণাকে বিয়ে দিলেন এক হিন্দু ছেলের সাথে, কোনো ধর্ম পরিবর্তন করেননি। অথচ নিজে পাঁচ বেলা নামাজি লোক। সঙ্গীতের উচ্চস্তর মানুষকে এইরকম করে দিতে পারে। সঙ্গীতের মহিমা দেখুন। আমরা সাধারণ মানুষ কি এই রকম? আমাদের প্রতিদিনের জীবনে যে আমরা হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি থাকি, আমরা কী রকম? কজন মুসলমান-হিন্দুর মধ্যে এ রকম সম্পর্ক আছে? সঙ্গীত আলাউদ্দীনকে এই জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। তিনি সকলের গুরু হয়েছিলেন। তখন তিনি শুধু আর সঙ্গীতের গুরু থাকেননি; তিনি তখন তাঁর শিষ্যদের জ্ঞানের গুরু, সংস্কৃতির গুরু, মনুষ্যত্ব বিকাশের গুরু।

তাহলে দেখতে হবে সূক্ষ্ম জিনিসটি সূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে এসে সূক্ষ্ম মানবিকতা তৈরিতে সহায়তা করছে কি না। তা না করে যদি সেটি বুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের মনে বিভ্রম তৈরি করে দেয় তবে বুঝতে হবে এর অন্য উদ্দেশ্য আছে। সমাজে কোনো সৃষ্টিই এমনি এমনি হয় না। তার সামাজিক তাৎপর্য আছে। তার মধ্যে বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েতের দ্বন্দ্ব আছে।

আমাদের 'চারণে'র সংগঠকদের সুর এমনভাবে তৈরি করতে হবে যা আমাদের মনে স্পন্দন তৈরি করবে, হৃদয়কে নাড়িয়ে দেবে। এখনও মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার অর্থে বহু কিছুর অভাব পূরণ এ দেশে হয়নি, ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠা ভালভাবে হয়নি। এসব কারণে এখনও আমাদের দেশে প্রেমের গান, বিচ্ছেদের গান অথবা আমাদের মননে যে অভাববোধ আছে সেটা যদি কেউ প্রকাশ করে কোনো গান গায়, তখন ভাল লাগে। ভাল কেন লাগে? কারণ এ সব জিনিস আমরা পাইনি এখনও। আমরা এমন একটা পিছিয়ে পড়া সমাজে বাস করি যে এ সকল সহজ, স্বাভাবিক, মানবিক জিনিসও আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আসেনি। আমাদের সঙ্গীতে, নাটকে, সাহিত্যে এ সকল জিনিসের কথা বলব। আবার তার সাথে সাথেই আমাদের মূল যে কথা সমষ্টির স্বার্থ, ব্যষ্টির সাথে সমষ্টির ঐক্যবদ্ধতা, দৃঢ় সংহতি — এ সব কিছুও তুলে ধরব। রসের সঙ্গে উপস্থাপনা করব।

এই কাজগুলো অতীতের গণসঙ্গীতে হয়নি। এখনকার গণসঙ্গীতও আলগা আলগা। আলগা আলগা মানে কথাগুলো হয়তো মেহনতি মানুষের লড়াই সংগ্রামের কথাই, কিন্তু কথা-সুরে মিলে হৃদয়ে অতটা ভক্তি সৃষ্টি করে না, সমর্পণের ভাব তৈরি করে না, যতটা ভজন করে, কীর্তন করে। যদি ধর্মের লোকেরা তাদের কথা, তাদের আদর্শ এমন ভক্তিতে, এমন রসে প্রকাশ করতে পারে; তাহলে আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আদর্শ যারা ধারণ করে, মানব মুক্তির মহোত্তম সংগ্রামে যারা নেতৃত্ব দেবে — সে তার সংস্কৃতির প্রকাশ এর চেয়েও সুন্দরভাবে করতে পারবে না কেন? অতটা সুন্দর শুরুতে নাও করতে পারে কারণ কখনওই শুরুতে

সবচেয়ে সুন্দর হয় না। কিন্তু অতীত থেকে শিখতে শিখতে একসময় অতীতকেও অতিক্রম করে ভবিষ্যতে যায় মানুষ। এই নিয়মেই 'চারণে'র কর্মীরা বিকশিত হবে।

আমরা যখন বলছি যে, এ যুগে মানুষের সত্যিকারের মুক্তির পথ, সত্যিকারের বেঁচে থাকার পথ — সমাজতন্ত্রের পথ, মার্কসবাদ লেনিনবাদের পথ, তখন তার পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলন তৈরি করার দিকে আমাদের এগোতে হবে। কারণ আমরা যে আদর্শের কথা বলছি সেটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি এখনও যুক্তি দিয়ে মানুষকে বোঝাতে হয়। আমরা সমাজে শ্রেণি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে যুক্তি দিয়ে মানুষের কাছে কে শত্রু, কে মিত্র এসব ধারণা নিয়ে যাই। এখন শত্রুর বিরুদ্ধে এবং মিত্রের পক্ষে মনন তৈরি করার জন্য, শত্রুকে উৎখাতের শক্তি তৈরি করার জন্য, মানুষকে শৌর্যে-বীর্যে জাগিয়ে তোলার জন্য— গানের দরকার। মানুষের মধ্যে এই চেতনা নিয়ে আসা দরকার যে, অন্যায়-অবিচার মানুষ অতীতেও মানেনি, ভবিষ্যতেও মানবে না। বর্তমানেও আমরা মানবো না। এই না মানার যে গান সেটাই 'চারণ'কে সৃষ্টি করতে হবে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের মধ্য দিয়ে বস্তুজগতের অভ্যন্তরে প্রতি মুহূর্তে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে, সেই পরিবর্তনের নিহিত নিয়মকে জেনে, সেই অনুযায়ী সমাজ অভ্যন্তরের বিকাশের নিয়ম কী, সেই নিয়ম অনুযায়ী মানুষের মননশীলতা কেমন, সেই মননশীলতার বিচিত্র যে রূপ, সেগুলোর ওপরে কী ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারি — তা আমাদের ভাবতে হবে।

তাহলে প্রত্যক্ষভাবে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, তেলের দাম, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে কথা বলছি, কর্মসংস্থানের দাবি তুলছি , শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কথা বলছি, আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, আবার প্রতিটি আন্দোলনের মধ্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যায়-অত্যাচার দেখাচ্ছি। এ সব করতে করতে যে মানুষগুলোকে আমরা আমাদের সাথে যুক্ত করতে পারছি তাদের মধ্যে আবেগ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা এগুলো গড়ে ওঠা দরকার। এ ক্ষেত্রে শিল্প মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মানুষ যে বিষয়টি অর্থনৈতিক তত্ত্ব দিয়ে বোঝে না, সেটি তাকে গল্পের মধ্য দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। একটা গানের মধ্য দিয়ে আমি শত্রু-মিত্রের লড়ালড়ি, তার দুঃখ ও আনন্দ দুটোই তুলে ধরতে পারি। এই প্রয়োজনগুলি বুঝে এসব সৃষ্টিশীল কাজ করার মতো উপযুক্ত ক্ষমতা 'চারণে'র কর্মীদের অর্জন করতে হবে। একদল বিপ্লবী এই গণসংগঠন পরিচালনা করবে। এই সংগঠন মানুষের হৃদয়ের উপর ক্রিয়া করবে। তাদের মননশীলতার উপর ক্রিয়া করবে। তাদের মধ্যে উচ্চ মানবিকতা তৈরি করতে, তাদের মনকে মানুষের জন্য ব্যথিত করতে, তাদের মধ্যে ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। এটাকে বাদ দিয়ে আমরা যদি কিছু করতে যাই অর্থাৎ আমরা যদি মনে করি যে, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, নারী — এ সব ক্ষেত্রে আমাদের যে সংগঠনসমূহ আছে তাদের দিয়েই আমরা বিপ্লব সম্পন্ন করে ফেলতে পারব, সেটা আমাদের ভুল ধারণা, আমরা পারব না। কারণ মানুষকে হৃদয় থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য সঙ্গীত দরকার, ভালবাসা ও আবেগ সৃষ্টি করা দরকার। তাদের বুকের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করার জন্য সঙ্গীতের, নাটকের, সাহিত্যের ভূমিকা আছে।

আমাদের দেশে সংস্কৃতিকর্মীরা কিছু চেষ্টা করেছেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আবার রাশিয়া ও চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার দরুণ বিশ্বে এই নতুন আদর্শকে কেন্দ্র করে যে আলোড়ন তৈরি হয়, আমাদের দেশেও তার ঢেউ এসে লাগে। কিছু করার চেষ্টা তারা করেছেন কিন্তু সঠিক সর্বহারা শ্রেণির দল না থাকার কারণে তারা সঠিকভাবে পরিচালিত হননি। সাধারণভাবে দেখা যায় সামাজিক অন্যায় দেখলে তার বিরুদ্ধে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রবল আবেগ সৃষ্টি হয়। এইসব লোকেরা সঙ্গীতে, নাটকে, সাহিত্যে তাদের এই কষ্ট ব্যক্ত করার চেষ্টা করেন। একটি সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী পার্টির এটি সঠিকরূপে পরিচালনা করা দরকার। এ জন্য তার শিল্প সম্পর্কে, শৈলী সম্পর্কে, এর গুরুত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। তখন যারা শিল্পী-সাহিত্যিক তারা বুঝবে যে, এ সব কথা তাদের এই মানুষদের কাছ থেকে শিখতে হবে। সে সব নিয়ে ডিফারেন্সও হতে পারে। তার মীমাংসা তর্ক-বিতর্কের মধ্য

দিয়ে হবে।

মানুষের সমস্যা-সংকট নিয়ে কমরেড লেনিনের সাথে গোর্কির ডিফারেন্স হয়েছিল। অনেক প্রশ্নের সমাধান তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে হল না। বলশেভিকদের আরও কিছু বিষয়ে তাঁর ভিন্নমত থাকায় একসময় তিনি রাশিয়া ছেড়ে ইতালির ক্যাপ্রিতে চলে যান। লেনিন নিজে গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। কী ভাবে এই মানুষটার গুরুত্ব তিনি বুঝেছিলেন দেখুন, ফিরিয়ে এনে তাঁকে আবার সেই বিষয়গুলো মন-প্রাণ ঢেলে বোঝান। গোর্কিও পরে বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের জন্য।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কেমন নতুন যুগ নিয়ে এসেছিল দুনিয়ায়! একদিন বুর্জোয়া বিপ্লবের ঊষালগ্নে বুর্জোয়ারা অনেক কিছু সৃষ্টি করেছিলে। বুর্জোয়ারা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাবার পর সে সমাজ হয়ে পড়ে বন্ধ্যা। এই বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে পৃথিবীতে নব সৃষ্টির জোয়ার বইয়ে দেয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সোভিয়েত সাহিত্য, সংস্কৃতি লক্ষ করলে এর উৎকর্ষতা আমরা দেখতে পাব। বলশয় থিয়েটার ছিল জগৎবিখ্যাত, জগৎশ্রেষ্ঠ, আনপ্যারালাল (তার সমান আর কেউ নেই)। ব্যালে ডান্সের সবচেয়ে উন্নত রূপ তাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটেছে। মায়া পিসেস্কায়া, গ্যালিনা উলানোভা প্রমুখরা ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ব্যালেরিনা। বড় বড় অনেক মিউজিক কম্পোজারও তখন তৈরি হয়েছিলেন। যখন গমগম গমগম করে, সমস্ত কিছু কাঁপিয়ে দিয়ে বিরাট বাহিনী গাইতে গাইতে, মার্চ করতে করতে এগোয় — সে বিপুল আবেগ, বিপুল শক্তি তৈরি করে জনগণের মধ্যে। সবচেয়ে ভাল বক্তা একটি রাজনৈতিক বক্তৃতায় যতটা আবেগ সৃষ্টি করতে পারেন, কখনও কখনও একটি গান, একটি নাটক তার থেকে অনেক বেশি পারে। এজন্যই তাঁরা একজন আরেকজনকে বোঝেন। গুণীরা একটি সামাজিক আন্দোলনে যখন সম্মিলিত হন তখন একে অপরের কদর বোঝেন। একে অন্যের প্রয়োজন বোঝেন। আমি নিজে সবকিছু করে ফেলতে পারি না— এটা রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বুঝতে হয়। গান প্রচণ্ড আকর্ষণ তৈরি করতে পারে, আবেগ তৈরি করতে পারে, উচ্চ মূল্যবোধ তৈরি করতে পারে, হৃদয়ের মধ্যে স্পন্দন তৈরি করতে পারে। এই মাধ্যমগুলো মানুষের আবেগের গভীরে ঢুকে তার উপর ক্রিয়া করে আবেগের সেই ধারাটাকেই বদলে দিতে পারে। যাকে আমরা 'প্যাটার্ন অব ইমোশন' বলি।

নাটকও খুব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নাটকে আমাদের দেশের চিত্র এঁকে দেখানো যায়। ব্যক্তিবাদ ঘর ধ্বংস করে দিচ্ছে, পরিবার নষ্ট করে দিচ্ছে। প্রতিদিন আপনি কাঁদছেন, পুড়ছেন এই দুঃখের জন্য। অথচ যে পথে গেলে এর সমাধান হবে সেই পথে হাঁটছেন না। মনে করছেন নিজে নিজে সমাধান করে ফেলবেন, পারবেন না। মনে করছেন নিজের পরিবারটাকে ঠিক করে ফেলবেন, পারবেন না। পারছেনও না। কিছুই আপনার পরিকল্পনা মতো হচ্ছে না। প্রতিদিনই আপনি ব্যর্থ হচ্ছেন। জটিল থেকে জটিলতর অবস্থার মধ্যে পড়ছেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাই দেখুন। এতো মধুর স্বপ্ন নিয়ে এলো যে সম্পর্ক — সে এই সময়ে যে সকল সমস্যার জন্ম দিচ্ছে তার সমাধান কি করতে পারছেন? একবার সন্দেহ তৈরি হতে শুরু করলে মাধুর্যের একেবারে দফারফা হয়ে যাচ্ছে। এই মানুষগুলোকে আমরা জীবনের সন্ধান নতুনরূপে দিতে চাই। শেখাতে চাই যে, বাঁচার অন্য মানে আছে। শুধু আপনি যে একা একা বেঁচে আছেন, এইজন্যই এই দুঃখ। পুঁজিবাদই দুঃখের কারণ, ঠিক। কিন্তু আপনি তার ভিকটিম, তার শিকার, তার কাছে পরাস্ত, তার পদানত। সে কারণে আপনার মধ্যে এতো দুঃখ। আপনি প্রতিবাদী হোন, জ্বলে উঠুন। দেখবেন আপনার কত শক্তি!

নব জীবনের এই সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে চারণের বাহিনী। কিন্তু যারা এই ক্ষেত্রে কাজ করবে তারা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো করতে গেলে পারবে না। কারণ এমন একটা যুগে আমরা বাস করি, যে যুগে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিবাদ প্রবল আকারে বিরাজ করে। আমাদের মধ্যেও ব্যক্তিবাদী ঝোঁক প্রচণ্ড। আমাদের অনেকেরই নিজের পছন্দমতো কাজ করতে ভাল লাগে। কেউ সমাজ বিকাশের প্রয়োজনে নিজের পছন্দমতো একাই সবচেয়ে ভাল জিনিসটি সৃষ্টি করবেন এবং করেই যাবেন, সে যুগ নেই। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির মুক্তির যুগে, যখন ব্যক্তি নিবেদিত প্রাণ ছিল সকল সৃষ্টির জন্য

— সে যুগে তা সম্ভব ছিল। সেই মানুষেরা এখন ব্যক্তি-স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। এখন আর ব্যক্তিগতভাবে সেই সৃষ্টি সম্ভব নয়।

এখন ছেলেমেয়েরা যে ভালবাসার চর্চা করে তা নেহাৎই ব্যক্তিগত সুখ পেতে করে। কিন্তু ভালবাসা এসেছিলই সামাজিক অন্যায়-অবিচারকে কেন্দ্র করে লড়াইয়ের প্রয়োজনে। এখন ভালবাসা শুধু ব্যক্তি-স্বার্থকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে তারা ঠিকভাবে ভালবাসতেও জানে না। ডায়লগ জানে না, ডিসকাশন জানে না, উইট জানে না, হিউমার জানে না— তাহলে কী ভাবে ভালবাসা হয়? আবার শুধু দু'জনে-দু'জনে কি এসব হয়? এগুলোর চর্চা বন্ধুবান্ধব সহ সকলকে নিয়ে করতে হয়। তখন সবাই এই সম্পর্কের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। এখন ছেলেমেয়েরা সম্পর্কের চর্চা শুরু করলেই আড়ালে যেতে চায়। অন্ধকারে যায়, ঝোপে যায়। কেন? কারণ তাদের ভালবাসায় কোনো শিল্প সৃষ্টি নেই, ডায়লগ নেই, সৌন্দর্য নেই, মাধুর্য নেই।

ভালবাসার পাত্র বা পাত্রী হিসাবে তুমি কি আমার কাছ থেকে কোনো মধুর বচন, মানবিক কথা, হৃদয়বৃত্তির কথা, ত্যাগের কথা, লড়াইয়ের কথা শুনলে? আমরা কি এ সব চর্চা করলাম? যদি না করি তাহলে আমাদের ভালবাসা সুন্দর হয়ে উঠবে কী করে? আমাদের ভালবাসা উচ্চ মানবিকতা নিয়ে দাঁড়াবে কী করে? শিল্প রূপে প্রকাশ পাবে কী করে? পাবে না। আর পায় না বলেই আমাদের ভালবাসা আড়ালে যেতে চায়। ভালবাসা আড়ালে যাওয়ার বস্তু নয়। দু'জন মানুষের সম্পর্কের পরিণতিতে যখন তারা মিলনে যায়, তখন তাদের একটা আব্রুর দরকার হয়। কিন্তু যখন তর্ক-বিতর্ক করছে, কথাবার্তা বলছে, তখন তো বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তা করবে। দু'জনের সম্পর্ক, হাসিঠাট্টা দেখে অন্যেরা খিলখিল করে হাসবে। এই তো সৌন্দর্য।

কিছুদিন আগের সময়টাই দেখুন। আমাদের ভাবীরা দেবর, ননদ এদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করত না? তাহলে দেখুন রসের চর্চা একসঙ্গে থাকা লোকেদের মধ্যেও ছিল। এখনও রসের চর্চা একসঙ্গে থাকা লোকেদের মধ্যে যদি না থাকে, বিচ্ছিন্ন দু'জন মানুষ যদি রসের চর্চা করে তাহলে কী করবে? শুধু ব্যক্তিগত, শরীরগত, প্রবৃত্তিগত কিছু জিনিসের চর্চা করবে। কিন্তু আনন্দ তৈরি করতে পারবে না। সত্যিকারের আনন্দ, নিঃস্বার্থ আনন্দ তৈরি করতে পারবে না।

যারা বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত আছেন তারা যখন ভালবাসবেন তখন ভাববেন যে, আমাদের ভালবাসা একটি শিল্প। সেটি অন্যরা দেখে আনন্দ পাবে, অনুপ্রাণিত হবে। আমরা তাদেরকে সকল সৌন্দর্যের অংশীদার করতে পারি। সর্বহারা শ্রেণির সমষ্টির স্বার্থের ভিত্তিতে যে ভালবাসা, সেটি ব্যক্তি স্বার্থকে কেন্দ্র করে যে ভালবাসা এসেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। সেটার প্রকাশ তাই এই রূপেই হতে হবে। মন আমার এ রকম হতে হবে যে, আমার কমরেডদের ছাড়া শুধু একজন মানুষের সাথে আমার চলতে ফিরতেও ভাল লাগে না। এ রকমই আমার মন। কখনোই চলতে ফিরতে ভাল লাগে না, বা চলাফেরা করা যাবে না, আমি এ রকম জবরদস্তি করছি না। যদি বেশিরভাগ সময়েই শুধু আমরা দু'জন একসঙ্গে চলি, একসঙ্গে সিনেমা দেখি, থিয়েটার দেখতে যাই, একসঙ্গে গল্প করি, হাঁটি, একসঙ্গে লড়াই করি। কিন্তু যদি শুধু দু'জনে-দু'জনেই সব করি তাহলে কিছুদিন বাদে সব ভোঁতা হয়ে যাবে, একঘেয়ে হয়ে যাবে, অকার্যকরী হয়ে যাবে। সত্যিকারের আনন্দ আর পাওয়া যাবে না। একঘেয়েমির মধ্যে তো কোনো আনন্দ নেই। বিপ্লবীদের তো সৃজনশীল মানুষ থাকতে হবে।

এই বিষয়গুলি নাটকের মধ্যে তুলে ধরতে হবে। একটি ছেলে, একটি মেয়ের ডায়লগের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক, উইট-হিউমার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রস সৃষ্টি করে বিষয়টিকে উপস্থাপন করতে হবে। এর আকর্ষণ মানুষ অনুভব করবে, বুঝবে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগের উপাদান জড়িয়ে আছে বলেই এই চরিত্রগুলো এমন হতে পারছে।

বাংলা সাহিত্যে এইসকল ব্যথা বেদনা, সামাজিক যন্ত্রণা ধারণ করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর গল্পে, উপন্যাসে অসাধারণ সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এথিক্যাল মাদারহুডের ধারণা চমৎকার করে তাঁর মেজদিদি, বিন্দুর ছেলে, মামলার ফল, অনুরাধা, রামের সুমতি — এই লেখাগুলোতে নিয়ে

এসেছেন। এই 'এথিক্যাল মা' হওয়ার জন্য উচ্চশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু উচ্চ মূল্যবোধের প্রয়োজন। 'মামলার ফল' পড়লে আপনারা দেখবেন, কত সাধারণ গরিব ঘরের এক চাষিবউ গঙ্গামণি। সাধারণ গ্রামীণ পরিবারগুলোর মতোই তার স্বামী ও দেবর — দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, সামান্য বাঁশপাতা নিয়ে তাদের মধ্যে কাটাকাটি লেগে যায়। গঙ্গামণিরও তার জায়ের সাথে এমনই সম্বন্ধ। কিন্তু তার দেবরের প্রথম পক্ষের ছেলে গয়াকে সে খুব ভালবাসে। গয়াও তাকে মায়ের মতোই দেখে, কারণ তার মা মারা যাবার পর এই জ্যাঠাইমার কাছেই তার যত দাবি-দাওয়া সে করতে পারে। সৎ মা তাকে পছন্দ করে না। সেই গয়া জ্যাঠাইমার উপর রাগ করে তার ঘরের হাড়ি-পাতিল সব ভেঙ্গে ফেলল। এই সুযোগ পেয়ে গঙ্গামণির স্বামী শিবু ও ভাই পাঁচু মিলে গয়ার নামে থানায় মামলা করে দিল। উদ্দেশ্য তার ভাইকে শায়েস্তা করা। গঙ্গামণিও প্রথমদিকে রাগে এতে সায় দিয়েছিল কারণ এর পরিণতি সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না। পুলিশ যখন সত্যিই গয়াকে ধরতে আসে তখন সে বুঝতে পারে সে কী করেছে। এর পরের ঘটনা অবাক করার মতো। দেখা গেল গয়া পুলিশের ভয়ে পালিয়েছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর দেখা গেল গঙ্গামণিকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একসময় গয়ার খোঁজ পেয়ে গঙ্গামণির স্বামী ও ভাই গিয়ে দেখেন গঙ্গামণি গয়াকে আদর করে খাওয়াচ্ছে। তার স্বামীর সাতদিন ধরে নাওয়া-খাওয়া নেই। গয়া তার নিজের ছেলেও নয়। কিন্তু মা মরা একটা ছেলের ভার নিয়ে সে মা হয়েছে, তাকে সে কোনো কারণেই ছেড়ে দিতে পারে না। তাহলে তার মাতৃত্ব থাকে না। তার বড়ত্ব থাকে না। সে জন্য সে গোটা সংসার ফেলে দিয়ে ছেলের কাছে চলে এল। স্বামীকে ছেড়ে এল। এ এক অপূর্ব ব্যাপার। এখানে তার কিছুই পাওয়ার নেই, কিন্তু যে সংসারে তার সব ছিল। সেটাই সে তুচ্ছ করে এল। কেন? মায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য, মাতৃত্বের যে নৈতিকতা আবার নৈতিক যে মাতৃত্ব— তাকে রক্ষার জন্য।

একই রকম মা আমরা দেখি 'মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনী চরিত্রে। সেও মাতৃত্ব রক্ষার জন্য স্বামীকে এমনকি নিজের ছেলে মেয়েকে পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। যার জন্য বেরিয়েছিল তার নাম কেষ্ট, সে একটি অনাথ ছেলে। তার জায়ের সৎ ভাই। ছেলেটির দুঃখ দেখে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসার জন্য স্বামীকে অনুরোধ জানিয়ে হেমাঙ্গিনী বলেছিল, 'আমি নিয়ে এলে সংসারে কেউ তাকে আটকে রাখতে পারে? আমার দুটি সন্তান ছিল, কাল থেকে তিনটি হয়েছে, আমি কেষ্টর মা'। 'বিন্দুর ছেলে' তে দেখবেন বড় বউ বিন্দুকে বলছে, 'তোর অমন মেঘের মতো চুল ছোট বউ, তুই খোঁপা বাঁধিস না কেন'? তখন বিন্দু বলছে, 'ছেলে বড় হয়েছে দিদি। ও হঠাৎ খোঁপা দেখলে কি মনে করবে। এটা ভাল হয় না'। দেখুন দায়বদ্ধতার গভীরতা কেমন একজন মায়ের। কী রকম সচেতনতা। পাছে ছেলে ভাবে মা কোনো শৌখিনতা করছে এ জন্য খোপা বাঁধত না। একটা শখ হল, অমনি আর কোনো দিকে তাকালাম না — এমনটা সে ভাবতেই পারে না। 'রামের সুমতি' তে একই বিষয় দেখবেন। দেবর রাম, যাকে নারায়ণী ছেলের মতো বড় করেছেন, তাকে কাছে রাখার জন্য নিজের মা কে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেন।

এই চরিত্রগুলো আপনারা শরৎ সাহিত্য পড়লে দেখতে পাবেন। বুর্জোয়া মানবতাবাদ এথিক্যাল মাদারহুডের কনসেপ্ট এনেছে। আর শরৎচন্দ্র এগুলো চরিত্র তৈরি করে করে দেখিয়েছেন। সামন্তী যুগের মায়ের ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে আধুনিক মা কেমন হবে তা দেখিয়েছেন। সে মা হওয়ার জন্যে বি.এ, এম.এ পাশ করা দরকার লাগে না। মানুষের মধ্যে এমন মায়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছেন। বলতে চেয়েছেন, দেখো তো, তোমাদের ঘরে ঘরে এমন মায়েরা আছে কি না? এ থাকার দরকার কি না? কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, যারা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে এথিকস (নৈতিকতা) পড়ান তাঁরা এ সকল বিষয় জানেন। কিন্তু চরিত্রে তা ধারণ করেন না। সাধারণ সরল গ্রামীণ চরিত্রগুলোর মধ্যে শরৎচন্দ্র এ জিনিস এঁকে দেখিয়ে দিলেন। যারা সাহিত্য পড়ায়, পড়ে, তারা অনেকেই এ জিনিসের রূপ কী তা জানে না, এর সৌন্দর্য কী তা ধরতে পারে না।

আমাদের দেশে শরৎসাহিত্য নিয়ে গভীর চর্চা হওয়া উচিত। আপনাদের ঘরে ঘরে কি এমন মা আছে? এমন মা দেখেছেন কখনও? এ মা যে উন্নত মা এটা বুঝতে পারেন, কিন্তু এই মা তো দেখেননি। এ দেশের ঘরে ঘরে তো এমন মা নেই! আবার জীবন কী ভাবে চলবে তা নিয়েই এতো ফেঁসে গেছেন যে, এ সব কথা ভাবারই আপনার ফুরসত নেই। কিন্তু না ভাবলে কী হয়? নিজে মনে করছেন আমার মতো সৎ লোক দুনিয়াতে নেই, আমার মায়ের মতো ভাল মা — ও পৃথিবীতে নেই। আবার পৃথিবীর খবরও ভাল করে জানেন না। এ সব করে শেষ পর্যন্ত কী হচ্ছে? নিজের মায়ের সম্মানটা পর্যন্তও আর ধরে রাখতে পারছেন না। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মায়েদের বে-ইজ্জতি হচ্ছে। যে ধরনের সম্মান সামাজিক পরিবেশে পেলে এ রকম মাতৃত্বের বিকাশ ঘটে, বিন্দু-নারায়ণীদের মতো মায়েরা জন্মায়, সেই সামাজিক পরিবেশও তো আমাদের দেশে নেই। সেটা পুরোপুরি অনুপস্থিত। শরৎ সাহিত্যের চর্চা হলে এইরকম মায়ের অভাববোধ সমাজে জন্ম নেবে।

এই অভাববোধ মানুষের মনন বিকাশের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কত অভাবের মধ্যেই না আমাদের বসবাস। অর্থনৈতিক অভাব যদি বাদও দিই, শিক্ষার অভাব, রুচির অভাব, সংস্কৃতির অভাব, ভালবাসার অভাব, মূল্যবোধ-মানবিকতার অভাব- এই রকম সমস্ত অভাব এ সমাজে বিদ্যমান। গোটা দেশটাই তো অভাবী। এই অভাব যদি আমরা বুঝতে না পারি অর্থাৎ এমন যদি হয় যে অভাব আছে কিন্তু অভাববোধ আমাদের নেই— তা হলে আমাদের দুর্গতি কেউ আটকাতে পারবে না। দুটো শার্ট গায়ে দেয়ার জন্য আছে, আর নুন দিয়ে দু'বেলা দুটো ভাত খেতে পারি, এই ব্যস! এই নিয়ে তিনবেলা তুড়ি মেরে যদি বলতে থাকি বেশ ভাল আছি! খুব ভাল আছি। সাহেব মাঝে মাঝে দু'তিন ঘা দেয় বটে, তবে প্রতিদিন মারে না — বাহ! এই স্তরের অভাববোধ নিয়ে কোনো জাতি দাঁড়াতে পারে?

পারে না। তাই সংস্কৃতির এ মাধ্যমগুলো দিয়ে এ দেশের মানুষের মনে অভাববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। দেখাতে হবে, কত স্বপ্ন নিয়ে এ জাতি স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিল। কিছুই সে পেল না। পেল না কেন? এই অভাবের জন্য কে দায়ী? দায়ী পুঁজিবাদ। স্বাধীনতার পর দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুঁজিবাদই সকল অভাবের জন্মদাতা। এই পুঁজিবাদ রক্ষা করে আজকের দিনে মনুষ্যত্ব রক্ষা করাও যাবে না। ব্যক্তিগত মানুষ নিজেদের মনের উদারতা, বড়ত্ব, মহত্ব, ক্ষমা, দয়া ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তিসমূহও রক্ষা করতে পারবেন না। কিন্তু যারা এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙবার জন্য জীবনপাত করছে তারা পারবেন। কোনো লড়াই না করে ঘরে বসে থাকা লোকেরা পারবেন না। গৃহীরা পারবেন না।

যথার্থ অভাববোধ থেকে মানুষ নতুন সৃষ্টি করতে পারে, যেমন বিপ্লবীরা করবে। সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করতে গিয়ে সে প্রতিনিয়ত ভালবাসা, স্নেহ, মমতা সবই তৈরি করবে। তা না হলে অভাববোধ মানুষকে বিকৃতির দিকে নিয়ে যায়। সমাজে যে এত বিকৃতি দেখেন, যদিও সবই আমাদের সামনে আসে না, পরিবারগুলোতে হরদম অনেক ঘটনাই ঘটছে— এসকল বিকৃতির কারণ কী? এর কারণ অভাববোধ। মানুষের সকল অভাব মেটাবার বাস্তব পরিস্থিতি সমাজে নেই সেটা বোঝে, কিন্তু সেই পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য লড়াই করতে পারে না— সেই পরাজিত, পরাস্ত মানুষেরা তাদের গ্লানি থেকে বিকৃতির দিকে যায়। আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে লুকিয়ে পেতে চায়। বিপ্লবী রাজনীতিতে যাঁরা যুক্ত হয়েছেন তারাও মনে রাখবেন, পার্টিতে যুক্ত হলেন মানেই চরিত্রের সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেন ব্যাপারটা এমন নয়। যাঁরা আনুষ্ঠানিক বিপ্লবী, লোকদেখানো বিপ্লবী, কিন্তু সৃজনশীল বিপ্লবী না, মানুষকে গড়ে তোলা, মানুষকে পাল্টানো, এই সংগ্রামগুলো যথার্থ করছেন না, তাঁদের মধ্যেও পুরনো সমাজের নানা প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বীতার মনোভাব, ক্ষুদ্রতা, নিচতা সবই আসবে। আসবেই। এটি আপনি আপনার সৎ ইচ্ছা দিয়ে আটকাতে পারবেন না। 'ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি'-র ভূমিকায় মার্কস বলেছিলেন, It is not men's consciousness that determines their existance, but their social existence that determines consciousness. অর্থাৎ "মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না, বরং

তার সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে।”

যে কথাটা বলছিলাম, মানুষের মনোজগতের পরিবর্তনের এই কাজটি সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্যে প্রকাশ করতে গেলে যে সকল মানুষের মধ্যে এসব গুণ আছে তাদেরকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এটা সোজা নয়। কারণ এ যুগে শিল্প-সাহিত্যের সাথে যুক্ত মানুষদের প্রবল ব্যক্তিবাদী ঝোঁক আছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে ভুল ধারণা আছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা মানব সমাজের বিশেষ একটি সামাজিক স্তরকে আরও উচ্চতর সামাজিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল। যখন সেটা অকার্যকরী হয়ে গেলো তখন তাকে কেন্দ্র করে যে আবেগ, যে মানবিক সম্পর্ক তা সবই পুরনো হয়ে গেছে। তাই সেটা দিয়ে কিছু করা যাবে না। আবার নতুনরূপে মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সেটা শিল্প সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, নাটকের মধ্য দিয়ে আনতে হবে।

কেমন যুগে আমরা আছি ভাবুন? এখনকার ফিল্মও দুর্বোধ্য, কিছু টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট (কারিগরি উন্নতি) হয়ত আছে, ভালই আছে। কিন্তু কন্টেন্ট (বিষয়বস্তু) হয় দুর্বল, নয়তো দুর্বোধ্য। ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের ক্ষেত্রেও একই কাণ্ড ঘটেছিল। একটা সময় ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, ছাদ পেটার গান সহ যত রকমের কর্মসঙ্গীত আছে সেগুলো প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ও নিজেদের শ্রম লাঘব করতে মানুষকে সহায়তা করেছে। তারপরে এক সময়ে এসে গান হয়ে গেল সামন্তী সমাজের কোর্ট মিউজিক। তখন সে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। দরবারের সঙ্গীত হওয়ার পরে সেখানে রাজা-রাজড়ারা সুরের এবং ফর্মের অনেক চর্চা করেছেন। তখনও সামন্তী সমাজ অবক্ষয়ী হয়নি। কিন্তু ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সে সঙ্গীতের সুর হয়ে পড়ল বিমূর্ত। তা মানুষের বুদ্ধি এবং চর্চার বাইরের বস্তু। কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থা যখন আসতে শুরু করল তখন ক্ল্যাসিকাল মিউজিকও ভাঙ্গতে শুরু করল। গানের খানিকটা মানুষের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হল। তখন খেয়াল, ঠুমরি, গজল ইত্যাদি ফর্মের জন্ম হল। সাধারণভাবে আমাদের দেশে ভজন-কীর্তন তো ছিলই। হরিদাস স্বামী, তানসেনদের সময়ের ক্লাসিক্যাল মিউজিকের সেই পুরনো ফর্ম আর নেই। তাকে সহজ হতে হয়েছে, সাধারণের বোধগম্য হতে হয়েছে। কিন্তু বোধগম্য হলেই কোনো কিছু ভাল হয়ে যায় না। বোধের কোন দিকটিকে সে বিকশিত করছে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটি মানুষের নিম্নগামী বোধকে উস্কে দিচ্ছে, নাকি যে বোধ মানুষকে আরও মানবিক করে তুলতে সহায়তা করে সে বোধকে জাগিয়ে তুলছে — বিচারটা এ ভাবে করতে হবে। প্রকৃত সঙ্গীত মানুষকে আরও স্পর্শকাতর করে, অনুভূতিপ্রবণ করে, মানুষের মধ্যে উচ্চস্তরের মমতা সৃষ্টি করে। একজন মানুষের ভেতরে সেগুলো জন্ম নিলে সেগুলি কি শুধু তার ব্যক্তিগত কাজেই লাগে? না। এতসব গুণাবলীর চর্চা কেউ শুধু তার পরিবারের মধ্যে করতে পারে না। সেগুলি তখন সাধারণ মানুষের জন্য, তাদের ভালবাসার জন্য, তাদের পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্যে কাজে লাগে। একজন রুচিসম্পন্ন, অনুভূতিসম্পন্ন লোকের গল্প করার জন্য বন্ধুকেও তো তৈরি করে নিতে হয়। এইরকম জ্ঞান যখন ভাবে সে যখন অন্য মানুষের সংস্পর্শে আসেন তখন সেই অন্য মানুষও উন্নত ও সূক্ষ্ম রুচি-সংস্কৃতির স্বাদ ধরতে পারেন।

আবার এর মানে এই নয় যে জটিলতম, সূক্ষ্মতম জিনিস সাধারণ মানুষ ধরতে পারবে না। পারবে। জটিলতম, সূক্ষতম জিনিসের এফেক্ট এমন হবে যে, মানুষের মধ্যে সে এমন সুকোমল মন তৈরি করবে, এত সূক্ষ্ম রুচির মানুষ তৈরি করবে যে রুচির এই মানের কারণে সে মানুষ কখনো কোনো নিচু কাজ করতে পারবে না।

কিন্তু সে রকম কিছু এ দেশে হচ্ছে না। দুনিয়ার সব জায়গাতে একই অবস্থা। ইউরোপ-আমেরিকায় সবই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্য নর-নারীর প্রেমকে অল্প সময়ের মধ্যেই স্থূলতার চর্চা অর্থাৎ প্রবৃত্তিগত চর্চার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ডিকেন্স, থ্যাকারে, জনসন, বার্নার্ড শ— এদের লেখায় যে ডায়লগের সৌন্দর্য ছিল তা এখন নেই।

বার্নার্ড শ’এর ‘ম্যান এন্ড সুপারম্যান’ পড়লে দেখবেন, একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে আর এক প্রখর বুদ্ধিমান ছেলে দুজনে ডায়লগ করছে। তারা পরস্পরকে

ভালবাসে, কিন্তু কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। ডায়লগে খেলছে। কথায় খেলছে। আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করছে। আর এদিকে তুমি ভালবাসার নামে মুহূর্তের মধ্যেই হাত ধরে ফেলছ। তুমি কী ভালবাসা সৃষ্টি করবে? তুমি তো পাঠকের সৌন্দর্যটা বুঝতেই দিচ্ছ না। কোনো শিল্পরূপই তোমার নেই।

মাদাম কুরি সিনেমায় আপনারা দেখবেন, তিনি তখনও মাদাম কুরি হননি। তখনও মেরি সাগোমেয়া স্ক্লোদোস্কা খুবই গরিব ঘরের একটি মেয়ে। পোল্যান্ড থেকে সে প্যারিসের সরবোনে পড়তে এসেছে। না খেয়ে খেয়ে কাজ করে। একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। শিক্ষকরা তাকে তুললেন, খাওয়ালেন। তাঁরা দেখলেন এই মেয়েটিকে যে কাজ দেওয়া হয় সবই সে নিপুণভাবে করে। তাঁর মনোযোগ, তাঁর একাগ্রতা দেখে শিক্ষকরা তাঁকে ল্যাবরেটারিতে কাজ করার সুযোগ দিলেন। সেই ল্যাবরেট্যারিতে ছিলেন পিয়েরে কুরি। তিনি মেরিকে দেখে একটু বিরক্ত। একটা মেয়ে এসে ঢুকেছে ল্যাবে। সে এসবের অনেক কিছু বুঝবে না, জিজ্ঞাসা করবে, বিরক্ত করবে। পিয়েরের চরিত্রও শিক্ষা নেবার মতো। মেয়ে দেখলেই অমনি প্রেম এসে যাওয়ার প্রকৃতির লোক নন। মেরি তো খুব সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু পিয়েরে নির্লিপ্ত। দুজনের কারও মাথাতেই এ সকল স্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তা ছিল না।

কিছুদিন পরে পিয়েরে দেখলেন মেয়েটি তাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমন গভীর মনোযোগের সাথে সে কাজ করে যে, তাকায়ও না। খাওয়ারও খেয়াল থাকে না। রাত হয়ে যায়, উঠতে চায় না। একদিন এমন দেরি দেখে পিয়েরে জিজ্ঞেস করলেন, মাদাম মাদামজোয়েশ, তুমি কি বাড়ি যাবে না? মেরির হুঁশ হল। বললেন, হ্যাঁ, যাব। তখন পিয়েরে তাঁকে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দিলেন। এ ভাবে চলতে চলতে একদিন তাঁরা আবিষ্কার করলেন দু'জনেই গভীরভাবে মগ্ন। বিজ্ঞানে মগ্ন। বিজ্ঞানের প্রতি মগ্নতা থেকেই তাদের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হল। তার পরে কি তারা কখনও হাত ধরেনি? আমি কি হাত ধরার বিরোধিতা করছি? তুমি যে কোনো কিছু গড়ে ওঠার আগেই ঝটপট ঝটপট কাজ সেরে ফেলতে চাইছো, এরকম স্থূল বুদ্ধির যুবক-যুবতীতে যে দেশ ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, আমি তার বিরোধিতা করছি। কারণ বুর্জোয়ারা রুচিসম্পন্ন, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ে রাখতে চায় না। তারা সেই স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ে চায় যাদের দিয়ে তারা কাজ সারতে পারবে। তাই তারা মানুষের রুচির জায়গা ধ্বংস করে দিতে চায়।

আমরা বুর্জোয়াদের এই চক্রান্ত রুখে দিতে চাই। রুচিসম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে চাই। পার্টি তাই এই ফ্রন্টকে খুব গুরুত্বের সাথে দেখছে। এটা পার্টির শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। ধরুন আমরা অন্য দু'একটি ফ্রন্টে দুর্বল। কিন্তু এই ফ্রন্টে দারুণ একটা কিছু করলাম। সেটা দলের সম্মান, আকর্ষণ অনেক বাড়িয়ে দেবে। আমাদের ছাত্ররা, শ্রমিকরা, কৃষকরা, নারীরা যে লড়াই করছে — এই লড়াইয়ের ছাপ মানুষের মধ্যে পড়ে, পড়ছেও — চারণ এ বিষয়গুলোকে নিয়ে গান বানাতে পারে, নাটক তৈরি করতে পারে। আন্দোলন সবসময় একই মাত্রায় থাকে না, কোথাও কোনো আন্দোলন যখন একটু ঝিমিয়ে পড়ছে— তখন তাদেরকে জাগিয়ে তোলার জন্য চারণ কাজ করতে পারে।

আমি আর কথা বাড়াবো না। আমি চারণের কর্মী-সংগঠকদের সবশেষে এই কথাই বলতে চাই যে, আপনারা একগুচ্ছ সম্ভাবনাময় নবীন মানুষ এখানে এসেছেন, দলকে আপনারা বিভিন্ন ভাবে অনেক সাহায্য করতে পারেন। তার কিছু দিক আমি আজ বললাম। অনেক সম্ভাবনার দিক এবং রুচি-সংস্কৃতি সংক্রান্ত অনেক কথা এখনও বাকি আছে। পরবর্তী সময় আবারও বসা হলে বলব। আর একটা দিক হল এই যে, আমরা যারা বিপ্লবী রাজনীতি করি তাদের সম্পর্কে আমি এই কথাগুলো বললাম এটা ঠিক। কিন্তু চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র যেহেতু একটি গণসংগঠন, তাই এখানে আমাদের দলের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত নন এমন মানুষেরাও আসতে পারেন। তাঁরা যদি এই রুচি-সংস্কৃতির কথাগুলোকে সমর্থন করে তার পক্ষে ক্রিয়া করতে আগ্রহী হন, মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে আগ্রহী হন — তবে তারা এই সংগঠনের সভ্য হতে পারেন। আমাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা থাকবে কী ভাবে তাদের দলের সাথে আরও একাত্ম করা যায়। □

শরৎচন্দ্র ও তাঁর ‘পথের দাবী’ : কিছু চিন্তা, কিছু জিজ্ঞাসা ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য

সমাজ পরিবর্তনের ক্রিয়া এবং বিপ্লব একটি অন্তহীন ও ক্ষান্তিহীন প্রক্রিয়া, সেই কারণেই একটি যুগের বিপ্লবীদের প্রাণের ধারা নির্ণয় করতে হয় পরবর্তী যুগের বিপ্লবীদের। আজকে যারা সমাজের পরিবর্তনের জন্য নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন বা করতে চাইছেন, তাদের প্রত্যেককেই বিগত দিনের যে আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষকে, বিশেষ করে আমাদের বাংলাকে আন্দোলিত করেছিল,তার যথার্থ ইতিহাস গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। আমরা যদি এই কাজটি করতে না পারি, তাহলে আজকের সমাজ বিপ্লবের যে মহতী সংগ্রামে আমরা নিয়োজিত, তাকে সঠিক ভাবে গড়ে তুলতে পারব না।

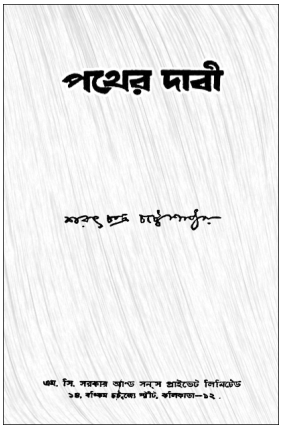

শরৎ সাহিত্যে শিল্প-শৈলীর উৎকর্ষ

বেশ কয়েক বছর আগে একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, বাঙালী গৃহস্থের মধ্যে রান্নাঘরের মশলার রঙে রঙীন শাড়ি পরে একজন রান্না শেষ করে এসে হঠাৎ তার শাড়িটি পরিবর্তন করে বসে পড়লেন একটি বই নিয়ে এবং তাতে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বলুন তো, কি বই সেটি? সম্পাদকীয় স্তম্ভেই তার উত্তর ছিল, সেটি শরৎচন্দ্রের লেখা একটি গল্পের বই। সাহিত্যিক বিমল মিত্র ট্রামে করে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে হঠাৎ শুনলেন আগুন! আগুন! দেখলেন ট্রামে আগুন ধরেছে। দেখা গেল, তাঁরই ফেলে দেওয়া সিগারেটের আগুনে ট্রাম জ্বলছে। ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। তবু উল্লেখ করলাম এই জন্য যে তিনি কতখানি বিভোর হয়ে গিয়ে ছিলেন শরৎচন্দ্রের ‘দেনা-পাওনা’ পড়তে পড়তে। আপনারা এও দেখতে পাবেন সাহিত্যিক বনফুলের লেখা ‘অগ্নীশ্বর’-এ বিপ্লবী মহিলা চরিত্রটি ডাক্তারের কাছে যে বইটি পড়তে চেয়েছে— সেটি শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’। বিশিষ্ট কবি গোলাম কুদ্দুসের একটি লেখায় দেখা যায়, ঢাকার জনৈক বেদনার্ত ও পথ অনুসন্ধানী মুসলিম তরুণ কমিউনিস্ট হওয়ার প্রথম শিক্ষা পেয়েছিলেন ‘রমা-রমেশে’র ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী পড়ে। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, শরৎচন্দ্রের বইয়ের মধ্যে কমিউনিজম কোথায়? উত্তরে সে বলেছিল, ‘তা জানি নে। তবে এটা জানি তাঁর বই না পড়লে আমি কমিউনিস্ট হতে পারতাম না। ...আমি ওদের ভালবেসে ফেললাম। ...রমা ও রমেশের দুঃখ আমার চেয়ে কম নয়! ...তারপর আমার মনে হল, আমার চারপাশে এত দুঃখী লোক! ...আমি তখন খুঁজে খুঁজে এক লাইব্রেরী বের করলাম। সেখান থেকে শরৎচন্দ্রের বই এনে পড়তে লাগলাম। যতই পড়ি ততই দেখি দুঃখ এক রকমের নয়, বহু রকমের!’ এই থেকেই তরুণ গওসলের কমিউনিষ্ট হওয়া। প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র ছিলেন সেই ধরনের সাহিত্যিক, যিনি রসসৃষ্টির মাধ্যমে মানবজীবন ও সমাজবাস্তবকে উপস্থাপনা করতে পারতেন। পাঠককে তা আকর্ষণ করতো। আবার তারই সাথে, ভেতরকার সংস্কার বা ভ্রান্ত চিন্তার পরিবর্তন ঘটাতেও তা সাহায্য করত। তিনি বলতেন, ‘সাহিত্য রসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু

ক্ষমাশীল মন সাহিত্য-রসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে।' প্রসঙ্গত মনে পড়ে, সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম শিক্ষামন্ত্রী এ. লুনাচারস্কির একটি কথা। তিনি বলেছিলেন, "Glorious is the writer who can express a complex and valuable social idea with such a powerful artistic simplicity that he reaches the hearts of the millions. Glorious is also the writer who can reach the hearts of these millions with a comparatively simple elementary content." আমাদের দেশে শরৎচন্দ্র ছিলেন এই ধরনের সাহিত্যিক। সহজ কথাকে তিনি যেমন সহজ করে বলতে পারতেন তেমনি দুরূহ তত্ত্বকথা, জটিল দার্শনিক বিষয়বস্তু এবং জীবন দর্শনকে তিনি সাহিত্যের জারক রসে সিঞ্চিত করে, আকর্ষণীয় করে পাঠকের দরবারে তুলে ধরতে পেরেছেন। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকেও এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে এসেছেন তিনি। সংলাপ হোক বা বর্ণনা, তার ভাষা এতটাই আকর্ষণীয় এবং অমোঘ যে সে ভাষাকে রিপ্লেস করা একপ্রকার অসাধ্য। এখানে শরৎচন্দ্র আজও অপ্রতিরোধ্য। এমনকি যেখানে তিনি দীর্ঘ কথপোকথনের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতাদর্শ বা দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করেছেন সেখানেও তাঁর ভাষা পাঠককে টেনে নিয়ে যায়। 'পথের দাবী'র ছত্রে ছত্রেও তার প্রমাণ রয়েছে। এই কারণেই অগণিত পাঠকের হৃদয় তিনি জয় করেছেন। একদল সাহিত্য সমালোচক এ সত্যকে অস্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সাহিত্য কত নিম্নমানের তারও তর্জমা করে থাকেন। অথচ, মুগ্ধচিত্তে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি! অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমাদের ভাষায় তিনি (শরৎচন্দ্র) এক অভিনব শক্তি সঞ্চয় করেছেন ...কথা সাহিত্যিকের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারও পেয়েছেন— বাংলার পাঠক-পাঠিকার হৃদয় অধিকার করেছেন।' কবি তাঁর নিজস্ব সীমাবদ্ধতার অকপট স্বীকৃতি দিয়ে এমনও পর্যন্ত বলেছেন, 'আমার গল্প বিনা মূলধনে ফাঁকির কারবার। পল্লী জীবনের অভিজ্ঞতায় শরতের তহবিল ভরা— সে তহবিল সে পুরোপুরি খাটাইতেও জানে।' বড় মানুষ ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মূল্য বুঝেছিলেন এবং মূল্য দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'শরৎ তুমি আমাদের বঙ্গ সমাজকে দেখেছ অন্দরমহলে ঢুকে। আমি দেখেছি বাইরে থেকে উঁকি মেরে। না, সত্যিই তাই। কারণ আমরা যে ছিলাম একঘরে। তুমি বঙ্গ সমাজের অনেক কিছু দেখেছ যার নাগাল আমি পাইনি।' শরৎচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই আস্থা যথার্থই কত গভীর ছিল তার আরও পরিচয় আমরা পাই বঙ্কিম-শরৎ সমিতি আয়োজিত শরৎ সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তাঁর (শরৎচন্দ্রের) গল্পে যে রসকে তিনি নিবিড় করে যুগিয়েছেন, সে হচ্ছে সুপরিচয়ের রস। তাঁর সৃষ্টি পূর্বের চেয়ে পাঠকের আরও অনেক কাছে এসে পৌঁছাল। তিনি নিজে দেখেছেন বিস্তৃত করে, স্পষ্ট করে, দেখিয়েছেন তেমনি সুগোচর করে।' প্রায় ভবিষ্যৎবাণীর মত রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন, 'আধুনিক লেখকরা শরৎচন্দ্রের পথেরই অনুসারী। ...একদিন তারা হয়তো সে কথা ভুলবে এবং তাকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু আশা করি পাঠকেরা ভুলবে না।' যে সকল সাহিত্য সমালোচকরা শরৎচন্দ্রকে এবং তাঁর সাহিত্যকে যথাযথ মূল্য দিতে চান না— তাদের বিচার বিবেচনার জন্য রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি আপনাদের সামনে উপস্থিত করলাম।

একথা সত্য, আধুনিক লেখকদের কেউ কেউ সত্যিসত্যিই শরৎচন্দ্রকে ভুলতে চাইছেন, স্বীকার করতে চাইছেন না। আবার অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র সহ বহু সাহিত্যিক পরবর্তীকালে তাঁদের পরিণত চিন্তায় শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বকে কোনওভাবেই অস্বীকার করতে পারেন নি। কল্লোল যুগের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও তাই। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস অনুশোচনায় বলেছেন, 'প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি, তাঁহার মৃত্যুর পর একাধিকবার'। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি সত্য যে, পাঠকরা তাঁকে ভোলেননি। আজও তাই শরৎচন্দ্র জনপ্রিয়তার শীর্ষে। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে বলিষ্ঠ পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তাকে কথোপকথন ও চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এবং সমাজের বাস্তব পরিবেশের সাথে

মিলিয়ে অনুপম শৈলীর মাধ্যমে এমন করে উপস্থাপনা করেছেন, যার ফলে মানুষের সংস্কৃতির পরিবর্তনে তা অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। এর দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে ও অবশ্যই বিশ্ব সাহিত্যের ভাণ্ডারকেও সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু একদিকে রক্ষণশীল সমাজ ও শাসককূলের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন প্রবল বিরোধিতা এবং অপরদিকে তথাকথিত উচ্চকিত শিক্ষিত মহলে মেলেনি তাঁর উপযুক্ত স্বীকৃতি। বাস্তবে, এদেশে শরৎসাহিত্যের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। সে মূল্যায়ন করেছেন এবং শরৎসাহিত্যের মনি-মুক্তা-মানিক্যকে আহরণ করতে শিখিয়েছেন মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনিই শরৎসাহিত্যকে নতুন করে চিনিয়েছেন, নতুন করে দেখিয়েছেন। সমাজে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তাকে এবং তার বিচারের বিজ্ঞানসম্মত মাপকাঠিকেও নতুনভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

আমরা জানি, আমাদের জীবনকে সাহিত্যিক বা শিল্পী রসের রূপে প্রকাশ করেন। তাঁরা প্রকাশ করেন জীবনকে, জীবনের গতিকে, জীবনের চলার ছন্দকে, জীবনের দর্শনকে। কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গিমাটা তার রসের আধারে। এখানেই সাহিত্যের যথার্থ প্রয়োজনীয়তা। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, 'সকল দেশের সর্বকালের সমস্ত চিন্তানায়কদেরই সাহিত্যের দরবারে যেতে হয়। এই কারণেই যেতে হয় যে, তাঁদেরও একটা অভাববোধ আছে। সেই অভাববোধ তাঁরা সাহিত্যের রসের মাধ্যমে পূরণ করেন। আর, তা ছাড়া সমাজের মধ্যে যে চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণাগুলোকে আমরা নিয়ে যেতে চাই, আমরা যা পারি না, সাহিত্যিক রসসৃষ্টির মাধ্যমে সেই চিন্তা-ভাবনাগুলোকে সমাজের মননের মধ্যে নিয়ে যান। এখানেই তিনি আমাদের চেয়ে বড় ক্ষমতার অধিকারী। সেই জন্য আমরা তাঁদের পূজারী, আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি।'

'পথের দাবী' প্রকাশনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

যাই হোক, আমাদের দেশে শরৎসাহিত্যের অন্যান্য দিক এবং সমাজজীবনের নানান দিক পরিব্যাপ্ত করে শরৎসাহিত্যের ভূমিকা আজকের আলোচ্য বিষয় নয়। আজকের আলোচ্য বিষয় তাঁর 'পথের দাবী'— যেটি একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উপন্যাস। এই রাজনৈতিক উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৬ সালের ৩১আগস্ট। এ বছরের ৩১ আগস্ট হল 'পথের দাবী' প্রকাশনার পঁচানব্বইতম দিবস। প্রকাশনার সময় খুব উদ্বেগের মধ্যে যে তিনি ছিলেন তাঁর চেয়ারে হাত রেখে বসে থাকা ছবিটি দেখলেই তা বোঝা যায়। ছবিটি 'পথের দাবী' প্রকাশ হওয়ার ঠিক আগের দিনের। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবপন্থাকে সামনে তুলে ধরে শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। হিসাবমত এটি ছিল তাঁর বিশতম উপন্যাস। প্রকাশক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রথমে মোট তিন হাজার কপি ছাপা হয়। বইয়ের আকারে প্রকাশের আগে 'বঙ্গবাণী'তে 'পথের দাবী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ব্রিটিশ শাসকের কাছে খবর গেলেও যেহেতু হাইকোর্টের জজ-এর বাড়ি থেকে তাঁরই তিন পুত্র এর প্রকাশক, সেহেতু তাকে প্রথমেই বাজেয়াপ্ত করেনি ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সময় কোন প্রকাশকই সাহস পায়নি। এদিকে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় উপন্যাস শেষ হয়ে গেলেও শেষ সংখ্যাতেও 'ক্রমশ' লিখে পুলিশকে বিভ্রান্ত করা হল। শেষ পর্যন্ত কাউকে না পেয়ে জজ সাহেবের পুত্রই দায়িত্ব নিলেন প্রকাশনার। শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদকে ডেকে বললেন, 'কী আর লিখব বল? আমি লিখব, আর গভর্নমেন্ট বাজেয়াপ্ত করবে— এই তো? পরাধীন দেশে সত্যিকারের সাহিত্য সাধনায় ব্যথা কী কম?' শেষ পর্যন্ত হ্যারিসন রোডের এস কে লাহিড়ীর কটন প্রেস থেকেই ছাপানো হয় 'পথের দাবী'। শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদকে বলেছিলেন, 'ছাপিয়ে যদি জেল হয় তোমার'? প্রত্যুত্তরে উমাপ্রসাদ সহাস্যে বললেন, 'জেলে যাব। তবে জেল হলে তো একা প্রকাশকেরই হবে না। লেখকেরও হবে। দুজনে একসঙ্গে জেলে থাকব। আপনার সঙ্গে থাকা— সে তো মহাভাগ্যের কথা।' প্রকাশনার আগের দিন গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদের বাড়িতেই ছিলেন। প্রকাশক এবং বিপ্লবী দলের অনেকে মিলে চতুর্দিকে বইটি দ্রুত ছড়িয়ে দেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বইটির সমস্ত

কপি নিঃশেষিত হয়। কিন্তু প্রথম সংস্করণ প্রকাশের কিছুপরেই ১৯২৭ সালের ৪ জানুয়ারি 'প্রিচিং অব সেডিশন'-এর নাম করে ব্রিটিশ সরকার বইটির সমস্তরকম প্রচার বন্ধ করে দেয়। ১৪ জানুয়ারি 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় লেখা হয়, 'গত বুধবার সরকার এক ঘোষণাপত্রে জানিয়েছেন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত উপন্যাস পথের দাবীর প্রচার আজ থেকে বন্ধ হল এবং তা সরকার দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হল। কারণ ওই পুস্তকপাঠে ১২৪এ ধারায় বর্ণিত রাজদ্রোহ করার ইচ্ছা পাঠকের মনে জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।' প্রসঙ্গত, '৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পঁচাত্তর বছর পর আজও এই ১২৪এ ধারা বহাল রয়েছে। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ফজলুল হকের মন্ত্রীত্বকালে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে ওই বছর এপ্রিল মাসেই আবার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এরপর 'পথের দাবী'র অভিনয় হয় নাট্য নিকেতনে ১৩ মে ১৯৩৯ সালেই। নাট্যরূপ দেন শচীন সেনগুপ্ত। কিন্তু বিপ্লববাদের সহায়ক এই অভিযোগ তুলে 'ড্রামাটিক পারফর্মেন্স অ্যাক্ট'-এর নিষেধাজ্ঞা জারি হয় ১৯৪০ সালের ৯ মে। এও উল্লেখযোগ্য, 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করার সময়ে ব্রিটিশরাজ এর মধ্যে বলশেভিক মতবাদের ছায়া দেখেছিল। 'পথের দাবী' নিষিদ্ধ করার সওয়াল হিসাবে তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, 'Towards the end of the book the hero works himself upon a state of frenzy, throws away all restraints and preaches pure Bolshevism.' এই হল 'পথের দাবী' প্রকাশনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট

সকলেই জানেন, বিশ শতকের প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ধীরে ধীরে ব্যাপক আকার নিয়েছিল। মহামতি গোখলে, মহাত্মা গান্ধী, লালা লাজপত রায় সহ সকলেই বললেন, এই আন্দোলন শুধু বাংলার নয়, সমগ্র দেশের মধ্যে জাগরণ এনেছে— নবযুগের সূচনা করেছে। যথার্থই বঙ্গভঙ্গবিরোধী এই আন্দোলন বাংলার সীমানা পেরিয়ে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়েছিল। কিন্তু সেই সময়, শরৎচন্দ্র বাংলায় ছিলেন না, ছিলেন সুদূর বার্মায়। ১৯০৩-১৯১৬ সাল পর্যন্ত তিনি বার্মায় ছিলেন। যতদূর জানা যায়, এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না। তবে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে সফল বাংলার তরুণ-তরুণীকে তিনি অভিনন্দিত করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন সময়ের মধ্যে ১৯০৮ সালে শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। তখনও তিনি বার্মায়। গোটা বাংলা উদ্বেলিত হয়েছিল ফাঁসির মঞ্চে ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান দেখে। পরপর ঘটে যায় আরও অসংখ্য ঘটনা— ভারতীয় জনতার উপর চলতে থাকে ব্রিটিশের অত্যাচার। সংঘটিত হয় জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। গোটা দেশে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট হুড' পরিত্যাগ করেন রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র তখন বার্মা থেকে ফিরে এসেছেন। থাকতেন হাওড়ায়। অমল হোমকে এক চিঠিতে এ প্রসঙ্গে লিখলেন, 'ইংরাজের মারমূর্তি খুব কাছ থেকেই দেখে নিলে ভালো করে। দরকার মনে করলে ওরা যে কত নিষ্ঠুর, কতটা পশু হতে পারে তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল। এতদিনে এর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল। আর এক লাভ। দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে'। আরও বললেন, 'একবার দাশ সাহেবকে (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ) দেখতে ইচ্ছে করছে। রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি যখন নিয়েছিলেন, দাশ সাহেব কেঁদেছিলেন। আজ রবীন্দ্রনাথ একা আমাদের মুখ রক্ষা করলেন। আজকে এই কথা শুনলে দাশ সাহেবের ছাতিটা বোধ হয় দশ হাত ফুলে উঠবে।' এই সময়েই বার্মা থেকে ফিরে এসে ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনকে উপলব্ধি করে শরৎচন্দ্র একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্ব মেনে তিনি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরই অনুরোধে শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির দায়িত্বও গ্রহণ করেন অত্যন্ত আনন্দের সাথে। স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করে শরৎচন্দ্র দৃঢ়তার সাথে সেদিন বলেছিলেন, 'রাজনীতির আলোচনায় প্রত্যেক দেশবাসীরই যোগ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলে আমি মনে করি। বিশেষত, আমাদের দেশ হল পরাধীন

দেশ। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধানত স্বাধীনতা আন্দোলন। এ আন্দোলনে সাহিত্যসেবীদেরই তো সর্বাগ্রে এসে যোগ দেওয়া উচিত। কারণ জাতি গঠন ও লোকমত সৃষ্টির গুরুভার পৃথিবীর সর্বদেশে সাহিত্যিকদের উপরেই ন্যস্ত। যুগে যুগে মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলেন তারাই। সাহিত্যিকরা যদি বলেন, আমি সাহিত্যিক, সাহিত্য নিয়েই থাকব, রাজনীতিতে যোগ দেব না— তাহলে উকিল ব্যারিস্টাররাও তো বলতে পারেন, আমরা আইনজীবী, মামলা-মোকদ্দমা নিয়েই থাকব, রাজনীতিতে যোগ দেব না। ছেলেরা বলবে— আমরা ছাত্র, পড়াশুনা নিয়েই থাকব, রাজনীতির মধ্যে যাব না, তাহলে রাজনীতিটা করবে কারা শুনি?' একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যখন শরৎচন্দ্রকে বললেন, 'কলম ছাড়িয়া বা রাখিয়া রাজনীতিক দলে ভিড়িয়া পড়াটা সাহিত্যিকের কাজ নহে'— তখন শরৎচন্দ্র প্রত্যয়ের সাথে বললেন, 'আমি কিন্তু কিছু দিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি। অর্থাৎ রাজনীতিকে জীবনে গ্রহণ করিয়াছি।' সমস্ত দেশের সকল মহৎ সাহিত্যিকই এই মননের অধিকারী। বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, 'স্বাধীনতা আন্দোলন হোক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হোক বা সমাজের আমূল পরিবর্তনই হোক— যা রাজনৈতিক আন্দোলনের আবহাওয়ায় আসবে, তার মানসিক জমি তৈরীর ক্ষেত্রেই সাহিত্যিকদের দরকার। সেইখানেই তাঁর প্রগতিশীল ভূমিকা।' তাই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠছে তার থেকে শরৎচন্দ্র একজন মানবতাবাদী সাহিত্যিক হিসাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন কী করে? দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন একদিকে এগিয়ে যাচ্ছে অসহযোগিতা অর্থাৎ সত্যাগ্রহের মাধ্যমে, আবার আর একদিকে বাংলা এবং পাঞ্জাব বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ। এই দুটো ধারার মধ্যে মতবিরোধ এবং দ্বন্দ্ব থাকলেও এই দুটি ধারাকে নিয়েই আমাদের দেশের নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরো পরিমণ্ডল। একটি হল বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের যৌবনোদীপ্ত ধারা— যা সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে আপসহীন। আর একটি হল আপসমুখী ধারা— যা সনাতন ঐতিহ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সংস্কারপন্থী-বিরুদ্ধবাদী। এই বিশ্লেষণ কমরেড শিবদাস ঘোষের। ইতিহাসের শিক্ষা তুলে ধরে তিনি বললেন যে, মানব সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা গণতন্ত্র প্রভৃতি স্লোগান উত্থাপন করেছিল প্রথম বুর্জোয়ারাই। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এই বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল ইউরোপে। মহান এঙ্গেলস একে বলেছিলেন, 'পূর্ববর্তী সকল বিপ্লবের চেয়ে মহৎ বিপ্লব'। এই বিপ্লব ধর্মীয় অন্ধতা, গোঁড়ামি, এবং সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনকে ভেঙে প্রতিষ্ঠা করেছিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের। সে যুগে এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবই ছিল প্রগতিশীল। কিন্তু পুঁজিবাদ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন ধীরে ধীরে সে একচেটিয়া রূপ পরিগ্রহ করল, তখন সে তার প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়ে হয়ে পড়ল চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল। সে তখন বার্ধক্যে পঙ্গু, ক্ষয়িষ্ণু, মরণোন্মুখ। বিশ্ব পরিস্থিতির এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের দেশে নবজাগরণের বিকাশ। তাই তার মধ্যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম যুগের যৌবনোদীপ্ত বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের ধারাটিও যেমন ছিল, তেমনই তারই পাশাপাশি ছিল ক্ষয়িষ্ণু মানবতাবাদের আপসমুখী ধারা। স্বাধীনতা সংগ্রামেও একদিকে ছিল আপসকামী নেতৃত্ব— যাঁরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিলেন— আর তারই সঙ্গে ছিল আপসহীন সশস্ত্র সংগ্রামের বিপ্লবাত্মক ধারা। শরৎচন্দ্র ভারতীয় নবজাগরণের আপসহীন বলিষ্ঠ মানবতাবাদী ধারার প্রতিভূ ছিলেন এবং সেই কারণেই বাংলার তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে ছিল নিবিড় যোগাযোগ। 'পথের দাবী' আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে।

বিশ্বপরিস্থিতিতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার প্রভাব

এরই সঙ্গে আর একটি কথাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন দুটি ধারায় ধীরে ধীরে গতিবেগ সঞ্চয় করছে— সেই সময়ে ১৯১৭ সালে ঘটে গিয়েছে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র। এতদিন

পর্যন্ত বিশ্বের মালিক শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জানত, বলত এবং বিশ্বাসও করত— মার্কসবাদ তত্ত্বে যাই বলুক, বাস্তবে শ্রমিকরা- চাষীরা কোনদিন রাজত্ব চালাতে পারবে না। একটা দেশ বা একটা রাষ্ট্র পরিচালনার মত জটিল ও কঠিন কাজ তারা করতে পারবে না। কিন্তু মহান লেনিন মার্কসবাদের প্রয়োগের দ্বারা প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন যে, এটা সম্ভব এবং শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র একটি জীবন্ত বাস্তব। এর ফলে গোটা বিশ্বে ব্রিটিশ সহ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির ভিত কেঁপে উঠল। তাদের মধ্যে জন্ম নিল বিপ্লব সম্পর্কে প্রবল ভীতি। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের অবস্থা বিচার করুন। দেশের সাধারণ মানুষ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে চাইছে স্বাধীনতা, চাইছে শোষণমুক্তি। আবার ইতিমধ্যেই এদেশের মাটিতে গড়ে উঠেছে জাতীয় পুঁজি— যা বিশ্ব পুঁজিবাদেরই একটা অংশ। তারাও চাইলো ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান হোক। কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র ভারতবর্ষের বাজারটি আসবে তাদের হাতে। অর্থাৎ, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষও চাইল স্বাধীনতা, আবার এদেশের মাটিতে গড়ে ওঠা পুঁজিপতি শ্রেণীও চাইল স্বাধীনতা। দুপক্ষই চাইছে ইংরেজ চলে যাক, কিন্তু দু'পক্ষের স্বার্থ আলাদা। এইরকম একটি সময়ে এদেশে গান্ধীজির অভ্যুত্থান। তিনি এসে বললেন, 'অহিংসাই আমার জীবনের বাণী'। পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের স্বার্থে এটিকে পুরোপুরি করায়ত্ত করল। গান্ধীজি বড় মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর এই চিন্তাধারা ভারতবর্ষের তৎকালীন জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হয়ে গেল। তাই তারা লড়ল বৃটিশের বিরুদ্ধে, কিন্তু লড়ল সত্যাগ্রহ, অনশন সহ সংস্কারপন্থী প্রতিবাদের পথে। সশস্ত্র লড়াইয়ের পথকে তারা বর্জন করল, এমন কি বিরোধিতাও করল। জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর ভয় হল— জনসাধারণ যদি সশস্ত্র বিপ্লবের পথে আসে, তাহলে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতেই তারা মালিক শ্রেণীকেও উৎখাত করে দিতে পারে। এই শ্রমিক-বিপ্লবভীতি ১৯১৭-র পরে গোটা বিশ্বের মত এদেশের পুঁজিপতিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। গান্ধীজিই হলেন তাদের অবলম্বন। লালা লাজপত রায় কংগ্রেস তহবিলে এই সমস্ত পুঁজিপতি বা ব্যবসায়ীদের থেকে চাঁদা নিতে বারণ করলেও গান্ধীজি সে কথায় গুরুত্ব দেননি। ফল যা ফলবার, তাই ফলেছিল। গান্ধীজি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যথার্থই বলেছিলেন যে, 'তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা'। এমনকি এও বলেছিলেন, 'গান্ধীজির আসল ভয় সমাজতন্ত্রকে'। তাই তিনি চান বা না চান তাঁর অহিংস নীতি বাস্তবে সাহায্য করল এদেশের পুঁজিপতি শ্রেণীকেই। একথা সত্য, তিনি বড় মানুষ ছিলেন এবং দেশের বিরাট অংশের মানুষের কাছে চরকা, সত্যাগ্রহের মাধ্যমে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু বিপ্লবপন্থা এবং সশস্ত্র সংগ্রামকে তিনি শুধু সমর্থন করেন নি তাই নয়— প্রবল বিরোধিতা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। দেশবন্ধুর বাড়িতে মিটিং-এ আলোচনা চলছিল। সেখানে অন্যান্যদের সঙ্গে গান্ধীজি এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজি কথোপকথনের মধ্যে বললেন, 'সশস্ত্র বিপ্লবে যারা বিশ্বাসী তারা ভ্রান্ত... —তারা দেশের শত্রু। শরৎচন্দ্র বললেন, 'আপনার বক্তব্যের পেছনে হয়ত যুক্তি আছে, কিন্তু তাঁদের শত্রু বলে অপবাদ দেবেন না। সে অধিকার আপনার নেই।' গান্ধীজি আরও কঠিনভাবে বললেন, 'যারা দেশের অগ্রগতি রোধ করে তাদের শত্রু ছাড়া আর কিছু ভাবা কি সম্ভব কোন দিন?' সেদিন শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, মতবিরোধই যদি শত্রুতা বোঝায়, তাহলে যদি কেউ আপনাকেও শত্রু বলে আখ্যা দেয়? বিপ্লবী দলকে আমি শ্রদ্ধা করি— কারণ তারাও দেশকে ভালোবাসে। ভালোবাসে বলেই তো জীবনের যা কিছু প্রিয়, সবই উৎসর্গ করে দেয় বুলেটের সামনে। দেশের শত্রু এরা হ'ল কেমন করে?' গান্ধীজি এর উত্তর দিতে না পেরে তাঁর কথা তুলে নিতে বাধ্য হন। দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রের দু'হাত ধরে বলেছিলেন, 'সত্যিই আজ কাজের মতো একটা কাজ করলেন শরৎবাবু! বাংলাদেশের ইজ্জত বাঁচিয়ে দিলেন আপনি।' চৌরিচৌরাতেও গান্ধীজির এই মানসিকতাই আমরা দেখতে পাই। সেখানে আন্দোলন যখন ব্যাপক রূপ পেল এবং জনতার সঙ্গে সংঘর্ষে পুলিশ মারা গেল, গান্ধীজি হঠাৎ করে আন্দোলন সম্পূর্ণ বন্ধ

করে দিলেন— বারদৌলীতে মিটিং করে। ইতিহাসে এই ঘটনাই 'বারদৌলী হল্ট' হিসাবে পরিচিত। গান্ধীজি বললেন, 'দেশ এখনও অহিংস আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়নি।' শরৎচন্দ্র এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'মহাত্মাজী ভয়ানক ভুল করলেন। এ অবস্থায় আন্দোলনকে স্থগিত রাখার মানে টুঁটি টিপে আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটানো। mass revolution একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। ...গোটাকতক কনস্টেবল infuriated mob-এর হাতে পুড়ে মরেছে, তাতে কি হ'য়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এত বড় বিরাট দেশের মুক্তি সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই তো! রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে— সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই তো ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল। এতে ক্ষোভ কীসের? দুঃখ কীসের? কীসের অনুতাপ এতে? Non-violence খুব noble idea, কিন্তু achievment of freedom is hundred times nobler.'

এই প্রেক্ষাপটেই শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে নানা জনশ্রুতি আছে। কেউ বলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষকে দেখে এটা লেখা। কেউ বলেন রাসবিহারী বসুকে দেখে লেখা। কেউ মনে করেন মাস্টারদাকে উদ্দেশ্য করে লেখা। কোন কোন বিপ্লবীর কোন কোন বৈশিষ্ট্য সব্যসাচী চরিত্রে দেখা যায় সে নিয়ে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় রীতিমতো একটা লম্বা তালিকাও করেছেন। যদিও, এর উত্তর শরৎচন্দ্র নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। একবার বহরমপুরে একদল যুবক তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, 'আপনি কোন বিপ্লবীকে দেখে পথের দাবীর সব্যসাচীকে চিত্রিত করেছেন?' শরৎচন্দ্র তার উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি কোনো বিশিষ্ট একজনকে আদর্শ করে সব্যসাচী লিখিনি। এই রকম একটা লোক সামনে আসুক, যে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা অতিক্রম করে লড়াই করে যেতে পারবে। এটাই আমি চেয়েছি। সেই আদর্শটাই তোমাদের কাছে তুলে ধরার জন্য আমি বইটা লিখেছি। সব্যসাচী তোমাদের জন্য।' আর সেখানে তাঁর উদ্দেশ্যে 'পথের দাবী'র উল্লেখ করে অভিনন্দন, যখন বলা হয়েছিল— 'তুমি শিখিয়েছ, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার'— তখন সেই অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'মানুষের অধিকার নয়, মনুষ্যত্বের অধিকার। মানুষ হয়ে জন্মালেই স্বাধীনতা পাওয়া যায় না।' এর থেকেও বোঝা যায়, কী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অপরিসীম যত্নে তিনি গড়ে তুলেছেন সব্যসাচীকে। অ্যাকাডেমিক মহলে কেউ কেউ বলেন, বাংলা সাহিত্যে এটা দুর্বল উপন্যাস। যদিও দুর্বল উপন্যাস কাকে বলে, সবল উপন্যাস কাকে বলে, উপন্যাসের সফলতা কোথায়, বিফলতা কোথায়, তার বিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণ আজকের আলোচনার বিষয় নয়। কিন্তু একটা প্রশ্ন আসবেই যে, 'এটা সত্যিই কি দুর্বল উপন্যাস।' কারণ যারাই উপন্যাসটি পড়েছে সব্যসাচীর প্রতি তাদের আকর্ষণ গড়ে উঠেছে। 'পথের দাবী' সেদিন জনমানসে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। সে আলোড়ন ছিল এমন, যাতে প্রথম প্রকাশিত তিন হাজার কপি দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং ছাপা কপি যখন পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন বিপ্লবীরা হাতে লিখে কপি করে তা পড়ত। কোনও বিপ্লবীর সঙ্গে অপর বিপ্লবীর দেখা হলে জিজ্ঞেস করত, 'পথের দাবী' সে পড়েছে কিনা। তাছাড়া, শুধু এই বাংলাতেই নয়— 'পথের দাবী'-র প্রভাব পড়েছিল অন্যান্য প্রদেশেও। তাই এই উপন্যাসটির একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল— ওড়িয়া, কন্নড়, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায়। ফলে বিপ্লবীরা পেয়েছে প্রেরণা, তাদের মনের মধ্যে জাগরুক হয়েছে সব্যসাচী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বিপ্লবীদের অনেকের কাছে 'পথের দাবী' আর গীতা প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল। এভাবে ভাবার অন্যতম এক কারণ অবশ্য ছিল। তাহল, আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে এমন কি বিপ্লবীদের মধ্যেও থেকে গিয়েছিল ধর্ম ও সনাতন ঐতিহ্যবাদের প্রভাব। যদিও এ প্রশ্ন আলাদা। এখানে তা আলোচ্য বিষয় নয়। অন্যদিকে এই উপন্যাসকে শাসক শ্রেণী দেখেছে ভয়ের চোখে। এই প্রসঙ্গে 'পথের দাবী' সম্পর্কে প্রখ্যাত মানবতাবাদী ফরাসী লেখক রোমাঁ রোঁলার একটি মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক। সকলেই জানেন, তিনি শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-এর অনুবাদ পড়ে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'মর্ডান রিভিউ'-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে 'পথের দাবী' নিয়ে একটি

কথোপকথনকে উদ্ধৃত করেছেন— 'রোঁমা রোঁলা বলছেন, এই লেখক (শরৎচন্দ্র) প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। কিন্তু বাংলা সরকারের কিছু কর্তাব্যক্তি শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাসে রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়েছেন। সুতরাং এটি এমন বই— যা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক, নাকি আমলাতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক?'

এসবের দ্বারা কি প্রমাণ হয় 'পথের দাবী' উপন্যাস হিসাবে দুর্বল? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় বিপ্লবী কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটির কথা। কবিতাটি যখন প্রথম প্রকাশিত হল, 'শনিবারের চিঠি'তে নজরুল বিরোধী সমালোচক সজনীকান্ত দাস বিচিত্র ছন্দের আন্দোলন ও ভাবের দ্বন্দ্বে আবর্তিত হয়ে তখন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা উদ্ধৃত করে সজনীকান্ত বলেছিলেন, 'কবিতার ছন্দের দোলা যদি পাঠকের মনকে নাড়া দিয়ে কোন ভাবের ইঙ্গিত দেয়, তাহলেই কবিতাটি সার্থক। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, বিচার করতে হবে, এই কবিতা তোমার মধ্যে কী সৃষ্টি করে দিয়েছে'। অর্থাৎ বিচার যেন শুধু তথাকথিত ব্যাকরণকেন্দ্রিক না হয়। 'বিদ্রোহী' কবিতা সেদিন নবজাগরণের চিন্তাকে পরিস্ফূট করে বলেছিল, 'ভূ্যলোক, দ্যুলোক, গোলক ভেদিয়া/খোদার আসন আরশ ছেদিয়া/ উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর/ বল বীর, চির উন্নত মম শির।' কবিতার মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বের কাঠামো এবং তার মহিমাকে কবি সমাজ মানসে তুলে ধরতে পেরেছেন, সেখানেই তার সফলতা। 'পথের দাবী'ও সেদিন বিপ্লবী জনমানসে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—সেটাই তার সফলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আবার 'পথের দাবী'র সফলতার সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে, আজকে পঁচানব্বই বছরের মাথায় এসে আমরা ঠিক সব্যসাচীর চরিত্র দিয়ে আজকের যুগের বিপ্লব গড়ে তুলতে পারব না। আজকের যুগের বিপ্লবের প্রয়োজন যে পথ দাবী করে, সে পথ শ্রমিক বিপ্লবের। আজকের যুগে অর্থাৎ পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের যুগের অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী যে ধরনের বিপ্লবী চরিত্রের প্রয়োজন, তাও শুধুমাত্র সব্যসাচী হওয়ার দ্বারা হবে না। মনে রাখতে হবে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সব্যসাচী ছিলেন মূলত পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের মূর্ত রূপ। আজ চাই সর্বহারা বিপ্লবের গুণাবলী সমন্বিত চরিত্র। সেই চরিত্র অর্জন করার সংগ্রামের প্রয়োজনেই সব্যসাচীর চরিত্র থেকে যুগোপযোগী শিক্ষা নিতে হবে।

সব্যসাচীর সংস্পর্শে নানা চরিত্রের উত্তরণ ঘটেছে

উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হিসাবে 'পথের দাবী'-তে নানা চরিত্র আছে। একটা উপন্যাসে তার কেন্দ্রবিন্দু যেমন থাকে তেমনি তার নানান চরিত্র থাকে, নানান ঘটনার ডালপালার বিস্তার থাকে, তাদের মধ্যে কথোপকথন থাকে। তার মধ্য দিয়ে এক একটা চরিত্র ফুটে ওঠে। একদল সাহিত্যিক আছেন যারা, সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা চরিত্রকে ফোটানোর জন্য বহু রকমের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন। অর্থাৎ তার চরিত্রটা কী রকম সাহিত্যিক নিজে সেই চরিত্র সম্পর্কে পাতার পর পাতা লিখে যান। আর এক ধরনের সাহিত্যিক আছেন, যারা কথোপকথনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এক একটা চরিত্রকে দাঁড় করিয়ে দেন। এক ধরনের উপন্যাসে ঘটনার পর ঘটনার প্রবাহই মুখ্যরূপে পাঠকের মনজগতে ভাসে। আবার আর এক ধরনের উপন্যাস আছে— ঘটনার প্রবাহ তাতে যাই থাক, পাঠকের হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে যায় চরিত্রগুলি। পাঠক তাতে প্রাণিত হয়। সফলতার মাপকাঠিতে এগুলি উন্নততর। 'পথের দাবী' উপন্যাসটি সেই স্তরের। এতে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে নানা ধরনের এমন কি তত্ত্বমূলক কথোপকথনের বিস্তারকে রসস্নাত করে সব্যসাচী সহ আরও কতগুলি চরিত্রকে শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। কঠিন তত্ত্বকথা অনেক আছে— তবু পাঠককে তা ঝর্ণা স্রোতের মতই টেনে নিয়ে যায়!

লক্ষ করলেই এই উপন্যাসে দেখা যায়, সব্যসাচীর সংস্পর্শে যে মানুষই এসেছে তাদের প্রত্যেকেরই চরিত্রের উত্তরণ ঘটেছে। সব্যসাচী চরিত্রের মহত্ত্ব তো এখানেই পরিস্কার ও প্রতিষ্ঠিত। ধর্মীয় সংস্কারগ্রস্ত যে অপূর্ব টিকি রেখে তার কলেজ জীবনে তর্ক করেছে, ছোঁয়াছুঁয়ির বাছ

বিচারে যে অত্যন্ত গোঁড়া সেই অপূর্ব নানান ঘটনার উথাল-পাতাল, তার ভাল-মন্দ, তার জীবনের জটিল দ্বন্দ্ব— একদিকে তার সংস্কার, অপরদিকে ভারতীর সাথে সম্পর্ক, এমন কি খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও সেই ভারতীর কাছেই তার মায়ের দেখাশোনার কথা ভাবা— এসব আবর্তের মাঝখান দিয়ে অপূর্বের চরিত্রের উত্তরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। আবার আর একদিক থেকে যে ভারতী ছিলেন 'মিস ভারতী যোসেফ', ধীরে ধীরে সব্যসাচীর সংস্পর্শে এল। সব্যসাচীর মত এবং পথের সাথে তার মিল ছিল না। পারস্পরিক কথোপকথন একদিকে বিপ্লবী চিন্তার স্বচ্ছতাকে সামনে তুলে ধরেছে, আর অন্যদিকে এর মধ্য দিয়েই ভারতী চরিত্রের উত্তরণ ঘটেছে। আবার সুমিত্রা, যিনি ছিলেন রোজ দাউদ, সেই রোজ দাউদ একুশ বছরের কলঙ্কিত ইতিহাসকে একদিনে পেছনে ফেলে 'সুমিত্রা' হয়ে উঠলেন, 'পথের দাবী'র প্রেসিডেন্ট হলেন— পরিণাম নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও নিঃসন্দেহে সুমিত্রা চরিত্রের উত্তরণ এক কথায় অনবদ্য। আর ভাঙা বেহালার পাগল কবি শশী, যাকে কেউ মানুষ বলেই গণ্য করত না। মেলামেশার দ্বারা শশীকবির চরিত্রেরও উত্তরণ ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সব্যসাচী। ফলে, সব্যসাচীর চরিত্রটি হচ্ছে 'পথের দাবী' উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু, কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই চরিত্রটি সকলকে ধীরে ধীরে চরিত্রের দিক থেকে উত্তরণের পথে নিয়ে গিয়েছেন। এইখানেই উপন্যাসের সার্থকতা এবং সফলতা।

আর একটি দিক থেকে বিচার করলেও এই সফলতার প্রমাণ মেলে। উপন্যাসটি যখন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়, তখন শরৎচন্দ্র তার প্রতিবাদ জানানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাতে রাজি হননি। তিনি একটা চিঠিতে বলেছিলেন যে, 'তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে।' আরও বলেছিলেন যে, 'রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না।' এতে শরৎচন্দ্র খুব দুঃখ পান এবং কবির উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেই চিঠিতে বলেছিলেন, 'বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা। কিন্তু সে কিছু নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিত বলে বিবেচনা করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমার অভিমানও নেই, অভিযোগও নেই। ...বাংলাদেশের গ্রন্থকার হিসাবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষের শাস্তি ভোগ করতে হয়, ত করতেই হবে— তা মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম।' যদিও কবির প্রতি আঘাতটা বেশি হয়ে যেতে পারে ভেবে চিঠিটা তিনি পাঠাননি শেষপর্যন্ত। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। এই ধরনের ব্যক্তিদের চিঠিপত্র তখন প্রায়শই কাগজে প্রকাশ হত। শরৎচন্দ্র তা হতে দিতে চাননি। কারণ, রবীন্দ্রনাথ উক্ত চিঠিতে লিখেছিলেন, অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের তুলনায় ভারতে ইংরেজ সরকার অনেক সহিষ্ণু। শরৎচন্দ্র রাধারানী দেবীকে চিঠিতে (১০ অক্টোবর ১৯২৭) লিখেছেন, "...কবির এতবড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেটসম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেছে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে।" বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং দায়িত্ববোধের এ এক অনন্য নজির। এছাড়াও, এই দুই চিঠির উল্লেখ করার আরেকটি কারণ আছে। এই দুই মহৎ সাহিত্যিকের চিঠি দেওয়া-নেওয়া নিয়ে মান-অভিমান যাই থাক, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ওই চিঠিতেই শরৎসাহিত্যের সাহিত্যমূল্য ও উৎকর্ষের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। মতের পার্থক্য নিয়েই রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে লিখেছেন, 'তুমি যদি কাগজে রাজ বিরুদ্ধ কথা লিখতে, তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত— কিন্তু তোমার মতো লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে, তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই— অপরিণত বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার অধীনে আসবে।' এই ক'টি কথা একদিকে 'পথের দাবী'

উপন্যাসের সফলতা আর অপরদিকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য শৈলীর নিপুণতার কবিকৃত প্রমাণ।

সংস্কার নয় উচ্ছেদ — এই হল সঠিক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি

ফলে, 'পথের দাবী' সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিদ্যমান বাস্তব, তৎকালীন রাজনৈতিক চেতনার দুটি প্রবহমান ধারা এবং সর্বোপরি একটি যথার্থ বিপ্লবী চরিত্রের যা হওয়া উচিৎ বলে শরৎচন্দ্রের চেতনায় প্রতিভাত হয়েছে -- তার ভিত্তিতে। আপসপন্থীরা আন্দোলন করতে চাইছে শুধুমাত্র সংস্কারের মাধ্যমে। আর 'পথের দাবীর' সব্যসাচী বলছেন, চাই 'বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন'। তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত, 'সংস্কার মানেই মেরামত, —উচ্ছেদ নয়। গুরুভারে যে অপরাধ আজ মানুষের অসহ্য হয়ে উঠেছে তাকেই সুসহ করা; যে যন্ত্র বিকল হয়ে এসেছে মেরামত করে তাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে কৌশল বোধ হয় তারই নাম শাসন-সংস্কার। একটা দিনের জন্যও এ ফাঁকি আমি চাইনি, একটা দিনের জন্যও বলিনি কারাগারের পরিসর আমার আর একটুখানি বাড়িয়ে ধন্য কর।' এখানে সব্যসাচী বলছেন, 'আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাইছি, বিপ্লব চাইছি। ...বিপ্লব হচ্ছে অতি দ্রুত আমূল পরিবর্তন'। এখানেই শরৎচন্দ্রের বিপ্লবী চিন্তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে সব্যসাচী চরিত্রের মাধ্যমে। তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীর সাথে সব্যসাচীর কথোপকথনের মাধ্যমে সাহিত্য রসসিক্ত হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসের পাতায় পাতায়। সব্যসাচী বলেছেন, 'বিপ্লব মানে কাটাকাটি, রক্তারক্তি নয়। ...কখনও কোন দেশেই শুধু শুধু বিপ্লবের জন্যেই বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোন ফল লাভ হয় না! বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে হয়।' অতীতের সমস্ত সংস্কার যা কিছু জীর্ণ, পুরাতন, যা দীর্ঘদিন মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসকে বাধা দিচ্ছে, সেই জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙতে হবে বিপ্লবের প্রয়োজনে। তাই শশী কবিকে সব্যসাচী বলছেন,'কোন বস্তু কেবলমাত্র প্রাচীনতার জোরেই সত্য হয়ে ওঠে না, ...পুরাতনের গুণগান করতে পারাই বড় গুণ নয়। ...আমরা বিপ্লবী, পুরাতনের মোহ আমাদের জন্যে নয়। আমাদের দৃষ্টি, আমাদের গতি, আমাদের লক্ষ্য শুধু সুমুখের দিকে। পুরাতনের ধ্বংস করেই ত শুধু আমাদের পথ করতে হয়। ...বয়সের সঙ্গে একদিন সমস্ত জিনিসই প্রাচীন, জীর্ণ এবং অকেজো, সুতরাং পরিত্যাজ্য হয়ে ওঠে। প্রত্যহ মানুষেই এগিয়ে যাবে, আর তার পিতামহের প্রতিষ্ঠিত সহস্র বর্ষের প্রাচীন রীতি নীতি একই স্থানে অচল হয়ে থাকবে, এমন হলে হয়ত ভাল হয়, কিন্তু তা হয় না।' সব্যসাচী সনাতন ঐতিহ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করে ভারতীকে বলেছেন, 'পুরাতন মানেই পবিত্র নয়। ...মানুষের অবিশ্রাম চলার পথে ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম তো সকল দিকেই মিথ্যে হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র -- কেউ তো আর সে আশ্রম অবলম্বন করে নেই। ...তবুও তাকে পবিত্র মনে করে কে জানো ভারতী? ব্রাহ্মণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নিরতিশয় পবিত্র জ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতো জানো? জমিদার।' বিপ্লবীদের এই পুরাতন জ্বরাগ্রস্ত সমাজকে ভাঙতেই হয়।

স্মরণে আসে আপসহীন কবি নজরুলের কথা— 'পুরাতন পচা সমাজের গায়ে স্নেহের হাত বুলিয়ে তার মঙ্গল করা যায় না, তাকে দ্রুত ভাঙতে হয়'। এই ভাঙাটা নতুন করে গড়বার জন্যই। ফলে, জীর্ণ পুরাতনের সংস্কারের পরিবর্তে তার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন মানুষের চেতনায় স্থান না পেলে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সফল হবে না। মানুষের চেতনার জগৎকে এইভাবে তৈরী করার কাজটি শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে করেছেন। বিপ্লবী যতীন দাসের তেষট্টি দিনের অনশনে মৃত্যুর পর এক সভায় শরৎচন্দ্র যে কথাগুলি বলেছিলেন, এখানে তা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'অনেকেই বলেন, গঠনমূলক কাজ কর। যথা, গ্রামে গিয়ে নিরক্ষরদের অক্ষর দান কর। এ যে কাজ নয়, সে আমি বলিনে। কিন্তু যে আসল এবং কঠিন কাজটা তাদের বিদেশীর শাসন থেকে দেশকে মুক্তি দেবে সে সম্বন্ধে তারা নির্বাক।' 'পথের দাবী'তে ভারতী, অপূর্ব, শশী কবি সহ অনেকেই বলছে যে, দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য নানা ধরনের কাজ করছেন দেশের নেতারা। তা শুনে

সব্যসাচীর সুস্পষ্ট কথা, 'দেশের ভাল কাজ করার দায়িত্ব তোমাদের, তোমরা কর'। বলেছেন, 'দেশের মধ্যে ছোট বড় এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা দেশের ঢের ভাল কাজ করে। আর্তের সেবা, নরনারীর পুণ্য সঞ্চয়ে প্রবৃত্তি দান করা, লোকের জ্বর ও পেটের অসুখে ঔষধ যোগানো, জল-প্লাবনে সাহায্য ও সান্ত্বনা দেওয়া ...কিন্তু আমি বিপ্লবী।... ওই-সব ভাল কাজ আমার কাছে ছেলেখেলা। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটিমাত্র সাধনা। এই আমার ভাল, এই আমার মন্দ— এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নাই।' এর দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন দেশের সত্যিকারের ভাল করতে গেলে বিষবৃক্ষ হিসাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যে ভিতটি পাকাপোক্তভাবে প্রোথিত রয়েছে তাকে উৎপাটিত করতে হবে। তাই বলছেন, 'এদের ভাল করা যায় একমাত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে'। নিশ্চয়ই এখানে তিনি শ্রমিক বিপ্লবের কথা বলেন নি। শ্রমিক বিপ্লবের নেতা অর্থাৎ আজকের যুগের প্রয়োজনীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা তিনি ছিলেন না। কিন্তু বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের যে প্রশ্নটিকে তুলেছেন, সেটি যে কোনো সমাজের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে শিক্ষণীয়। যদিও আমাদের বুঝতে হবে, কখনও কখনও সংস্কারের দাবীতে আন্দোলন হতে পারে। কিন্তু সেই আন্দোলন যদি সংস্কারের বেড়াজালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তা যদি সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে বা তার পরিপূরক না হয়— তা হলে তার মাধ্যমে শোষণমুক্তি অসম্ভব। তাই যারা জনসাধারণের আন্দোলনগুলোকে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণতি লাভ করানোর লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পারবেন না, তারা জনসাধারণের যথার্থ মঙ্গলসাধন করতে পারবেন না। বরং তার দ্বারা তারা জনসাধারণকে প্রতারিত করবেন।

অশান্তি মানেই অকল্যাণ নয় – যে কোনো শান্তি মানেই কল্যাণ নয়

যারা আমাদের দেশের তৎকালীন সময়ে এই সংস্কারবাদী আন্দোলনে নিয়োজিত ছিলেন তারা শান্তি রক্ষার প্রশ্নটিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আন্দোলন, প্রতিবাদ, বিক্ষোভের সম্ভাবনা দেখা দিলেই তারা শান্তি রক্ষার প্রশ্ন উত্থাপন করতেন। একথা ঠিক সাধারণ মানুষ শান্তি চায়। নিরুপদ্রব জীবন চায়। শান্তিরক্ষার কথা ভেবে তারা নিশ্চুপ হয়ে যায়। মনের মধ্যে ব্যথা-বেদনা গুমরে গুমরে কাঁদে— তবু শান্ত থাকার কথাই ভাবে। এই ভ্রান্ত চিন্তাকে দূর করার জন্য সব্যসাচী ভারতীকে উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'বাঁধা গরুকে দাঁড়িয়ে অনাহারে মরতে দেখেছ ভারতী, সে দাঁড়িয়ে মরে তবু জীর্ণ দড়িখানা ছিঁড়ে মালিকের শান্তি নষ্ট করে না।' আর তথাকথিত শান্তির চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করে বললেন, '...শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেছে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যামন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে করে তাদের এমন করে তুলেছে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে, —ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল! ...তাই ত আজ দীন-দরিদ্রের চলার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে।' উদাহরণ দিচ্ছেন, 'সুন্দরবনের জঙ্গলে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে কেউ যদি শান্তির বাণী প্রচার করে তাতে তো বাঘ-ভালুকেরই সুবিধা বেশী'। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবুন। আমাদের সমস্ত দেশ যারা পরিচালনা করছে তারা জনসাধারণকে বলছে, শান্তিতে থাক, চুপচাপ থাক, প্রতিবাদ কোর না। সব কিছু মেনে নাও। শুধু তাই নয়, ভয় দেখাচ্ছে প্রতিবাদ করলে তোমাকে জেলে ঢুকিয়ে দেব। প্রতিবাদ করলে দেশদ্রোহী বলে তোমাকে দাগিয়ে দেব, ফলে শান্ত থাক। এ শান্তি তো শ্মশানের শান্তি, গোরস্তানের শান্তি। সুমিত্রার মুখ দিয়ে অন্য এক প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র এও বলেছেন, 'অশান্তি এবং বিপ্লব মানেই তো অকল্যাণ নয়। যে রুগ্ন, জীর্ণ, জরাগ্রস্ত সেই শুধু উৎকণ্ঠিত সতর্কতায় আপনাকে আগলে রাখতে চায়। এমনি অবস্থাই যদি সমাজের হয়ে থাকে, তাহলে যাক্ না একটা হেস্তনেস্ত হয়ে।' প্রতিদিনের জীবনে আমরা যেমন জানি, কোনও ঝড় আকাশে কালো মেঘকে আনে, আবার কোনও দুরন্ত ঝড় আকাশের কালো মেঘকে সরিয়ে দিয়ে নির্মল আকাশকে এনে দিতে পারে।

তেমনই অশান্তি মানেই অকল্যাণ নয়, আবার তথাকথিত শান্তি মানেই কল্যাণ নয়।

তাছাড়া একথা তো ভাবতে হবে— সৈন্যবল, রাষ্ট্রবল, নিপীড়নের সমস্ত শক্তি যারা সমাজকে পরিচালনা করছে অর্থাৎ তখনকার সময়ে ব্রিটিশ শক্তির হাতে। তারা শোষণ-নির্যাতন চালাচ্ছে এই শক্তির সাহায্যে। ভারতবাসী যদি স্বাধীনতা চায়, ব্রিটিশ রাজশক্তি কি নিরুপদ্রবে জায়গা ছেড়ে দেবে? বিপ্লবী চেতনার স্পষ্ট জবাব— তারা তা সহজে ছেড়ে দেবে না। তাই প্রশ্ন ওঠে— এই পরাধীনতাই কি তাহলে মেনে নেবো? নাকি স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব? বিপ্লবীরা শোষণমুক্তির উদ্দেশ্যে লড়াই-এর পক্ষে। আর সংস্কারপন্থীদের আন্দোলনটা কীরকম? তারা বলছেন, জেলের পরিসরকে একটু বড় করে দাও। আর বিপ্লবীদের দাবী জেল থেকে মুক্তি। সব্যসাচী ভারতীকে বলছেন, 'স্বাধীনতার দাবী করা, এমনকি তার কামনা করাও ইংরাজের আইনে দেশদ্রোহ। আমি সেই অপরাধে অপরাধী। চিরদিন পরাধীন থাকাটাই এ দেশের আইন। চীনাদের দেশে মাঞ্চুরাজাদের মত এ দেশেও যদি ইংরেজরা আইন করে দিত— সবাইকে আড়াই হাত টিকি রাখতে হবে— তবে টিকির বিরুদ্ধে এঁরা বেআইনী প্রার্থনা করতেন না। বড় জোর বলতেন, টিকিটা সওয়া দুহাত করে দেওয়া হোক।' এই সংস্কারবাদী আন্দোলন দিয়ে কি সত্যি সত্যিই ভারতের মঙ্গল হবে? তাই তিনি বলছেন, 'বিদেশী শাসনের সংস্কার যে কি, প্রাণপণ আন্দোলনের ফলে কি তাঁরা চান, তার কতটুকু আসল কতটুকু মেকি— কী পেলে নমস্যগণের কান্না থামে, তার কিছুই আমি জানিনে। বিদেশী গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙিয়ে যখন তাঁরা চরম বাণী প্রচার করে বলেন, আমরা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেচি। আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেচে। হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দেমাতরমের দিব্বি করে বলছি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব। দেখি কার সাধ্য বাধা দেয়— এ যে কি প্রার্থনা, এবং কি এর স্বরূপ সে আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু জানি, তাঁদের এই চাওয়া এবং পাওয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই।' বলছেন, 'যদি সমাজ বিপ্লবের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখ ভারতী, তাকে যেতে হয়েছে রক্তাক্ত আন্দোলনের পথ বেয়েই। কারণ কেউ জায়গা ছেড়ে দেয়নি'।

আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, দাস বিদ্রোহ, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব— সব ক্ষেত্রেই মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বলপ্রয়োগ করতে হয়েছে এবং মানুষকে তার জন্য মূল্যও দিতে হয়েছে। মহান মার্কস বলেছেন, 'প্রতিটি পুরনো সমাজের অভ্যন্তরে নতুন সমাজের আগমনে বল বা শক্তি ধাত্রীর ভূমিকা পালন করে।' সব্যসাচী গভীর স্নেহে ভারতীকে বলছেন, 'মহামানবের মুক্তি-সাগরে মানবের রক্তধারা তরঙ্গ তুলে ছুটে যাবে, সেই তো আমার স্বপ্ন। এতকালের পর্বতপ্রমাণ পাপ তবে ধুয়ে যাবে কিসে? আর সেই ধোয়ার কাজে তোমার দাদার দুফোঁটা রক্তেরও যদি প্রয়োজন হয় ত আপত্তি করব না ভারতী।' 'সেটুকু তোমায় চিনি দাদা' — এই বলে নীরব শ্রদ্ধায় মাথা নত করে ভারতী। তবু প্রশ্ন করে, 'দাদা তোমার এত জ্ঞান, আর কি কোনো পথ নেই?' এই প্রশ্নের উত্তরে সব্যসাচী বলেছেন, 'শান্তির পথ, ঐ সনাতন পবিত্র ও সুপ্রাচীন সভ্যতার সংস্কার দিয়ে এঁটে বন্ধ করা আছে— কেবল ওই বিপ্লবের পথটাই খোলা আছে।'

'পথের দাবী'র রচয়িতা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিপ্লবীদের সুগভীর সম্পর্কের কয়েকটি ঘটনা

একথা ঠিকই যে কংগ্রেসে যোগদানের সময় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন 'কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি'। কিন্তু চরকা দিয়ে যে স্বাধীনতা হবে না— এ সত্য তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। গান্ধীজি একদিন এসে দেখছেন যে, শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে শৃঙখলা রক্ষার বোধ থেকে চরকা কাটছেন। মহাত্মাজি জনৈক শ্যামবাবুকে দেখিয়ে পরিহাস করে বললেন, 'Look look, the president of the B.P.C.C. is spinning ropes.' সকলে সেই কথা শুনে হাসতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, 'Nearer the church, remoter from God.' মহাত্মাজি বললেন, 'Sarat

Babu, you have no faith in Charka ?' শরৎচন্দ্র বললেন, 'No, not a jot.' মহাত্মাজি বললেন, 'But you spin better than many lovers of Charka.' শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন, 'I have learnt spinning because I have love for you though not for the Chakra.' মহাত্মাজি মৃদু হেসে বললেন, 'But why don't you believe that the attainment of Swaraj will be helped by spinning ?' শরৎচন্দ্রও হেসে বললেন, 'No, I don't believe. I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers and not by spiders.' আপসহীন ধারার বিপ্লবী কবি নজরুলও একই কথা বলেছেন, 'সূতা দিয়া মোরা স্বাধীনতা আনি/ বসে বসে কাল গুনি/জাগ রে জোয়ান/বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি'।

এই বিপ্লবী মানসিকতার জন্য বিপ্লবীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আন্তরিক ও গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরা তাঁর কাছে শুধু চাঁদা নিয়ে যেতেন তাই নয়, পরামর্শ নিতেন। মাস্টারদাকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন একসময়। আবার, শরৎচন্দ্র ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় এবং হেমচন্দ্র ঘোষকে যখন টাকা দিতে চেয়েছেন, তাঁরা একবাক্যে বলেছেন, 'টাকা আমাদের আছে লাগবে না, আপনি যদি পারেন কিছু গুলি দিন'। হেমচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়, যতটুকু পেরেছেন তাঁদেরকে গুলিও সরবরাহ করেছেন শরৎচন্দ্র। বহু বিপ্লবীর সাথে তাঁর আদান-প্রদানের বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অর্থাৎ 'পথের দাবী' প্রথম প্রকাশের সামান্য কয়েকদিন পরে হিজলী জেলে শরৎচন্দ্রের জন্মদিন পালন উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন বিপ্লবীরা। কিন্তু আগের দিন নৃশংসভাবে গুলি চালিয়ে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নামে দু'জন বিপ্লবীকে হত্যা করে ব্রিটিশ সরকার। জেলে বন্দীহত্যার পর শহীদের রক্তে ভেজা জাতীয় পতাকার একটি অংশ পাঠিয়ে ছিলেন বিপ্লবীরা। জেলবন্দী বিপ্লবীরা তাঁর জন্মদিন পালন উপলক্ষে রচনাটিতে বলেছিলেন, 'শরৎচন্দ্র বাংলার বিপ্লব যজ্ঞের অন্যতম ঋত্বিক, বাংলার নবযুগের একজন শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী এবং এই তাঁর সত্যপরিচয়। তিনি বিপ্লবের যুগ প্রবর্তক। তিনি সব্যসাচী নহেন— সব্যসাচীর রথসারথী।' জানা যায়, তাঁর ব্যক্তিগত ভালবাসা প্রথম ক'বছর সবচেয়ে বেশী ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি এবং শেষের ক'বছর ছিল বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের প্রতি। সমস্ত হৃদয় দিয়ে তিনি ভালবেসেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে। তিনি বলতেন,'সবাইকে ছাড়তে পারি, সুভাষকে পারিনে।'

একবার শিবপুরে হাওড়া জেলা কর্মী সম্মেলন হল। তাঁর প্রিয়তম শিষ্য ও সহকর্মীরা ঐ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। দলাদলির ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র ঐ সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হননি। শরৎচন্দ্রকে যখন সম্মেলনে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে কর্মীরা গেলেন তিনি বললেন,'আমি যাব না।' সহকর্মীরা প্রশ্ন করলেন, 'কেন যাবেন না? হাওড়া জেলার কর্মী সম্মেলন, আপনি যাবেন না কি রকম?' শরৎচন্দ্রের উত্তর— 'ওখানে সুভাষের নিমন্ত্রণ হয়নি। শিবহীন যজ্ঞে আমি যেতে পারিনে।'

আশ্চর্যের বিষয় হল স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করতে করতে যারা গ্রেপ্তার হল, তাদেরকে গান্ধীবাদী সহ সকলেই এড়িয়ে চলতে লাগল। ফলে সাধারণ মানুষও বিপ্লবীদের ভুল বুঝেছিল সে সময়ে। শরৎচন্দ্র এতে গভীর মর্মবেদনা অনুভব করেন। তিনি তখন বলেছিলেন, 'দেশের জন্যে যারা নিজেদের রিক্ত করেছে, নিঃস্ব করেছে, আজকে তারাই হবে দেশের লোকের ভয়ের পাত্র? দেশ ছাড়া যাদের আর কিছু নেই, দেশ হবে তাদের প্রতি বিমুখ? কেন? টিকটিকির ভয়ে? আই. বি. আর স্পেশাল ব্রাঞ্চ এখনো দেশের লোকের মনকে শাসন করবে? কংগ্রেসের কাজ করতে করতে যারা ধরা পড়ল, রাজবন্দী হল, আজ কংগ্রেস তাদের বরণ করবে না কেন? সম্বর্ধনা জানাবে না কেন? গভর্ণমেন্ট তাদের রেভোলিউশনারী বলেছে বলে? ...গভর্ণমেন্ট কি হবে আজ আমাদের conscience keeper? আমাদের নীতিবুদ্ধি কি আমরা identify করব গভর্ণমেন্টের নীতিবুদ্ধির সঙ্গে?' ঠিক এই কথাটিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'পথের দাবীতে— 'পরাধীন দেশের শাসক এবং শাসিতের নৈতিক বুদ্ধি যখন এক হইয়া দাঁড়ায় তাহার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর দেশের নাই।' শরৎচন্দ্র অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথেই সম্বর্ধনা প্রসঙ্গে বললেন,

'We must receive them and congratulate them openly and wholeheartedly. কলকাতাতেই এটা প্রথমে হওয়া উচিত ছিল; বি. পি. সি. সি.র-ই এটা করা উচিত ছিল, কিন্তু তা যখন হল না, তখন আমরাই প্রথমে করব।'

শরৎচন্দ্র সম্বর্ধনার উদ্যোগ নিলেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হলেন। আবেগদীপ্ত কণ্ঠে তিনি আহ্বান জানালেন, 'দেশের জন্যে এরা যৌবন উৎসর্গ করেছে, জীবন উৎসর্গ করেছে, সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে, এরাই দেশের মুক্তির অগ্রদূত। ...গভর্ণমেন্ট সহস্র চেষ্টা করেও পারলে না ধ্বংস করতে এদের মনের অপরাজেয় বল আর অন্তরের অনির্বাণ স্বাধীনতার স্বপ্ন। চির-চঞ্চল চিরজীবী চির-তরুণ এরা। দেশের তরুণদের আমি বলি তোমাদের এত বড় আপনজন, এত বড় জীবন্ত আদর্শ আর কেউ নেই।' এই সম্বর্ধনাজ্ঞাপনের পরে মানুষের মধ্যে ভুল ভাঙে এবং যুবকরা আবার বিপ্লবীদের আপনজন হিসাবে গ্রহণ করে। শরৎচন্দ্রের এই ভূমিকা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে নতুন প্রাণের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল সেদিন।

বিপ্লবীরা হিংস্র নন — যথার্থ কোমল হৃদয়ের অধিকারী

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দেশের ইতিহাসে বিপ্লবীদের যে দৃষ্টিতে দেখা হয় উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। স্বাধীনোত্তরকালে আমাদের দেশের ইতিহাসে পড়ানো হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দুটি ভাগ। একটি সহিংস আন্দোলন আর একটি অহিংস আন্দোলন। কিন্তু আমরা মনে করি বলা উচিৎ, একটি অহিংস আন্দোলন ও অপরটি সশস্ত্র আন্দোলন। কারণ, বিপ্লবীরা কেউ হিংস্র নন। আমাদের দেশের বিপ্লবীদের জীবনে এবং 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর মধ্যে হিংস্রতার কোন জায়গা নেই। স্বাধীনতা আন্দোলনের কিশোর শহীদ ক্ষুদিরামের কথা ধরুন। তিনি বলতেন, 'আমি পাগল হয়ে যাই যখন দেখি গরীব মানুষ শীতে কাঁপে আর বড়লোকের ছেলেরা রাস্তা দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে চলে যায়,আমি সহ্য করতে পারি না'। কি ধরনের মন! এখানে হিংস্রতার ছাপ আছে কি? বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার যেদিন ফাঁসি হল, তার পরের দিন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ভারতবর্ষের একটি মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, গুনগুন করে গান গাইছেন, 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি'। পেছন থেকে সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ডাকছেন। নেতাজী যখন ফিরে তাকাচ্ছেন, দেখা গেল মুখটা একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা। সারা রাত কাঁদছেন! ইনি হিংস্র? মাস্টারদা যখন একের পর এক বিপ্লবীর জীবন বিসর্জন দিতে সংগ্রামে পাঠাচ্ছেন আর বলছেন, 'আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কত বিজয়াই তো এসে গেছে, কত মানুষের জীবনের বিজয়ার নিমিত্ত হলাম। কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তাঁর সোনার পুতলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি— আজ বিজয়ার দিনে, সে দিনের বিজয়ার করুণ স্মৃতি মর্মে মর্মে কান্নার সুর তুলছে— চোখের জল কিছুতেই রোধ করতে পারছি না। —'চাপিতে গেলে উঠে দুকূল ছাপিয়া'। একে হিংস্র বলা যায়? সূর্য সেনের জীবনে আরও একটা ঘটনা। দলের একজন জেলে থাকা অবস্থায় পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করে ফেলেছে। বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে ঠিক করা হয়েছে তাকে শাস্তি দিতে হত্যা করা হবে জেলের মধ্যে। মাস্টারদার কাছে তার অনুমতি নিতে এসেছে। মাস্টারদা বলছেন, 'পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি বা আত্মসমর্পণ নিশ্চয়ই আদর্শ বিচ্যুতি। ...আমাদের কারবার চপলমতি বালক বালিকাদের নিয়ে, ও যা করেছে তার ফল ভোগ করতে হবে, ওকে খুন করে কি হবে? বরং এর থেকে শিক্ষা নাও, আরো শক্ত করে এদেরকে গড়ে তোল'। ঠিক তার পরে পরেই গভীর স্নেহে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার প্রাণের দ্বারে যারা স্নেহার্থ অতিথি হিসাবে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তাদের ভূমিকাই আজ অগ্রপথিকের।' কী অপূর্ব স্বীকৃতি! কী অসাধারণ হৃদয়বৃত্তির কারবার! এদেরকে হিংস্র বলব?

পথের দাবীতে ভারতীও যখন সব্যসাচী সম্পর্কে আলোচনা করছে, তখন বলছে 'সকলের দুঃখ নিয়ে তুমি দুঃখ পাচ্ছ শুধু তোমার দুঃখ দেখার কেউ নেই'। কথাগুলো কি কেবলমাত্র কালো অক্ষরেই শরৎচন্দ্র লিখে গিয়েছেন? উপন্যাসে ভারতীর সঙ্গে কথোপকথনে একটি

ঘটনার উল্লেখ আছে। সব্যসাচীর এক সহকর্মী নীলকান্ত যোশীর ফাঁসির কথা বলতে গিয়ে তাঁর পরম সংযত গভীর হৃদয় ক্ষণিকের জন্য আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। আর মারহাট্টার ছেলে সেই নীলকান্ত যোশীও ছিল এমনই এক বিপ্লবী, কোনও শবদেহ দেখলে যার চোখ দিয়ে জল গড়াতো। আত্মগোপনের সময় এক পার্কে আশ্রয় নিতে গিয়ে এক মুমূর্ষু কলেরা রোগীকে দেখে শুশ্রূষা করতে থাকল। সকাল হওয়ার আগে সব্যসাচী নীলকান্তকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকল। সব্যসাচীর আবেদন সত্ত্বেও সে তাঁকে বলল, 'ওই রোগীকে ছেড়ে যাব কী করে?' ভারতীকে এই ঘটনা উল্লেখ করার পর সব্যসাচীর কথা, 'এখনও এইসব ছেলে এদেশেই জন্মায় ভারতী! তা নইলে বাকী জীবনটা তোমার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকতে হয়ত রাজী হয়ে পড়তাম।' এই সব্যসাচী কি রক্তপিপাসু? যিনি বলছেন, 'তাকে অস্ত্রের মাধ্যমে বিপ্লবের পথে যেতে হবে'; কিন্তু 'বিনা প্রয়োজনে একটি পিপীলিকাকেও আমি হত্যা করতে পারি না'। দেশের প্রয়োজনে স্বাধীনতার প্রয়োজনে, সমাজের মুক্তির প্রয়োজনে সশস্ত্র লড়াইয়ের দরকার হয়। একে হিংস্রতা বলে না।

শহীদ-ঈ-আজম ভগৎ সিং এ প্রসঙ্গে বলেছেন, হিংসা কথাটির অর্থ হল, অন্যায়ের সমর্থনে বলপ্রয়োগ। কিন্তু বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য তা নয়। বিপ্লবের জন্য অর্থাৎ মানুষের মুক্তির জন্য অপরিসীম নির্যাতন সহ্য করতে, মহৎ থেকে মহত্তর ত্যাগ স্বীকার করতে সে প্রস্তুত থাকে। একে হিংসা নামে অভিহিত করা যায় না।' এখানে রয়েছে হৃদয়বৃত্তি। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষের শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্যই তো একজন বিপ্লবী স্বেচ্ছায় এ জীবন বেছে নেয়। তার হৃদয়ে অসংখ্য মানুষের ব্যথার আঁচড় পড়ে। এই নিয়েই তো তার পথ চলা। কোনও এক অনাগতকালে স্বাধীনতা অর্জিত হবে, বিপ্লবের বিজয় পতাকা উড্ডীন হবে— বিপ্লবীরা সেই স্বপ্ন দেখে বিভোর হ'য়ে। এর জন্য জীবনদান করে সে আনন্দ পায়, তৃপ্তি পায়। আনন্দ ও তৃপ্তির রূপ এবং কাঠামোটাই তাদের কাছে আলাদা। সাধারণ মানুষের জীবনের আনন্দ-তৃপ্তির সঙ্গে তার সুবিশাল পার্থক্য। সে পার্থক্য জীবন ও জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে উপলব্ধির পার্থক্য। আজকের যুগের বিপ্লবীদের স্বপ্ন নিশ্চয়ই আগামী দিনে স্বাধীনতার পতাকা ওড়াবার নয়। আজকের বিপ্লবীদের স্বপ্ন এবং প্রতিদিনের কাজের মধ্যে নিহিত আকাঙ্ক্ষা হল, একদিন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হ'য়ে সেই বিপ্লবের বিজয় পতাকা উড়বে। বিপ্লবীদের এই যে স্বপ্ন দেখতে পারা, স্বপ্ন দেখতে শিখিয়ে দেওয়া, স্বপ্ন দেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করা, নানান রকম বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করে বিপ্লবের পথে টেনে আনার কাজ সব্যসাচীর চরিত্র সেদিন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। সেখান থেকে যুগভিত্তিক শিক্ষা নিতে হবে। এইখানেই 'পথের দাবী' বা সব্যসাচীর প্রাসঙ্গিকতা।

স্বাধীনতা এবং বিপ্লব কেন চাই— সেই প্রসঙ্গে সব্যসাচীর কথার ব্যঞ্জনা কী অপূর্ব! বলছেন, 'স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ কথা না, ধর্ম, কাব্য, সাহিত্য আরো বড়। তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যই স্বাধীনতা চাই'। আরও বলেছেন, 'ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা— এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লবপন্থাতেই রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে।' অর্থাৎ, মানুষের সমগ্র জীবনের স্বার্থে যে একটা অগ্রগতি বা বিকাশ, তার জন্য বিপ্লব চাই, স্বাধীনতা চাই। মানুষের জীবন নানান খাতে প্রবাহিত। সভ্যতা আমাদের নানান সম্পদ উপহার দিয়েছে, নানান চিন্তার দুয়ার খুলে দিয়েছে। তার সর্বাঙ্গীন বিকাশকে আটকে দিচ্ছে কে? তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজ। তাহলে এর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য কি চাই? বৃটিশ রাজ থেকে মুক্তি চাই, স্বাধীনতা চাই। এর থেকে যদি যুগোপযোগী শিক্ষা নিই, তাহলে আজকের যুগে বিপ্লবীরা ভাববে, এই যে পুঁজিবাদী সমাজ বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা, প্রেম, ভালবাসা, মমতা, হৃদয়বৃত্তি, সুকুমারবৃত্তি সবই মুনাফার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব মানুষের সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে দিয়েছে। মানুষের চরিত্রের মাধুর্য্যকে শেষ করে দিয়েছে। স্বার্থপরতার কালো মেঘ এসে সংসারের মাধুর্য-সৌন্দর্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এর হাত থেকে মুক্তির জন্য বিপ্লব চাই। এখানেও বিপ্লবটাই শুধু বিপ্লবের শেষ কথা নয়।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, 'আমরা যখন বলি যে, ভারতবর্ষে আজ আবার একটা বিপ্লব দরকার, ...তখন আমরা বলি পুঁজিবাদী লোভ, মুনাফাচক্র এবং মোটিভ বা উদ্দেশ্য থেকে উৎপাদনকে, বিজ্ঞানকে, আর্টকে, সাহিত্যকে, মূল্যবোধকে, আচার-বিচারকে— এক কথায় গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এবং বিজ্ঞানসাধনাকে মুক্ত করার কথা। ...আমাদের মূল্যবোধ, রুচি এবং আর্ট, শিল্প, সাহিত্য সমস্ত কিছুকে পুঁজিবাদী জুলুম এবং মোটিভ যা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তার থেকে মুক্তির লড়াই। এমনকি ভালবাসার, পারিবারিক শান্তির ক্ষেত্রেও মুক্তির লড়াই।' সব্যসাচী এ বিপ্লবের কথা বলেন নি, বলবার কথাও নয়। তিনি ব্রিটিশের শাসন থেকে স্বাধীনতার কথা বলেছেন। সব্যসাচীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণের ধারা দিয়ে বর্তমান বিপ্লব সম্ভব হবে না— কিন্তু সেই ধারার থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

'পথের দাবী'-তে উত্থাপিত নারী স্বাধীনতা প্রসঙ্গে

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, শরৎচন্দ্র হলেন সেই বলিষ্ঠ ও মরমী শিল্পী যিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিপ্লবী নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। যখন স্বাধীনতা আন্দোলন তো দূরের কথা, অন্তঃপুরের বাইরে পা' ফেলাটাই সমাজে গর্হিত অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হত— সেই সময়ে তিনি 'পথের দাবী'-তে সুমিত্রার মতো বিপ্লবী নারী চরিত্রকে ফুটিয়ে চলেছেন এবং নারী স্বাধীনতার চিন্তাকে সুমিত্রার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে তিনি উপস্থিত করেছেন। ভারতীর সঙ্গে অপূর্ব যখন প্রথম 'পথের দাবী'-তে এল, তখন নবতারা স্বামীর ঘর ত্যাগ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য এসেছে। নবতারার স্বামীর বন্ধু মনোহরবাবু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য নির্দেশ করে নবতারার এই আচরণের বিরোধিতা করছেন। এমনকি এই বয়সে এই কাজে যোগ দিলে সতীত্ব বজায় রাখতে পারবে কি না তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করছেন। সুমিত্রা 'পথের দাবী'র প্রেসিডেন্ট হিসাবে বললেন, 'নবতারা কি করবেন, সে বিচারের ভার নবতারারই হাতে'। এও বললেন, 'কর্তব্যবোধ এক তরফের নয়'। এ নিয়ে উত্তেজিত মনোহরবাবু সীতা-সাবিত্রীর উদাহরণ দিয়ে এদেশের ঐতিহ্যের কথা বললে তার উত্তরে সুমিত্রা বললেন, 'নবতারা যদি বলেন যে এই দেশে একদিন সীতা আত্মসম্মান রাখতে স্বামী ত্যাগ করে পাতালে গিয়েছিলেন এবং রাজকন্যা সাবিত্রী দরিদ্র সত্যবানকে বিবাহের পূর্বে এত ভালোবেসেছিলেন যে অত্যন্ত স্বল্পায়ু জেনেও তাকে বিবাহ করতে বাধেনি। এবং আমিও আমার দুর্বৃত্ত যে স্বামীকে ভালবাসতে পারিনি তাকে ত্যাগ করে এসেছি— এই শিক্ষায় তো মেয়েদের ভালোই হবে।' এতে মনোহরবাবু যেমন ক্ষুব্ধ হন, তেমনই অপূর্বও সুমিত্রার কথাকে সমর্থন করতে পারেনি। প্রশ্ন করল, নবতারার আচরণকে সুমিত্রারা সমর্থন করেন কি না। সুমিত্রার উত্তর— 'দেশের বড় আমার কাছে কিছু নেই। নবতারা স্বামীর ঘর করতে চাইছে না। সে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে চাইছে।' অথচ অপূর্বর পুরানো সংস্কার বলছে, মেয়েরা স্বাধীনতা আন্দোলনে আসবে না। মেয়েদের কাজ হবে ঘরের মধ্যে। অপূর্ব তার ধারণা অনুযায়ী প্রশ্ন তুলে বলছে, 'একজন মেয়ে হিসাবে নবতারার সংসার জীবন ছেড়ে আসাটা ঠিক হবে না। দেশকে আমিও ভালোবাসি। পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র তো আলাদা। পুরুষ কাজ করবে বাইরে। আর নারী করবে গৃহের শুদ্ধ অন্তঃপুরে। পুরুষের সঙ্গে ভিড় করে বাইরে দাঁড়ালে তাতে দেশের কল্যাণ হবে না।' সুমিত্রা বলছেন যে, 'দেশের কাজ যদি মেয়েরা করে অসুবিধা কোথায়?' চিরাচরিত ধারায় সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অপূর্ব। তার উত্তরে 'পথের দাবী'র প্রেসিডেন্ট হিসাবে সুমিত্রার কী বলিষ্ঠ উক্তি! বলছেন যে, 'কোন একটা কথা বহুকাল ধরে বহু লোকে বলে আসছে বলে তা সত্য হয় না। এর মধ্যে ফাঁকি আছে। যাকে আপনি নারীর বাইরে এসে ভিড় করার কথা বলছেন, সে যদি কখনো ঘটে, তখনই দেশের কাজ হবে। নইলে কেবলমাত্র পুরুষের ভিড়ে শুকনো বালির মত সমস্ত ঝরে ঝরে পড়বে— কোনদিন জমাট বাঁধবে না।' অপূর্বের আরও কিছু প্রশ্নের উত্তরে সুমিত্রা বলছেন, 'যে দেশে শুধু পুত্রের জন্যই ভার্যা গ্রহণের বিধি আছে, নারী হয়ে তাকে আমি সম্মানের চোখে দেখতে পারি না। সতীত্ব তো শুধু দেহেই পর্যবসিত হওয়া নয় অপূর্ববাবু, কায়মনোবাক্যে ভালবাসতে না পারলে ওর উচ্চস্তরে ওঠা

যায় না। একি পুকুরের জল, যে কোনো পাত্রে ঢেলে মুখ বন্ধ করে রাখবেন, সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করবে? তা নয়, উনি যদি স্বেচ্ছায় দেশের কাজ করতে আসেন তাকে আমি বাধা দেব কি করে?' নারী স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে উপন্যাসে নানান কথোপকথনের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন শরৎচন্দ্র। যদি সত্যিই স্বাধীনতা আন্দোলনকে কার্যকরীভাবে গড়ে তুলতে হয় নারীদেরও যোগ দিতে হবে এই আন্দোলনে। কারণ, সমাজের অর্ধেক অংশ হচ্ছে নারী। উপন্যাসের এক জায়গায় সব্যসাচী বলছেন, 'যদি কোনদিন দেখ, কোথাও আগুন জ্বেলেছে, তাহলে মনে রাখবে মেয়েরাই জ্বেলেছে'। একথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল, মেয়েরাই জ্বেলেছে মানে পুরুষরা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে না, তা নয়। মেয়েরা যখন জ্বালে অর্থাৎ একটা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তখন স্বামী পুত্র ভ্রাতা হিসাবে পুরুষদের মধ্যে গভীরতর প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। গণআন্দোলনের ইতিহাসে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের দেশে তেভাগা আন্দোলনে এবং পরবর্তীকালে বামপন্থী গণআন্দোলনে নারীদের ভূমিকা এই সত্যকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

একদল মানুষ নারীদের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার প্রবল বিরোধিতা করে সে সময়ে ব্যাপক প্রচার চালায় এবং বলে, নারী - পুরুষ একত্রে মিললে তাকে কেন্দ্র করে কিছু দুর্নাম আসতে পারে। এই সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র স্পষ্টভাবে তাঁর মনোভাব তুলে ধরে বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রীয় সাধনাতে নারীকেও নামতে হবে— স্বাধীনতার জন্য নারী-পুরুষের সম্মিলিত সাধনা চাই, তা নইলে কিছু হবে না। আমি জানি ছেলেরা আর মেয়েরা যদি একসঙ্গে কাজে নামে, তাহলে দেশের লোক নানারকম কুৎসা রটাবেই, তা রটাক। নিন্দুক তার কাজ করবেই, কিন্তু তাই বলে কি আমরা কাজ বন্ধ রাখবো?' এরই সাথে সামাজিক কাজে যারা অগ্রণী ভূমিকা নেয় তাদের কাছে একটা বড় মূল্যবোধের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'দেশের জন্য যে সুনামের প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করতে পারবে না, তার আবার ত্যাগ কোথায়?' তথাকথিত নীতিবাগীশদের রক্ষণশীলতাকে কষাঘাত করে আরও বলেছিলেন, 'ও প্রশ্নের চুলচেরা বিচারের দরকার নেই। কখনো কোথাও পান থেকে একটু চুন যদিই বা খসে সেইটেই বড় কথা নয়। মশাল যখন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে তখন তার দীপ্তিতে অন্ধকার প্রান্তর আলোকিত হয়ে উঠল কিনা, সেইটেই বড় কথা, তার পোড়া ন্যাকড়া থেকে একটু দুর্গন্ধ বেরুল কিনা, সে প্রশ্ন নিতান্তই তুচ্ছ। বন্যার প্লাবনে সমস্ত দেশ যদি ধুয়ে নির্মল হয়ে যায়, মাঠের পর মাঠ যদি পলিমাটি পেয়ে উর্বর হয়ে ওঠে ত সেই আমার পরম লাভ। কোথায় সেই বানের জলের মধ্যে একটু ময়লা ভেসে এল, কোথায় তাতে দুটো ইঁদুর মরে পচে রইল, তার জন্যে আমার কোন ক্ষোভ নেই!' 'পথের দাবী'তে সুমিত্রার মধ্য দিয়ে এবং ভারতীর সঙ্গে সব্যসাচীর কথোপকথনে নারীমুক্তির এই চেতনা পাঠকের দরবারে উপস্থিত করা হয়েছে। মেয়েরা যদি এগিয়ে আসে তাহলে তাদেরও আসার অধিকার আছে। তারাও গড়ে উঠবে এবং স্বাধীনতার যোদ্ধা হিসাবে তাদেরকেও গড়ে তুলতে হবে। আপনারা জানেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীরা অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে কি পারবে না, এ নিয়ে বিপ্লবীদের একটা অংশের মধ্যেও সেদিন নানা ধরনের সংশয় ছিল এমনকি বিরোধিতাও। কিন্তু নারীরা যে পারে, তা প্রমাণ করবার জন্য প্রীতিলতা তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে সংগ্রামের পথে অংশ নিতে গিয়ে শান্তি-সুনীতি তাই জেলে বসে আনন্দে গাইতে পারত— 'ত্যাগের ব্যথা বাজবে না প্রাণে যবে,সেদিন মোদের স্বাধীন হওয়া সহজ হবে'। এরকম সংগ্রামী নারী স্বাধীনতা আন্দোলনে পর পর এসেছে। আজকের বিপ্লবী সংগ্রামে অর্থাৎ পুঁজিবাদ বিরোধী সর্বহারা বিপ্লবের সংগ্রামে নারীর ভূমিকাকে শরৎ চিন্তার নির্যাস নিয়ে নিঃসন্দেহে হতে হবে আরও অনেক অগ্রবর্তী। এবং তা আজকের উন্নততর চেতনা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে।

যুগের প্রেক্ষিতে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের ভূমিকা এবং কৃষক সমাজ

আবার শ্রমিক এবং শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে যে

দৃষ্টিভঙ্গি এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে— তা তৎকালীন সময়ের বিচারে কতখানি সমৃদ্ধ! কারণ শরৎচন্দ্র যে বিপ্লববাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন, যে বিপ্লববাদকে তিনি তাঁর সাহিত্যে এনেছেন তা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লববাদ। যাকে আমরা পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদ বলি। পঁচানব্বই বছর আগে এই পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের মধ্যে শ্রমিক বিপ্লবের সমস্ত উপাদান খুঁজতে গেলে তা পাওয়া যাবে না, খোঁজার চেষ্টা করা সঠিকও হবে না। আমাদের দেশের একদল সমালোচক অবশ্য সেই চেষ্টাই করেন। কিন্তু তা কখনোই বিজ্ঞানসম্মত নয়। উপন্যাসের একটি অংশে যেখানে ফয়ার মাঠের সভায় শ্রমিকদের কাছে অপূর্ব তার বক্তব্য বলতে পারছে না, তখন প্রেসিডেন্ট সুমিত্রাকে রামদাস তলওয়ারকর জিজ্ঞেস করছেন— 'আমি কিছু বলতে পারি?' সুমিত্রা অনুমতি দেওয়ার পর রামদাস তলওয়ারকর শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে যে বিষয়গুলি বলেছিলেন— তা চিন্তাগত দিক থেকে পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের চিন্তার সীমানাকে অতিক্রম করেছে। রামদাস তলওয়ারকর শ্রমিকদের আহ্বান করে বলছেন, '...এই গোটাকতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু? এই সত্য কি তোমরা বুঝবে না? ...তোমাদের গায়ের জোরকে তারা ভয় করে, তোমাদের শিক্ষার শক্তিকে তারা অত্যন্ত সংশয়ের চোখে দেখে, তোমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় তাদের রক্ত শুকিয়ে যায়! ...তোমরা হলে তাদের কল চালাবার, বোঝা বইবার জানোয়ার... তোমরাই যে তাদের বিলাস-ব্যসনের একমাত্র পাদপীঠ! তাই, মাত্র তোমাদের জীবনধারণটুকুর বেশী তিলার্ধ যে তারা স্বেচ্ছায় কোনদিন দেবে না —এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা কি তোমাদের এতই কঠিন! ...দরিদ্রের এই বাঁচবার লড়াইয়ে তোমরা কি সকল শক্তি দিয়ে যোগ দিতে পারবে না? ...শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার মাত্র যদি সত্য কথাটা বুঝতে পারো যে তোমরাও মানুষ, তোমরা যত দুঃখী, যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিতই হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোনো অজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। ...এ কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই! এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, ...হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,— জৈন, শিখ কোন কিছুই নেই, —আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক! ...বিনাশ্রমে সংসারে কিছুই উৎপন্ন হয় না — তাই, শ্রমিকও ...সকল বস্তু, সকল কারখানার অধিকারী। ...মানুষ হয়ে জন্মাবার মর্যাদা যদি না মনিবের পায়ে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে থাকো ত এতবড় উৎপীড়ন, এতবড় অপমান তোমরা সহ্য করো না!'

পথের দাবীর রচনাকাল ১৯২৬। তার মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯১৭ সালে সফল হয়েছে সোভিয়েত বিপ্লব। সোভিয়েত বিপ্লবের একটা ঢেউ সবেমাত্র এদেশে এসেছে। কমিউনিস্ট পার্টি নামে পার্টিটিও গঠিত হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে। যোগাযোগের ব্যবস্থা তখন যা ছিল, তাতে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে খবরের আদান-প্রদান ছিল সময় সাপেক্ষ। তবুও শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে যে বিষয়গুলিকে শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'তে তুলে ধরেছেন, তা সমসাময়িক আর কোনও সাহিত্যিকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। একথা ঠিক, সমাজতন্ত্রের চিন্তা অনুযায়ী যৌথ মালিকানার কথা শরৎচন্দ্র বলেন নি, শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে তা আশা করাও যুক্তিসম্মত নয়।

অন্যদিক থেকে শ্রমিক আন্দোলনে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ভূমিকার বাস্তব কথাটিও তুলে ধরেছেন ঘটনার আঙ্গিকে। রামদাস তলওয়ারকর তার বক্তব্যের শেষের দিকে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলছেন, 'এ সত্য কি তোমরা বুঝবে না'? এর অর্থ হল, শ্রমিকদেরকে জাগানোর কাজে রামদাস তলওয়ারকর নিজেকে নিয়োজিত করছেন। এখানেই হচ্ছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সত্যিকারের ভূমিকা। বিষয়টি অনেক সমালোচক ধরতেই পারছেন না। এখানে বিচার্য বিষয় হল, নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত শ্রমিকদেরকে জাগাবে কে? জাগাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়। কি করে? আদর্শের দ্বারা। তারা উন্নত চিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবে, উদ্বুদ্ধ হয়ে চাষিকে, মজুরকে উদ্বুদ্ধ করবে। তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালবে, চেতনাকে জাগিয়ে দেবে। তাই শশী কবিকে সব্যসাচী একজায়গায় বলছেন, 'আমি রাজনৈতিক বিপ্লবের দায়িত্ব নিচ্ছি, তুমি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দায়িত্ব নাও। ...প্রাণ খুলে

শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন, —ধর্ম, সমাজ, সংস্কার —সমস্ত ভেঙ্গেচুরে ধ্বংস হয়ে যাক, — এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই।' এই যে পুরাতন সমাজকে ভাঙতে হবে, এই চেতনা জাগাবে শিক্ষিত সমাজ। রামদাস তলওয়ারকরের কথায়ও সে কথা অত্যন্ত পরিষ্কার। পরিষ্কার করেই তিনি বলছেন, 'ভাই বঞ্চিতের দল! তোমাদের কাছে আমার মিনতি— আমাদের তোমরা অবিশ্বাস কোরো না। শিক্ষিত বলে, ভদ্র বংশের বলে, কারখানায় দিন মজুরি করিনে বলে আমাদের সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে নিজেদের সর্বনাশ তোমরা নিজেরাই করো না। তোমাদের ঘুম ভাঙাবার প্রথম শঙখধ্বনি সর্বদেশে সর্বকালে আমরাই করে এসেছি। আজ হয়ত না বুঝতে পারো, কিন্তু নিশ্চয় জেনো, এই 'পথের দাবী'র চেয়ে বড় বন্ধু এ-দেশে তোমাদের আর কেউ নেই।' প্রসঙ্গত মহান লেনিনের শিক্ষাটিও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং সমাজতন্ত্রের চেতনা 'could only be brought to them from without'।

এখানে শিক্ষিত সম্প্রদায় মানে জমিদার সম্প্রদায় নয়। কোন কোন জমিদার শিক্ষিত হওয়ার দ্বারা আদর্শের প্রভাবে ব্যক্তিগতভাবে এই পথের অনুসারী হতে পারে, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু যারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যারা বিপ্লবের আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করতে পারে চিন্তার দ্বারা, সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর ভরসা করেছেন সব্যসাচী। এটিই যুগের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানসম্মত এবং বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গি। সব্যসাচী যখন বলছেন, 'আমার কাজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে', তখন ভুল বুঝে ভারতী বলছে, 'তুমিও জাত মানো?' সব্যসাচী বলছেন, 'আমি বর্ণাশ্রমের জাত মানি না। কিন্তু শিক্ষিত জাতি চাই।' ডিগ্রিধারী শিক্ষার অর্থে সব্যসাচী একথা বলেন নি, বলেছেন যাদের মধ্যে আদর্শবোধ আছে। আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব, জীবনে বিপ্লবী আদর্শকে গ্রহণ করেছেন ভগৎ সিং, রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা, চন্দ্রশেখর আজাদ, মাস্টারদা, বাঘাযতীন, বিনয়-বাদল-দীনেশ— এরা সকলেই মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত। ক্ষুদিরাম যখন ধরা পড়েছিল প্রথমবারে, তাঁর জামাইবাবুকে এক অফিসার বলছে, 'ক্ষুদিরামকে ইংরেজি মাধ্যম কোন স্কুলে ভর্তি করে দিন'। জামাইবাবু তার উত্তরে বলেছিলেন, 'ওইসব স্কুলে যারা পড়ছে দেখবেন তারাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিপ্লবী হচ্ছে।' অর্থাৎ তাদের মধ্যে শিক্ষা একটা নতুন চেতনাকে এনে দিচ্ছে। সেইজন্য সব্যসাচী নির্ভর করেছে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর। বাংলার বুকে এঁরাই তো তখন অভিহিত হয়েছেন 'ফ্লাওয়ার্স অব বেঙ্গল' নামে।

আবার এও মনে রাখতে হবে যে, ভারতী, অপূর্ব এবং শশী কবিকে সব্যসাচী বলেছেন, 'যেদিন তারা জেগে উঠবে সেদিন তাদের হাতেই কর্তব্যভার তুলে দিতে হবে'। অত্যন্ত সমাজ সচেতন শিল্পী হিসাবে শরৎচন্দ্র কিন্তু এই মধ্যবিত্ত-শিক্ষিতদের উদ্দেশ্যে অন্যত্র বলেছেন, 'দেখ আজ আমাদের দেশে শ্রমিকরা জাগ্রত নয়, সংঘবদ্ধ নয়, পীড়ন ও শোষণ তাদের উপরে অকথ্য বর্বরভাবে চলছে, আজ তোমাদের দরকার রয়েছে তাদের জাগাবার কাজে, সংঘবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্য। কিন্তু জেনো, যেদিন এদের ঘুম ভাঙবে, এদের ভিতরে সংঘবদ্ধতা আসবে। সেদিন ওদের নিজেদের ভিতর থেকেই ওদের নেতা তৈরী হবে, সেদিন তোমরা হবে অনাবশ্যক। সেদিন ওদের পরিচালনার ভার ওদের নেতাদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে খুশী মনে চলে আসতে হবে— তোমাদের মনকে এমনিভাবে তৈরী করে তোলা দরকার। কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে যেন চিরকাল ওদের নেতৃত্ব করবার মোহ মনের মধ্যে না জন্মায়।'

প্রসঙ্গক্রমে কৃষকদের সম্পর্কে সব্যসাচীর বক্তব্য একটা বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে তিনি বলছেন, 'শ্রমিক এবং কৃষক এক নয় ভারতী। তাই আমাকে পাবে কুলি-মজুর-কারিকরের মাঝখানে, কারখানার বারাকে, কিন্তু পাবে না খুঁজে পাড়াগাঁয়ে চাষীর কুটিরে।' এই বক্তব্য থেকে কোন কোন সমালোচক শরৎচন্দ্রের কৃষক সমাজ সম্পর্কে অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলে থাকেন। কিন্তু শরৎ সাহিত্যের আনাচে কানাচে দেশের, বিশেষ করে বাংলার কৃষক সমাজের ব্যথা-বেদনার করুণ কাহিনী ছড়িয়ে আছে। 'পণ্ডিতমশাই'তে তিনি

বলছেন, 'যারা আপনাদের মুখের অন্ন, পরনের বসন জোগায়, সেই হতভাগা দরিদ্রের এই সব গ্রামেই বাস। তা'দিগেই দু'পায়ে মাড়িয়ে থেঁৎলে থেঁৎলে আপনাদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি তৈরী হয়।' 'শ্রীকান্তে' পাই, 'দীঘি নেই, পুকুর নেই, কুয়ো নেই, কোথাও একফোঁটা খাবার জল নেই, গ্রীষ্মকালে গরু-বাছুরগুলো জলাভাবে ধড়ফড় করে মরে যায় ...ম্যালেরিয়া, কলেরা, হর্-রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজাড় হয়ে গেল, কিন্তু কাকশ্য পরিবেদনা!' 'পল্লীসমাজে' দেখি গ্রামীণ জীবনের অবস্থা— 'কোথায় সে জীবন্ত ধর্ম আমাদের এই সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে ...এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্যসমাজ যে যথার্থ ধর্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার এই বিষাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতা অহর্নিশি অধঃপাতে নামিয়া চলিতেছে। ...হায় রে, এই আমাদের গর্বের ধন —বাংলার শুদ্ধ, শান্ত, ন্যায়নিষ্ঠ পল্লী সমাজ! একদিন হয়ত ইহার প্রাণ ছিল, ...কিন্তু আজ ইহা মৃত; তথাপি আজ পল্লীবাসীরা এই গুরুভার বিকৃত শবদেহটাকে পরিত্যাগ না করিয়া মিথ্যা মমতায় রাত্রিদিন মাথায় বহিয়া বহিয়া এমন দিনের পর দিন ক্লান্ত, অবসন্ন ও নির্জীব হইয়া উঠিতেছে, কিছুতেই চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছে না।' শুধু তাই নয়, এই 'পথের দাবী'তেই শশী কবিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে যখন বলছেন যে 'আইডিয়ার জন্য এরাই প্রাণ দিতে পারে' — ঠিক তার পরপরই সব্যসাচীর স্বপ্নভরা প্রত্যয়— 'এইটেই শেষ কথা নয় কবি, মানবের গতি এইখানেই নিশ্চল হয়ে থাকবে না। কৃষকের দিনও একদিন আসবে, যখন তাদের হাতেই জাতির সকল কল্যাণ-অকল্যাণদের ভার সমর্পণ করতে হবে।'

একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, মার্কসবাদী আন্দোলনের মধ্যে লেনিনের সময় থেকে এমনকি 'পথের দাবী' রচনার সময়কাল পর্যন্তও (১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে) কৃষকদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নিয়ে নানা মতামত সাম্যবাদী আন্দোলনের একটা অংশের নেতৃত্বের মধ্যেই বিরাজ করত। ফলে, শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে এই সম্পর্কে একটা সঠিক দিকনির্দেশমূলক বিশ্লেষণ আশা করা পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত নয়। সে যাই হোক, আমাদের দেশে প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের সময়ে কৃষক সহ সকল দীন দরিদ্রের বেদনার অবসান যুক্ত হয়েছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মকাণ্ডে। আমাদের দেশে যা রূপ পেয়েছে পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানেন, বর্তমান সময়ের শ্রমিক বা সর্বহারা বিপ্লবে কৃষকদের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা, তা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে থাকে না। আজকে আমাদের বুঝতে হবে, এদেশটা কৃষিপ্রধান দেশ, বিপ্লবের সময় কৃষকদেরকে সহযোগী শ্রেণী হিসাবে নিতে হবে। কিন্তু কৃষকদের নেতৃত্বে নয়, বিপ্লব হবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে। এও মনে রাখতে হবে, কৃষকদের জমি থাকে, থাকে সেই জমিকেন্দ্রিক মন। জমিকে চাষি সন্তানের মতো ভালোবাসে। বাস্তু ছাড়তে চায় না সে। তার নিরুপদ্রব জীবনের হাতছানি তাকে বাস্তুমুখী করে রাখে। তাই কৃষকদের মধ্যেও ভূমিহীন কৃষক শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামে অনেকখানি এগিয়ে আসে। বর্তমান যুগে যারা বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করবে তাদের এটা মনে রাখতে হবে। ভূমিহীন কৃষক ,ক্ষেতমজুররা বিপ্লবের সহযোগী শক্তি হিসাবে অনেক বেশি এগিয়ে আসবে।

শ্রমিক শ্রেণীর চিন্তার প্রভাব : ধর্মঘট বলে একটা বস্তু আছে— নিরুপদ্রব ধর্মঘট বলে কিছু নেই

শ্রমিক আন্দোলন সংক্রান্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতী যখন বলছে 'নিরুপদ্রব ধর্মঘট, শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট'— তখন সব্যসাচী তার প্রতিবাদ করে বলছেন, 'ধর্মঘট বলে একটা বস্তু আছে, কিন্তু নিরুপদ্রব ধর্মঘট বলে কোনও কিছু নেই। সংসারে কোন ধর্মঘট সফল হয় না, যতক্ষণ না তার পিছনে বাহুবল থাকে। শেষ পরীক্ষা তাকে দিতেই হয়।' তিনি ভারতীকে বলেছেন, 'ধনীর আর্থিক ক্ষতি এবং দরিদ্রের অনশন এক বস্তু নয়। তার উপায়হীন, কর্মহীন দিনগুলি দিনের পর দিন তাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী-পুত্র পরিবার ক্ষুধায় কাঁদতে থাকে— তাদের অবিশ্রাম ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে তোলে— ধনী সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করেই স্থির হয়ে থাকে। অর্থবল,

সৈন্যবল, অস্ত্রবল সবই তার হাতে— সেই ত রাজশক্তি। সেদিন সে আর অবহেলা করে না। তোমার ঐ সনাতন শান্তি ও পবিত্র শৃঙ্খলার জয়জয়কার হোক, সেদিন নিরস্ত্র, নিরন্ন দরিদ্রের রক্তে নদী বয়ে যায়।' উদ্বেগের সুরে ভারতী প্রশ্ন করছে, 'তারপর'? সব্যসাচী বলছেন, 'তারপর আবার একদিন সে দলবদ্ধ হয়ে পূর্ব অত্যাচারের প্রতিকারের আশায় ধর্মঘট করে বসে, তখন আবার সেই পুরানো কাহিনীর পুনরাভিনয় হয়।' ভারতী তখন বলছে, 'তাহলে এতে লাভ কি'? ভারতীর সেই প্রশ্নের উত্তরে সব্যসাচী বলছেন, 'বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হল, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপচে-উছলে ওঠে জগতে সে শক্তি সত্য নয়? এই তো আমার মূলধন। কোথাও কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাধানো যায় না, ভারতী, একটা কিছু অবলম্বন তার চাই-ই চাই। সেই তো আমার অবলম্বন। যে মূর্খ একথা মানে না, শুধু মজুরীর কম-বেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও সর্বনাশ করে, দেশেরও করে।' যারা শরৎচন্দ্রের মধ্যে উন্নত চিন্তার হদিশ পান না তাদের কাছে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই তুলতে হয়। আমরা জানি, শ্রমিক কল্যাণের জন্য, তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার জন্য আন্দোলনের দাবী বুর্জোয়া মানবতাবাদীরাই তুলেছিল একদিন। কিন্তু এই পথেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বা শ্রমিক আন্দোলন অর্থনীতিবাদের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সর্বহারা বিপ্লব শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদের এবং তার ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠা সুবিধাবাদের হাত থেকে মুক্ত করতে শেখায়। শরৎচন্দ্রের কাছে সর্বহারা বিপ্লবের স্পষ্টরূপ প্রতিভাত ছিল না এ কথা সত্য— কিন্তু মজুরীর কম-বেশী নিয়ে ধর্মঘট প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য শ্রমিক আন্দোলনে অর্থনীতিবাদের বিরোধিতা নিঃসন্দেহে শ্রমিক বিপ্লবের আদর্শবোধের একটা ভাসাভাসা অস্পষ্ট পদধ্বনি। একে কি অস্বীকার করা যায়?

দ্বিতীয়ত, এরই পাশাপাশি শ্রমিকের বুক জুড়ে যে বিষ বা ঘৃণাটা উছলে উঠেছে এবং সংগঠিতভাবে উছলে উঠেছে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট কথা না থাকলেও একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতও এখানে আছে। সর্বহারা বিপ্লবের বিচারে যাকে আমরা আজ বলি 'শ্রেণী ঘৃণা'— যা ব্যক্তি ঘৃণা নয়, শ্রেণী চেতনা যার ভিত্তি। এর ভিত্তিতে মজুররা লড়ে বিপ্লবের পথে। এই সংগঠিত শক্তিকে ভিত্তি করেই ধীরে ধীরে পরাজয়ের পর পরাজয়ের পথ পার করে ঘটে বিপ্লবের অগ্রগতি— এভাবেই তো দেখতে হয়! কমিউনিস্ট না হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে এই কথাগুলি শরৎচন্দ্র সাহিত্যে তুলে ধরেছেন তাঁর চেতনার আলোকে— যা শ্রমিক বিপ্লবের কাছাকাছি ভাবনা-ধারণা। শুধু তাই নয়, শ্রমিকদের মধ্যে যে দুর্দশা, তাদের আচার ব্যবহারকে দেখিয়ে মালিকশ্রেণী বলে ওরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, ওরা নোংরা। ভারতীর সঙ্গে অপূর্ব শ্রমিক বস্তিতে ঘুরতে গিয়ে তার সেই চিত্র দেখে যখন ফিরে আসতে চেয়েছে, তখন ভারতীর কথা দিয়ে শরৎচন্দ্র দেখাচ্ছেন, 'মানুষের প্রতি মানুষের— কত অত্যাচার চোখ মেলে দেখতে শিখুন। কেবল ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে, নিজে সাধু হয়ে থেকে ভেবেছেন পূণ্য সঞ্চয় করবেন? ওদের মধ্যে যে অপরাধ দেখছেন, তা কি শুধু ওদের দণ্ড দিয়েই শেষ হবে? ডাক্তারকে না দেখা পর্যন্ত আমিও একই রকম ভাবতাম।' এইখানেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় সব্যসাচীর সংস্পর্শে ভারতীর চেতনার উত্তরণ। তাই অপূর্বকে ভারতী আবার বলল, 'এরা কারা অপূর্ববাবু, এরা তো আমরাই।' শ্রমিকদের বস্তিতে গিয়ে ঘুরলে ঠিক অপূর্বর মতই মধ্যবিত্ত সমাজের অনেকের মধ্যে একই ভ্রান্ত ধারণা হয়। এর উত্তর উপন্যাসে রামদাস তলওয়ারকরের বক্তব্যেই আছে, 'তোমরা অসাধু, তোমরা উচ্ছৃঙ্খল, তোমরা ইন্দ্রিয়াসক্ত— তাদের মুখ থেকে এই সকল অপবাদই তোমরা চিরদিন শুনে এসেছ। তাই যখনই তোমরা তোমাদের দাবী জানিয়েছ, তখনই তোমাদের সকল দুঃখ কষ্টের মূলে তোমাদের অসংযত চরিত্রকেই দায়ী করে তারা তোমাদের সর্বপ্রকার উন্নতিকে নিবারিত করে এসেছে। ঐ উক্তি তাদের কখনই সম্পূর্ণ সত্য নয়। তোমাদের চরিত্রই শুধু তোমাদের অবস্থার জন্য দায়ী নয়, তোমাদের এই প্রবঞ্চিত হীন অবস্থাও তোমাদের চরিত্রের জন্য দায়ী'। এই প্রসঙ্গে মহান এঙ্গেলস-এর ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কিত রচনাটি স্মরণযোগ্য। বাস্তবে, যারা শ্রম দিয়ে সভ্যতার সমস্ত কিছু উৎপাদন করে, তাদের গোটা জীবনটাই হচ্ছে নোংরা

বস্তিতে থাকা। কঠোর পরিশ্রমের পর শ্রান্ত-ক্লান্ত শ্রমিকের বস্তির পাশে একদিকে মদের দোকান খুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে বস্তির পাশে রাখা হয় পতিতালয়। এগুলি কিসের জন্য? আসলে এগুলি হল, তাদেরকে ইন্দ্রিয়াসক্ত বা লুম্পেন বানানোর মালিকশ্রেণীর চক্রান্ত। লুম্পেন বানিয়ে দিতে পারলে, তাকে ইন্দ্রিয়াসক্ত এই অজুহাতে তার উপর অত্যাচার করতে পারে। শ্রমিক বিপ্লবের প্রবক্তা না হয়েও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র তা অনুভব করেছিলেন। তারই ছাপ আমরা পাই 'পথের দাবী'-তে।

এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র অসাধারণ শিল্পসংযমে নির্মম শ্রমিক শোষণের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন, যা সংবেদনশীল মনকে আন্দোলিত না করে পারে না। ধরুন, শ্রমিক বস্তির সেই পাঁচকড়ির ঘটনাটা। কুড়ি বছর ধরে সে কারখানায় কাজ করছে। পুলির শিকল পড়ে ডান হাত জখম হয়েছে। ফলে তার পরিবারের প্রায় খাওয়া জুটছে না। অপূর্ব প্রশ্ন করে, "কারখানার ম্যানেজার এর ব্যবস্থা করেন না?" পাঁচকড়ি বাম হাত কপালে ঠেকিয়ে জবাব দেয়, "দিনমজুরদের আবার ব্যবস্থা! এতেই বলচে কাজ করতে না পার তো ঘর ছেড়ে দাও...।" এই প্রতিক্রিয়ায় শুধু উপন্যাসের অপূর্ব রেগে জ্বলে ওঠে না, পাঠকেরও হৃদয়ের তন্ত্রীতে তা গভীর আঘাত করে।

শরৎ-সাহিত্যের অন্যান্য জায়গায়ও আমরা এই চিন্তাধারার স্বচ্ছতা দেখতে পাই। যেমন, 'জাগরণ'-এ বলছেন, 'যে সভ্যতায় দরিদ্রের মুখের গ্রাস, দুঃখীর জীবন ধনীর মুঠোর মধ্যে এমন ভয়ানক নিরুপায় করে এনে দেয়, তাকে কেউ রক্ষে করতে পারে না, সে কি-রকম সভ্যতা? ...এই সভ্যতায় আমার কাজ নেই। এই নির্দয় প্রহসন থেকে আমার মুক্তি চাই।' 'শ্রীকান্তে' অনেকখানি স্পষ্ট করেই বলছেন, '...সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কত বড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে, এই দুটা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল।... সভ্য মানুষে এ কথা বোধ হয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না। ...আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা— তোরা মর। কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমনধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।' শরৎচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি শ্রমিক বিপ্লবের অনেকখানি কাছাকাছি। এই প্রসঙ্গে আরও দু'একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আগেই উল্লেখ করেছি, 'পথের দাবী' উপন্যাস নিষিদ্ধ করার সময় ব্রিটিশ সরকার এর মধ্য দিয়ে 'বলশেভিজম'-এর প্রচার করা হচ্ছে বলে বলেছিল। এরই সাথে 'জাগরণ' উপন্যাসে আতঙ্কিত জমিদারের কথা স্মরণ করুন। সেখানে বলা হয়েছে, 'কতকগুলো স্বদেশী ছাপমারা পেট্রিয়টের পেশাই হয়ে দাঁড়িয়েছে জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেওয়া। বলশেভিক প্রোপাগান্ডা হচ্ছে এদের মূলে। ...গোড়াতেই একটু সাবধান না হলে সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।' আবার সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি প্রসঙ্গে এক আলোচনায় শরৎচন্দ্র বলেছেন, '...এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মতো যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে'। শ্রমিক শ্রেণীর চিন্তাধারার প্রভাব যে তাঁর মধ্যে অনেকখানি ছাপ ফেলেছিল— এই বক্তব্যগুলি তারই প্রতিফলন।

ধর্ম প্রসঙ্গে সব্যসাচী

আপনাদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করেছেন, সব্যসাচী যদি ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত চরিত্রই হন, তাহলে তাঁর কথার মধ্যে মাঝে মাঝে ভগবান, ঈশ্বর, ওপরওয়ালা, বিধাতা এই কথাগুলো কেন আসে? আমার মনে হয়, এই ধরনের উপলব্ধিতে কিছুটা যান্ত্রিকতা আছে। অনেক সময় প্রচলিত কথাবার্তায় বা সাধারণ আলাপচারিতায় একধরনের অভিব্যক্তি আসে, যা বক্তার গভীর চিন্তার বা দর্শনের কথা নয়। এটা সমাজের প্রচলিত আলাপচারিতার একটা ফর্মের ছাপ। বাস্তব সমাজজীবনেও দেখবেন যারা বিপ্লবী, এমন কি যারা পরিপূর্ণভাবে নিরীশ্বরবাদী, তাদেরও কথায় বার্তায়, সাধারণ আলাপচারিতায় মাঝে মাঝে এই ধরনের অভিব্যক্তি কখনও কখনও চলে আসে। যেমন কেউ

বললেন, হা ভগবান! তার মানে সে ভগবানে বিশ্বাস করে এরকম নয়। শোনা যায়, মহান মার্কস একসময় বলেছিলেন যে, ওঃ গড! চুরুট খেতে আমার যত পয়সা গেল, বই লিখে আমি তত পয়সা পেলাম না। যিনি ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে, ভাববাদের বিরুদ্ধে একটা সর্বাত্মক সংগ্রাম করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনকে দাঁড় করালেন, তাঁর এই কথা! এর অর্থ কি তিনি গড বা ভগবানে বিশ্বাস করতেন? 'পথের দাবী'-তে দেখুন, ধর্ম সংস্কার নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠেছে, খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী ভারতীকে সব্যসাচী বলছেন যে, 'শুধু অপূর্বের বর্ণাশ্রম নয়, তোমার খ্রীষ্টান ধর্মও আজ তেমনি অসত্য হয়ে গেছে ভারতী, এর প্রাচীন মোহ তোমাকে ত্যাগ করতে হবে'। উপন্যাসের শেষের দিকে যখন ধর্ম প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, তখন তিনি বলিষ্ঠভাবে বলেছেন, 'সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম যুগের কুসংস্কার, বিশ্বমানবতার এতবড় শত্রু আর নাই'। এরই সাথে উল্লেখযোগ্য হল, ধর্ম সম্পর্কে চন্দননগরে আলাপচারিতায় শরৎচন্দ্রের বক্তব্য। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'মতিবাবু মনে করেছেন আমাদের ধর্মটাকে সংস্কার করে মেরামত করে সেইটাকেই আবার দাঁড় করাবেন। আমি বলি— মেরামত নয়— ঐটিকেই বাদ দাও। আবার তাকে মেরামত করে খাড়া করবার দরকার কি? ছ-সাতশ বছরের পুরানো জিনিসটা আবার যদি দাঁড় করাও আবার সেটা হাজার বছর ধরে চলবে।' স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবের দিনগুলিতে এই ধরনের কথা অনেকেই ভাবতে বা বলতে পারেন নি। পার্থিব মানবতাবাদের বলিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন বলেই শরৎচন্দ্র এই সব কথা বলতে পেরেছিলেন।

আমাদের এও মনে রাখতে হবে, এ দেশের বিপ্লবীদের মধ্যেও সকলে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হতে পারেন নি। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লবের কর্মসূচী যথাযথ গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হয়নি। সেই কারণে বিপ্লবী ধারার গৌরবের সাথে সনাতন ঐতিহ্যবাদও বহুলাংশে থেকে গিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যক্তিগতভাবে কিছু মুসলমান ব্যক্তিত্ব আত্মনিয়োগ করলেও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়কে যুক্ত করা যায় নি। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও তথাকথিত নিম্নবর্ণ, দলিত সম্প্রদায়কেও স্বাধীনতা আন্দোলনের স্রোতধারায় ব্যাপকভাবে আনা সম্ভব হয়নি। কারণ আপসকামী নেতৃত্ব মূলত উচ্চবর্ণের মানুষের হাতেই ছিল। এই কারণেই আজও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, জাতপাতের সমস্যা, তথাকথিত উচ্চবর্ণ-দলিত সমস্যা স্বাধীনভারতে থেকে গিয়েছে। যা নিয়ে আজ গোটা ভারতবর্ষ রক্তাক্ত, সংস্কৃতি ক্লেদাক্ত, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষও মন্দির-না-মসজিদ নিয়ে উন্মাদনায় লিপ্ত। প্রাণহানি ঘটছে। অথচ, সেই সময় দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র সব্যসাচী চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই ধর্ম নিস্পৃহ বলিষ্ঠ চিন্তাকে তুলে ধরেছিলেন। এবং তার দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে যে ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব ছিল তাকেও মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এখানেই শরৎচন্দ্রের উৎকর্ষ। আবার এক জায়গায় ভারতীকে বলছেন, 'নিজে খ্রীষ্টান হয়ে তুমি ধর্মের গোড়ার কথাটা ভুলে গেলে? যীশুখৃষ্টের রক্তপাত কি সংসারে ব্যর্থই হয়েছে ভাবো?' অর্থাৎ ধর্মীয় মহাপুরুষদের জীবন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে বলেছেন। এই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত।

দেশপ্রেম সম্পর্কে অনন্যসাধারণ ধারণা

দেশপ্রেম সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যে চিন্তাকে সেদিন উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন— এক কথায় তা অনবদ্য, অনন্যসাধারণ। তিনি বলেছিলেন, 'দেশসেবা কথার কথা নয়। দেশসেবা মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনা। স্বার্থ-গন্ধ থাকবে না, প্রাণের ভয় পর্যন্ত থাকবে না, একদিকে দেশসেবক নিজে, আর দিকে তার দেশ, মাঝে আর কিছু থাকবে না। যশ, অর্থ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, ভাল, মন্দ সব যে দেশের জন্য বলি দিতে পারবে, দেশসেবা তার দ্বারাই হবে।' 'পথের দাবী'র সব্যসাচী সেই চরিত্রের। একদিকে দেশ আর এক্দিকে সব্যসাচী। বলছেন, 'এর শেষ হবে কবে? হয় ভারতের স্বাধীনতা, নাহলে আমার মৃত্যু'। দেশকে ভালবাসার জন্য তিনি সর্বস্ব দিয়েছেন। এখানে 'পথের দাবী' সিম্বলিক হয়ে গেছে, দেশের স্বাধীনতার মূর্ত রূপ, সেই মূর্ত রূপ হিসাবে 'পথের দাবী'র ভালমন্দই তাঁর ভালমন্দ। বলছেন, 'পথের দাবী'র ভালোমন্দ দিয়েই

আমার সত্য মিথ্যা নির্ধারিত হয়। এই আমার নীতি শাস্ত্র, এই আমার অকপট মূর্তি'। ভারতী শুনে বিস্মিত। সুমিত্রা ভারতীকে বললেন, 'হাঁ, এই ডাক্তারের পাষাণমূর্তি, এই রূপ আমি চিনি'। তারপর সব্যসাচী বলছেন, 'তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য;—এই অর্থহীন নিস্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহা মূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্ত্র আর নেই। তোমরা ভাবো মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্য শাশ্বত, সনাতন, অপৌরুষেয়? মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলে। শাশ্বত, সনাতন নয়, —এর জন্ম আছে, মৃত্যু আছে।' এর দ্বারা শরৎচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছেন, কোনো জিনিসই চিরন্তন নয়। এক সময়ের নতুন জিনিস আর এক সময় পুরাতন হয়ে পড়ে এবং চলে যায়। একটা সত্য আসে, সে সত্য তার ভূমিকা পালন করে। তারপরে সে চলে যায়। নূতন সত্য আসে। নূতন সত্যের সৃষ্টি হয়। তাই চরম সত্য, পরম সত্য বলে কিছু নেই। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতা— আর সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই 'পথের দাবী'। সব্যসাচী ভারতীকে বলছেন, 'পথের দাবী' আমার তর্কশাস্ত্রের টোল নয়— এ আমার পথ চলবার অধিকারের জোর। কে কবে কোন অজানা প্রয়োজনে নীতিবাক্য রচনা করে গেল 'পথের দাবী'র সেই হবে সত্য, আর এর তরে যার গলা ফাঁসির দড়িতে বাঁধা, তার হৃদয়ের বাক্য হবে মিথ্যা?' ফলে 'পথের দাবী'র ভালমন্দই সব্যসাচীর একমাত্র ভালমন্দ। 'পথের দাবী'র প্রয়োজনেই তাঁর সত্যসৃষ্টি। আবার এই প্রয়োজনবোধ ব্রজেন্দ্রের প্রয়োজনবোধের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একটা প্রয়োজনের সঙ্গে সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের প্রশ্ন জড়িত— আর একটা প্রয়োজন ব্যক্তিস্বার্থবোধ প্রসূত। বিনা প্রয়োজনে যে একটি পিপীলিকাকেও হত্যা করতে পারে না, স্বাধীনতার প্রয়োজনে সেই সব্যসাচী রক্তের হোলি খেলতে পারেন— এই প্রয়োজন নৈর্ব্যক্তিক। আর ব্রজেন্দ্র আক্রোশে, এমনকি ব্যক্তি আক্রোশে খুন করতে পারে। এই দুই প্রয়োজনবোধ-এর মধ্যেকার পার্থক্যকেও শরৎচন্দ্র এখানে দেখিয়েছেন। এর মধ্যেই নিহিত সত্যের আপেক্ষিক রূপ— যাকে বলতে পারি একটা বিশেষ যুগের বিশেষ যুগ-সত্য।

আমরা জানি, এদেশের ইতিহাসে সামন্তীযুগে নানা শক্তি দেশ দখল করেছে। কিন্তু আধুনিককালে ধনতন্ত্রের যুগে সাম্রাজ্যবাদ শুধু দেশটাইতো দখল করেনি। তার আক্রমণ আরও অনেক গভীরে। সাম্রাজ্যবাদের এই আক্রমণের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকেও শরৎচন্দ্র তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে অনেকখানি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র ক্ষোভ সম্পর্কে ভারতীর সপ্রশ্ন দৃষ্টিকে বুঝতে পেরে সব্যসাচী বলেছিলেন, 'আমার দেশ গেছে বলেই আমি এদের শত্রু নই।' দেখিয়েছেন দেশ অনেকের দ্বারাই দখল হয়েছে। তারপর বলেছেন, 'মনুষ্যত্বের এতবড় (এদের মতো) পরম শত্রু আর নেই। স্বার্থের দায়ে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের মজ্জাগত সংস্কার। এই এদের ব্যবসা। এই এদের মূলধন। যদি পারো, দেশের নর-নারীকে শুধু এই সত্যটাই শিখিয়ে দিও।'

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দিনগুলিতে যুগ-সত্য হিসাবে স্বাধীনতা এবং 'পথের দাবী'র প্রয়োজনের সাথে সব্যসাচীর প্রয়োজনবোধ কতখানি সম্পৃক্ত এবং নৈর্ব্যক্তিক, তা উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাতে স্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত। একদিন ভারতীকে সব্যসাচী নিয়ে যাচ্ছেন নৌকা করে তাঁর নতুন আস্তানায়। ছদ্মবেশে অপূর্বর সাথে দেখা করার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। অপূর্ব তাঁকে চিনতে পারেনি। জাহাজঘাটে অপূর্বকে দূর থেকে দেখবে বলে বসেছিল ভারতী। তারপর ভারতীকে নিয়ে তুললেন নতুন আস্তানায়। নোংরা, আবর্জনা ভরা, বার্মিজ মুসলিম মহিলা সন্তান-সহ আছে সেখানে। তাদের অবিন্যস্ত ঘরের নোংরার মধ্য থেকে একটা সানকিতে করে ভাত এনে দিচ্ছে, দূরে বসে সব্যসাচী যখন প্রশান্ত মনে সেই খাবার খাচ্ছেন, তখন ভারতীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। উপন্যাসে আছে, 'ভারতী চাহিয়াও দেখিতে পারিল না, ঘৃণায় ও অপরিসীম ব্যথায় মুখ ফিরাইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর হইতে কান্না যেন সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িতে চাইল। হায়রে দেশ! হায় রে মুক্তির পিপাশা! জগতে কিছুই ইহারা আর আপন বলিয়া অবশিষ্ট রাখে নাই। এই গৃহ, এই খাদ্য, এই ঘৃণিত সংস্রব এমনি করিয়া বন্য পশুর

জীবনযাপন ক্ষণকালের জন্য মৃত্যুও ভারতীর কাছে অনেক সুসহ বলিয়া মনে হইল। সে হয়ত অনেকেই পারে, কিন্তু এই যে দেহ মনের অবিশ্রাম নির্যাতন, আপনাকে আপনি স্বেচ্ছায় পলে পলে এই যে হত্যা করিয়া চলার দুঃসহ সহিষ্ণুতা স্বর্গে-মর্তে কোথাও কি এর তুলনা আছে? অধীনতার বেদনা কী ইহাদের জীবনের আর সমস্ত বেদনাবোধকেই একেবারে ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে! কিছুই কোথাও বাকি নাই।' পড়তে গিয়ে পাঠকের চোখের কোনে জল আসে। কী অনুপম শৈলীতে এই বেদনাবোধের রস সৃষ্টি করে শরৎচন্দ্র পাঠকের চেতনার তন্ত্রীতে আঘাত করেছেন! বর্তমান যুগে চাই আরও উন্নত মূল্যবোধ। তার কারণ, শরৎচন্দ্রের যুগ পার করে আজ নতুন যুগে নতুন বিপ্লবের স্তরে আমরা উপনীত।

কমরেড শিবদাস ঘোষ সেই মূল্যবোধের সুস্পষ্ট রূপকে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রকে পরিব্যাপ্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সম্পত্তিবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মানসিকতা অর্জনের দ্বারাই একমাত্র বর্তমান যুগে যথার্থ সাম্যবাদী বা বিপ্লবী হিসাবে গড়ে ওঠা সম্ভব হবে। এমন কি একজন বিপ্লবীর কাছে তার জীবনের প্রেম, ভালবাসা, অনুভূতি, রাগ, মান-অভিমান সবকিছুই পরিচালিত হবে বিপ্লবের উদ্দেশ্যে, বিপ্লবের জন্য। বিপ্লবের সাথে বিপ্লবীর জীবনকে সম্পূর্ণ একাত্ম করে গড়ে তুলতে হবে।

বিচারধারার যান্ত্রিকতার সীমার অতিক্রমণ

অধীনতার বেদনা সব্যসাচীর ব্যক্তিগত সকল বেদনাকে একদম পরিষ্কার করে দিলেও হৃদয়ের কোণে পাঠক দেখতে পায় সঞ্চিত হৃদয়বৃত্তির রসসুধা। আপনাদের অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আছে যে, সব্যসাচী এতবড় বিপ্লবী হয়েও যে অপূর্ব বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাকে বাঁচালেন কেন? অপূর্বকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সকলে একমত হয়েছে। সকলে বলছে শাস্তি হল 'ডেথ সেন্টেন্স' অর্থাৎ প্রাণদণ্ড। তখন এই নিয়মই ছিল, দলের মধ্যে এরকম কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে তার শাস্তি ছিল মৃত্যু। বিচারের রায় শোনার পর অপূর্ব বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সব্যসাচী সকলের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে মুক্তি দিলেন। ফলে, সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেল। পরের মিটিংয়ে ব্রজেন্দ্র বলছে, 'আমি অ্যানার্কিস্ট, আমি রেভলিউশনারি, আমি প্রাণ দিতেও পারি, নিতেও পারি'। সুমিত্রা বলছেন, 'একজন ট্রেটারের বদলে যদি একজন বিপ্লবীর প্রাণ তোমার দরকার হয় তাহলে আমিও তা দিতে পারি'। সব্যসাচী শান্ত স্বরে বলছেন, 'অপূর্ব যা করে ফেলেছে তা জেনেশুনে করেনি, তার ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। অপূর্ব বিশ্বাসঘাতক নয়। দেশকে সে সত্যিই ভালবাসে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালির মতো— থাক স্বদেশীর নিন্দা করব না, বড় দুর্বল। বরং ভারতী তাকে সবল করে তুলুক'। অপূর্ব সম্পর্কে আর এক জায়গায় ভারতীকে বলছেন, 'বাস্তবিক বলছি তোমাকে, এত ছোট, এত হীন সে কখনো নয়। ...লেখাপড়া শিখেছে, ভদ্রলোকের ছেলে— পরাধীনতার লজ্জা সে অনুভব করে। আরো দশজন বাঙালীর ছেলের মত সত্যসত্যই সে স্বদেশের কল্যাণ প্রার্থনা করে'। এখানে সব্যসাচীর বিচারধারা যান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে অনেকখানি মুক্ত। দ্বান্দ্বিক বিচারধারায় যেমন একজন সত্যিকারের বিশ্বাসঘাতক বা শত্রুপক্ষের লোক আর একজন বিভ্রান্ত হয়ে অসচেতনতার দ্বারা কিছু করে বসে— তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করা হয়। সব্যসাচীর বিচারের ধারার মধ্যে তারই একটা প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। তারপর সব্যসাচী বলছেন, 'আমি কি বাঁচাতে গেলাম ভারতীকে, অপূর্বকে? না, তা নয়। যে বস্তু তোমাদের মত দুটি সামান্য নরনারীকে উপলক্ষ্য করে গড়ে উঠেছে, তার কি কোনো দাম নেই নাকি যে, ব্রজেন্দ্রর মতো বর্বরগুলোকে দেব তাই নষ্ট করে ফেলতে? শুধু এই ভারতী, শুধু এই। নইলে মানুষের প্রাণের মূল্য আছে নাকি আমাদের কাছে। এক কানাকড়িও না'। সেই সময়ের গুটি কয়েক মানুষের মধ্যে এর প্রভাব উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'কালি কলম'— পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসু বিস্মিত হয়ে ভেবেছেন, সব্যসাচী বৈপ্লবিক সত্তাকে সরিয়ে রেখে জীবনকে চিনবার, মানুষকে বুঝবার গভীর সহজ দৃষ্টি কী করে পেলেন? সমাজজীবনে 'ভালবাসা ও মানবতার নিষ্করুণ কদর্য অবমাননার' মধ্যেও ভারতী-অপূর্ব-র মিলিত জীবনের আনন্দময় সার্থকতার কথা স্মরণ করে সব্যসাচী

তার পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। সব্যসাচীর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি। পুরো বিষয়টি বিচার করলে দেখা যাবে, এখানে ক্ষণিক দ্যুতির মতো শরৎচন্দ্র যান্ত্রিক বস্তুবাদের সীমানা অতিক্রম করেছেন। এই উৎকর্ষকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

সুমিত্রা-ভারতী-সব্যসাচী : বয়লারের সাথে তুলনা- – চিন্তার একটি দিক

একথা কারুরই অবিদিত নয় যে, অপূর্বকে বাঁচানোর দ্বারা সব্যসাচীরই জীবন সবচেয়ে বিপন্ন হয়েছিল। তবু তিনি যান্ত্রিকভাবে শৃঙখলা রক্ষা করার পরিবর্তে ঔদার্যের দ্বারা শৃঙখলাবোধের যান্ত্রিকতাকে ভেঙে তার নতুন বিন্যাসের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। এই মনের জন্যই শশী কবির শিল্পীমনকে তিনি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন। বলেছেন, 'তুমি কবি, তুমি দেশের বড় শিল্পী— রাজনীতির চেয়ে তুমি বড়, একথা ভুলো না'। ভারতীকে বলেছেন, 'ও কবি, ও গুণী, ওদের জাত আলাদা। ওর গুণের ফল সবাই মিলে ভোগ করে, শুধু দোষের শাস্তিটুকু সহ্য করেও নিজে। তাই মাঝে মাঝে ও বেচারা যখন ভারী দুঃখ পায়, তখন আর একটি লোক যে মনে মনে তার অংশ নেয়, সে আমি।' ভারতী তার উত্তরে বলল, 'তুমি সকলের জন্য দুঃখবোধ কর দাদা, তোমার মন মেয়েদের চেয়েও কোমল।' আবার এই ভারতীই অন্যত্র বলছে, 'সব্যসাচীর ভেতরটা পাষাণ দিয়ে গড়া। সেই পাষাণস্তূপের মধ্যে আছে শুধু একটি বস্তু— জননী জন্মভূমি! তার আদি নেই, অন্ত নেই, ক্ষয় নেই, ব্যয় নেই'। অন্য এক প্রসঙ্গে ভারতী শশীকবির বাসায় সব্যসাচীর উদ্দেশ্যে বলছে, 'সুমিত্রা দিদির বুদ্ধির তুলনাই হয় না। অথচ কিছুই ত তার কাজে লাগল না। তোমারই পাষাণদ্বারে কেবল আছাড় খেয়ে খানখান হয়ে পড়ে গেল— প্রবেশ করবার এতটুকু পথ পেলে না।' সুমিত্রার সঙ্গে ভারতী একদিন যখন বর্মা ওয়েল কোম্পানির কারখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কালো পাহাড়ের মত একটা জড়পিণ্ড— বয়লারের পরীক্ষা হচ্ছিল। তার মধ্যে চলে অগ্নির প্লাবন। আর দরজা বন্ধ করে দিলে সেই আগুনের কোন প্রকাশ বাইরে থাকে না। সুমিত্রা বললেন, 'এই ভয়ানক যন্ত্রটাকে মনে রেখো ভারতী, তোমাদের ডাক্তারবাবুকে চিনতে পারবে। এই তাঁর সত্যিকারের প্রতিমূর্তি।' সঙ্গে ছিল একটি অর্থবহী দীর্ঘশ্বাস। শেষ পর্বে এসে যখন অনেক টাকার অধিকারী হলেন সুমিত্রা এবং সব্যসাচী বললেন যে, 'এখন তো তুমি অনেক টাকার মালিক হলে'— তখন সুমিত্রার অভিব্যক্তির মধ্যে নিহিত ছিল 'সব টাকা তো তোমার— কিন্তু তুমি নেবে কি'? সুমিত্রার সংশয়ই ছিল সত্য। সুমিত্রা 'পথের দাবী'র সংশ্রব ত্যাগ করে সুরবায়া চলে যাচ্ছেন। ডাক্তারকে বলছেন, 'কেবল একটিবার ডাক্তার, শুধু এই বারটির মত আমার উপর নির্ভর করে দেখ, আমি সুরবায়া নিয়ে যেতে পারি কি না। তারপর টাকায় কি না হয়।' ডাক্তারের উত্তর— 'টাকায় অনেক কাজ হয় সুমিত্রা, তার অপচয় করতে নেই'। 'পথের দাবী'র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছিন্ন হওয়া সুমিত্রার টাকা তিনি নিতে পারেন নি— কিন্তু শশী কবির সাড়ে চার হাজার টাকা পুঁটলি বেঁধে পরম আনন্দে নিয়ে গিয়েছিলেন। মূল্যবোধের ছাপ এখানে স্পষ্ট।

উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে যখন সব্যসাচী এসেছেন, ভারতী উদ্বেল আনন্দে তাঁকে গ্রহণ করছেন, তখন সুমিত্রা অনুভব করলেন, 'ঘৃণা ও নিগূঢ় ঈর্ষায় রচিত যে দুর্ভেদ্য যবনিকা এতদিন তাহার চোখের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল— অকস্মাৎ অপসারিত হইয়া যতদূর দেখা যায় শুধু অনাবিল সৌহৃদ্যের স্বচ্ছ স্রোতস্বতীই' ভারতী আর সব্যসাচীর মাঝখানে প্রবাহিত। আর সব্যসাচী যখন ঘনবর্ষার সেই নিশুতি রাতে হীরা সিং-কে সাথী করে চলে গেলেন তখন ভারতী যেমন পাষাণমূর্তির মত স্তব্ধ এবং তেমনি জানতেও পারল না 'তাহারই মত একজন নারীর অর্থাৎ সুমিত্রার দুই চক্ষু প্লাবিয়া অশ্রুপ্রবাহই বহিতেছিল'। এইভাবেই শরৎচন্দ্র এঁকেছেন সুমিত্রার মনন জগতের ছবি।

অন্যদিকে সব্যসাচী সুমিত্রা সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ব্যক্ত করেছেন। একুশ বছরের কলঙ্কজনক ইতিহাসকে একদিনে ফেলে এসে সব্যসাচীকে বলেছিলেন, 'তোমার কাজে নাও, আমার মত বিশ্বস্ত লোক তুমি পাবে না।' সুমিত্রার একথা তিনি ভারতীকে বলেছেন শ্রদ্ধাবোধ থেকেই। আবার অপূর্বকে সব্যসাচী বলেছেন, 'আপনি

নিঃসঙ্কোচে সুমিত্রাকে সাহায্য করবেন। এমন মানুষ আপনি পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও কখনো পাবেন না।' বলেছেন, 'সুমিত্রাকে আপনি বিশ্বাস করবেন। বিশ্বাসের এতবড় উঁচু জায়গা আর কোথাও পাবেন না অপূর্ববাবু।' ভারতীর কাছে একদিন বলেছিলেন, 'সুমিত্রার কথা তুমি যখন বলেছিলে দিদি, আমি জবাব দিতে পারিনি। আমি এ পথের পথিক নই। তবু তোমার মুখে সুমিত্রার কাহিনীতে গায়ে আমার বার বার কাঁটা দিয়ে উঠেছিল'। আবার এই সব্যসাচীই বলেছেন, 'দুনিয়া ঘুরে অনেক বস্তুরই হদিস পেয়েছি। পেলাম না শুধু এই নরনারীর প্রেমের তত্ত্ব'। মনের অনুভূতির মূল্য দিয়ে এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সময় বা ভাববার প্রশ্নটিকে সব্যসাচী তাঁর মনে স্থান দেননি। এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে অপূর্বের সাথে তাঁর একদিনের কথায়। তিনি অপূর্বকে বলেছেন, 'এইসব প্রণয়ঘটিত মান-অভিমানের ব্যাপারে আমি কিছুই বুঝিনে। বোঝবার চেষ্টা করতে গেলেও ভারী সময় চাই যে। কোথায় পাই এত সময়'? ভারতী রসিকতার সঙ্গে একদিন বলছে, 'স্বর্গের ইন্দ্রদেব যদি উর্বশী মেনকা রম্ভাকে ডেকে বলতেন, সেকালের মুনি ঋষিদের বদলে একালের সব্যসাচীর তপস্যা ভঙ্গ করতে হবে, ত আমি নিশ্চয়ই বলছি দাদা, মুখে কালি মেখে তাদের ফিরে যেতে হত। রক্ত মাংসের হৃদয় জয় করা যায়, কিন্তু পাথরের সঙ্গে কি লড়াই চলে? পরাধীনতার আগুনে পুড়ে সমস্ত বুক তোমার একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে।' উপরিউক্ত ঘটনাগুলির পরম্পরাকে বিশ্লেষণ করলে এই প্রশ্নে সুমিত্রার দীর্ঘশ্বাস সহ বয়লারের সঙ্গে সব্যসাচীর তুলনাটিই জীবন্ত বাস্তব। এই দিয়েই সব্যসাচীর প্রাসঙ্গিক মনকে শরৎচন্দ্র চিত্রায়িত করেছেন। ফলে একথা সত্য যে, সামগ্রিকভাবে উদারতার কিছু বিষয় বিদ্যুৎ চমকের মত যান্ত্রিক বস্তুবাদের সীমাকে অতিক্রম করার দিককে যেমন উন্মোচিত করেছে, তেমনই সব্যসাচীর চরিত্রচিত্রণে এই ক্ষেত্রে একটা যান্ত্রিকতাও প্রকাশ পেয়েছে।

মানব মনের ও মূল্যবোধের বিচিত্র দিককে তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে

বিপ্লবী আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে একথা সব্যসাচী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভারতী সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মকাণ্ডের ভার সইতে পারবে না। তাই তাকে সেবামূলক কাজেই নিজেকে নিয়োজিত করতে বলেছেন। বলেছেন, 'আমার গুপ্তসমিতির ভার আমার পরেই থাক বোন, তুমি কিন্তু এই বিপ্লবের বিপুল খেয়াতরী বইতে পারবে না'। অপূর্বকে জীবনে গ্রহণ করে তাকেও সাথে নিয়ে এই কাজের উপযোগী করে তুলতে পরামর্শ দিয়েছেন। তবে তাঁর অশেষ স্নেহভাজন ভারতীর মধ্যে নারী মনের একটা গূঢ় সংস্কারকে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় তুলে ধরে তাকে আঘাতও করেছেন সব্যসাচী। একটা ঘটনা আছে। সব্যসাচীকে একবার রাত্রিযাপন করতে হবে, কিন্তু ভারতীর একটি ঘর। ভারতী তার বিছানায় যত্নের সঙ্গে সব্যসাচীর শয্যা প্রস্তুত করে দিয়েছে। সব্যসাচী জিজ্ঞাসা করছেন, 'তুমি শোবে কোথায়?' ভারতী বলল, 'ওই মেঝেতে'। সব্যসাচী বললেন, 'তোমরা সকলে মিলে আমাকে এমন করে অগ্রাহ্য করলে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে'। ভারতী বলছে, 'আমরা সকলে মিলে আপনাকে পাথরের দেবতা বানিয়ে দিয়েছি। আপনার কাছ থেকে কারও লেশমাত্র অকল্যাণ ঘটতে পারে, এ আমরা ভাবতেই পারি না।' সম্পর্কের এক অপূর্ব মাধুর্য রস আস্বাদন করতে পারি আমরা এই সম্পর্কের সৌন্দর্যে। আবার, এই ভারতীই অপূর্ব যখন দেশের বাড়িতে চলে গেল এবং শশীকবির বাসা থেকে ফেরার পথে ভারতীকে যখন সব্যসাচী তাঁর জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে, বলছেন, 'তুমি থাক কথা আছে', ভারতী কিছুতেই তাতে রাজি হচ্ছেনা। বলছে, 'সে কী করে হবে'? তখন সব্যসাচী বললেন, 'সেদিন রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে আমাকে বিছানা ছেড়ে দিয়ে তুমি নীচে শুলে। হেসে বললে, দাদা, তুমি কি আবার মানুষ যে তোমাকে আমার লজ্জা বা ভয়? তুমি ঘুমোও। কিন্তু আজ আর সেই সাহস নেই। বিশেষ নির্ভর করবার লোক অপূর্ব নয়, তবুও সে কাছেই ছিল বলে কালও হয়ত এ আশঙ্কা তোমার মনেও হত না। আশ্চর্য এই যে, তোমার মত মেয়েরও নির্ভয় স্বাধীনতাকে তার মত একটা অক্ষম লোকেও না কত সহজেই ভেঙ্গে দিয়ে যেতে পারে। ...কিন্তু আমি ভাবছি বোন, চরিত্রকে তোমার সন্দেহ করতে আজ কেউ কাছে নেই বলে

তোমার নিজের মনটাই যদি অহরহ তোমাকে সন্দেহ করে বেড়ায়, তুমি বাঁচবে কি করে'? ভারতী জিজ্ঞেস করছে, 'আমাকে তাহলে কি করতে বলো? তুমিই ত আমাকে বারংবার বলেছ সংসারের মধ্যে ফিরে যেতে'। সব্যসাচী উত্তর করছেন, 'কিন্তু মাথা হেঁট করে যেতে তো বলিনি'। ভারতী বলছে, 'কিন্তু মেয়েমানুষের উঁচু মাথা ত সবাই পছন্দ করে না দাদা'। 'তবে যেয়ো না'— সব্যসাচীর সুস্পষ্ট উত্তর। নারীর মর্যাদাসম্পন্ন জীবনযাপনের এই কথাটি সব্যসাচী ভারতীর কাছেই তো শুধু তুলে ধরেন নি— আমাদের সকলের কাছেই উপস্থিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আপনাদের সামনে উত্থাপন করছি। একদিন পানিত্রাসের বাড়িতে বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় একবার শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি সব্যসাচীর মত কোনও এক মহিলা চরিত্র তৈরী করলেন না কেন? শরৎচন্দ্র রূপনারায়ণের দিকে তাকিয়ে ছিলেন অনেকক্ষণ, তারপরে বলেছিলেন, 'তোমরা ত আমার সব্যসাচীকে মহামানব করে তুলেছ। সেই মহামানব যে দুটি নারীর মন পেয়েছিল— ভারতী আর সুমিত্রা'। বলেছিলেন, 'দেশকে যদি বাঁচাতেই চাও নেমে এসো মাটির পৃথিবীতে। এই ভারতবর্ষ জুড়ে সুমিত্রা-ভারতীর মত মেয়ের দল গড়ে তোল দেখি! দেখবে অমন নারীকে যারা কর্মের সঙ্গিনী করেছে, তারা কখনও পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে অসহায়ের মত দুঃখভোগ করতে দেখে স্বস্তিবোধ করছে না। ...পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতার জয়ধ্বজা যাঁরা উড়িয়ে গেছেন, তাঁরা কেউ দেবতা ছিলেন না— তাঁরা সব্যসাচী ও সুমিত্রারই মতো আত্মস্থ নর ও নারী।' ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে লিখেছেন, 'তাঁর (শরৎচন্দ্রের) দৃষ্টি সমীপে লাঞ্ছিত দেশের ছবি সেই দুপুরে যেন সমগ্র নারী সমাজের আবেদন নিয়েই ছিল দাঁড়িয়ে'।

উপন্যাসে রামদাস তলওয়ারকরের সঙ্গে অপূর্বের একদিনের আলোচনাকে স্মরণ করলে সেই সময়ের সংগ্রামী মানসিকতার একটা পরিচয় পাওয়া যাবে। রামদাস তলওয়ারকরকে অপূর্ব যখন সংগ্রামে এগিয়ে যেতে বাধা দিল এই বলে যে, 'তোমার স্ত্রী-পুত্র, সংসার আছে, তুমি যেও না'। তখন রামদাস তলওয়ারকর বললেন যে, 'অপূর্ববাবু হিন্দুদের কাছে বিবাহটা ধর্ম, কিন্তু দেশসেবা তার চেয়ে বড় ধর্ম। এক ধর্ম আর এক ধর্মকে বাধা দেবে জানলে আমি বিবাহ করতাম না'। সেই রামদাস তলওয়ারকর ব্রজেন্দ্রর বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ল, হাসপাতালে ভর্তি, সারলে জেল, নাহলে মৃত্যু। স্ত্রী-সন্তানের চলবে কী করে? সব্যসাচী বলছেন, 'কোন পরিবারের পুরুষ মারা গেলে যেভাবে বিধবা মেয়েদের চলে তেমন করেই চলবে'। তারপরেই সব্যসাচী রামদাস তলওয়ারকরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় বলছেন, 'বিদেশী রাজার জেলের মধ্যে যদি আজ তলওয়ারকরকে মরতেই হয়, পরলোকে দাঁড়িয়ে স্ত্রী-কন্যাকে পথে পথে ভিক্ষা করতে দেখে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়বে, কিন্তু নিশ্চয়ই জেনো, দেশের লোকের বিরুদ্ধে সে ভগবানের কাছেও কখনও একটা নালিশ জানাবে না। আমি তাকে চিনি, লজ্জায় তার মুখ ফুটবে না'। বিপ্লবীদের সেদিনকার মানসিকতা। আবার বিপ্লবীদের চরিত্রের দৃঢ়তাকে কীভাবে ও কোন চেতনায় তৈরী করতে হবে সে প্রসঙ্গ যখন উত্থাপিত হয়েছে, তখন সব্যসাচী বলছেন, বিপ্লবীরা তাদের মহান কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তার বিনিময়ে পেতে পারে দুর্নাম, পেতে পারে বিশ্বাসঘাতকতা। তবু আদর্শের জন্য তারা বিপ্লবী জীবনের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পাবে। সব্যসাচী বলছেন, 'আমার গলায় ফাঁসির দড়িটি যেদিন পরিয়ে দেবে দেখবে এদেশের লোকই পরিয়ে দিয়েছে। ...কসাইখানা থেকে গরুর মাংস গরুতেই বয়ে নিয়ে আসে।' বলছেন, 'পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিসম্পাতই তো হোলো কৃতঘ্নতা! যাদের সেবা করবে তারাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে, প্রাণ যাদের বাঁচাবে, তারাই তোমাকে বিক্রি করে দিতে চাইবে। মূঢ়তা আর অকৃতজ্ঞতা প্রতি পদক্ষেপে তোমায় ছুঁচের মতো বিঁধবে। শ্রদ্ধা নেই, স্নেহ নেই, সহানুভূতি নেই, কেউ কাছে ডাকবে না, কেউ সাহায্য করতে আসবে না, বিষধর সাপের মত তোমাকে দেখে লোকে দূরে সরে যাবে। দেশকে ভালোবাসার এই আমাদের পুরস্কার।' তবু বিপ্লবীরা কারুর কাছে অভিযোগ করেনা, এই যে চরিত্রের মহত্ত্ব এবং উৎকর্ষ, আজকের যুগের প্রেক্ষিতেও তার একান্ত সাধনা চাই।

বিপ্লবী নেতা হিসাবে সব্যসাচী ছাড়া শশীকবিকে প্রায় কেউই বুঝতে পারেনি। কথা ও কাজের অমিল দেখে কখনও কখনও অবিশ্বাস এবং ক্ষোভেরও সঞ্চার হয়েছে অনেকের মধ্যে। এই প্রশ্নে সব্যসাচী মানুষের বিচারের ক্ষেত্রে একটা অসাধারণ মূল্যবোধের কথা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'ওঁর মধ্যে দুটো সত্তা আছে অপূর্ববাবু। একজন শশী, আর একজন কবি। এই জন্যই একের মুখের কথা অপরের মনের কথায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে এমন বেসুরো সৃষ্টি করে। বহু মানবের মধ্যেই এমনি আর একজন নিভৃতে বাস করে। সহজে তাকে ধরা যায় না। তাই, মানুষের কথার ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব-মাত্রই তার কঠোর বিচার করলে অবিচারের সম্ভাবনাই থাকে বেশী।' আরও একজায়গায় তিনি বলেছেন, 'শশী সাধুলোক, সমস্ত অন্তরখানি যে গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ নির্মল। ...ও দুঃখ পাবে, কিন্তু দুঃখ কখনো কাউকে দেবে না।' এই 'কবি' মনকে ভারতীরা উপলব্ধি করেছে অনেক পরে। শশীকবি তার দশহাজার টাকার ড্রাফটের ইতিহাস কতবারই না কতজনকে বলেছে! কেউ তাকে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু যখন পেল, তার থেকে আগের দিন নবতারা পাঁচহাজার টাকা নিয়ে চলে গেল। পরের দিন তাদের বিয়ে হওয়ার কথা। ভারতী আর সব্যসাচী এসেছেন। শশী কবিই জানালো, আহমেদকে নবতারা বিয়ে করে চলে গিয়েছে। সব্যসাচীর পায়ের কাছে সাড়ে চার হাজার টাকা জমা দিল। শশীকবি তারপর বলছে, 'দশ হাজার টাকা পেয়েছিলাম, নবতারাকে পাঁচ হাজার দেব বলেছিলাম, টাকা দিয়েছি'। সব্যসাচী বললেন, 'নিলে'? শশী কবি বলল, হ্যাঁ, ওরা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল। ওরা একটা বাড়ি কিনবে। আহমেদের মাইনে তো মাত্র তিরিশ টাকা'! সব্যসাচী বলছেন, 'কিনবে, অবশ্যই কিনবে'। শশী কবির এই শিল্পী মন এবং উদার হৃদয়বৃত্তিকে সব্যসাচীই বুঝতে পেরেছিলেন। সব্যসাচীর চেতনার স্তরটি কত উন্নত এবং কত গভীর!

বিপ্লবী জীবনে পথ চলার ক্ষেত্রে সব্যসাচী আর একটি শিক্ষাকেও তুলে ধরে বলেছিলেন— 'নৈরাশ্য সহ্য করার শক্তি যার যত কম সে যেন এই পথ থেকে তত দুরে থাকে'। কী অপূর্ব কথা! আজকের যুগের বিপ্লবীদের ক্ষেত্রেও ত লাগবে। বিপ্লবের কাজ যখন সফল হয়না, লোকে যখন কথা শুনতে চায়না, পরাজয়ের পর পরাজয় যখন আসে, পরাজয়ের গ্লানি যখন চতুর্দিক থেকে মনকে অবসন্ন করে দেয়, মনের মধ্যে স্বপ্ন দেখার রঙীণ দিনগুলোকে যখন কন্টকাকীর্ণ করে ফেলে, যাত্রাপথ যখন রক্তাক্ত হয়ে যায়, মন যখন অন্যদিকে ফিরে যেতে চায় সেসময় এই কথাটা সে যুগের প্রেক্ষিতে ভাববার মত। তবে এও বুঝতে হবে, এর মধ্যে একটা যান্ত্রিকতা আছে। আজকের যুগে যে ভুল ধারণা থেকে নৈরাশ্য আসতে চাইবে, একদিকে সে সম্পর্কে সচেতন সংগ্রাম এবং অপরদিকে যদি নৈরাশ্য এসেও থাকে, আদর্শগত লড়াইয়ের দ্বারা তাকে অতিক্রম করতে হবে, জয় করতে হবে। মহান মাও সে তুং বলতেন, 'ডিফিট, ডিফিট অ্যাণ্ড ডিফিট, দেন ভিকট্রি'। ইতিহাসের শিক্ষা, সত্যই জয়ী হয়। কিন্তু সত্য প্রথমেই জয়ী হয়না। সত্য প্রথমে পরাজিত হয়, বার বার পরাজিত হয়। তারপরে শক্তি সঞ্চয় করে জয়ী হয়। জয়ের জন্য শক্তি তার চাই। এদেশের নবজাগরণের প্রথম শঙ্খবাদক রামমোহন বলেছিলেন যে, 'ইতিহাসের একটা বেদনাদায়ক ঘটনা হল, সত্য শুরু হয় কম শক্তি নিয়েই।' ফলে নৈরাশ্য সহ্য করার শক্তি যার যত কম সে যেন দুরে থাকে— এটা তখনকার দিনের চিন্তা, যার মধ্যে যান্ত্রিকতার ছাপ আছে। এর থেকে নির্যাস গ্রহণ করলে আজকের যুগে আমাদের বলতে হবে, নৈরাশ্যকে জায়গা দেবনা। কারণ, নৈরাশ্য অগ্রগতির পথে বাধা। সমাজপ্রগতির নিয়মে আমরা জানি, সত্য জয়ী হবেই অর্থাৎ এই পুঁজিবাদী সমাজকে পরিবর্তনের বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। এই আত্মবিশ্বাস নিরাশার অন্ধকারের মেঘকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। বিদ্যুৎরেখার মতো অন্ধকারের বুক চিরে আলোর নিশানা দেবে।

বিপ্লবীদের কাছে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাও সব্যসাচী তুলে ধরেছেন। সুমিত্রা 'পথের দাবী'র সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করলে বিরাট ক্ষতির প্রশ্ন তোলে ভারতী। সব্যসাচী এর উত্তর দিচ্ছেন— এক্ষেত্রে আমাদের ক্ষতির পরিমাপ করতে নেই। বলছেন, 'কারো অভাবকেই যেন না আমরা সর্বনাশ বলে ভাবি। একজনের স্থান যেন জলস্রোতের মত আর একজন স্বচ্ছন্দে এবং অত্যন্ত

অনায়াসেই পূর্ণ করে নিতে পারে।' বলেছেন, 'বিপ্লবীদের এটা প্রথম ও প্রধান একটা শিক্ষা।' এই চেতনার প্রয়োজন সর্বকালের বিপ্লবী আন্দোলনের পথিকদের।

আবার উপন্যাসের শেষের দিকে যখন প্রশ্ন এসেছে হৃদয়াবেগের, তখন সব্যসাচী তার উত্তরে বলছেন— 'হৃদয়াবেগ দুর্মূল্য বস্তু। কিন্তু চেতনাকে আচ্ছন্ন করলে এর মত শত্রু নেই'। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে হৃদয়ের যে আবেগ, তার আদান-প্রদান, হৃদয়বৃত্তি বা মানব মনের সুকুমারবৃত্তি সুন্দর জিনিস। তাই তাকে দুর্মূল্য বস্তু বলছেন। কিন্তু আবেগকে চেতনার দ্বারা পরিচালিত করতে হবে। আবেগ যদি চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অর্থাৎ আমাদের আবেগ যখন চেতনাকে ছাপিয়ে সামনে চলে আসে, যাকে আমরা বলি অন্ধ আবেগ— তা অনেক ক্ষতি করে। আবেগকেও হতে হবে চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত। কারণ মানুষের চেতনাই ক্রিয়া করে। শরৎচন্দ্র সব্যসাচী চরিত্রের মাধ্যমে এই ধরনের মূল্যবোধ সংক্রান্ত বহু শিক্ষাকেই সেদিন সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। যেমন এক জায়গায় ভারতীকে বলছেন, 'ভেবেচ, মানুষ হবার পথ তোমার অবারিত? ভেবেচ, দেশের দরিদ্র নারায়ণের সেবা আর ম্যালেরিয়ার কুইনিন জুগিয়ে বেড়ানোকেই মানুষ হওয়া বলে? বলে না। মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্যাদাবোধকেই মানুষ হওয়া বলে। মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।' মর্যাদাবোধের এই ধারণা নবজাগরণের বলিষ্ঠ চেতনারই আলোকোজ্জ্বল প্রকাশ। উপন্যাসে এক অতি নগণ্য চরিত্র অপূর্বের কুসংস্কারগ্রস্ত মামা। কুসংস্কারের প্রতি অন্ধবিশ্বাস তার কাছে সত্য। তার মুখ দিয়েও একটা মূল্যবোধের কথা শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছেন। বলছেন, 'সত্যপালনের দুঃখ আছে, তাকে আঘাতের মধ্যে দিয়ে বরঞ্চ একদিন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বঞ্চনা, প্রতারণার মিষ্ট পথ দিয়ে সে কোনোদিন আনাগোনা করে না।' সংস্কারের ছায়াটুকু সরিয়ে দিয়ে একে গ্রহণ করতে পারলে এই কথা ক'টি এক মূল্যবোধের হদিশ দেয়। এরকম আরও ছোটখাটো অনেক বিষয় জুড়েই 'পথের দাবী' তার পাতায় পাতায় রেখে গিয়েছে মূল্যবোধের অজস্র আঁচড়।

'পথের দাবী' —শেষ, তবু শেষ নয়

'পথের দাবী' উপন্যাসের সর্বশেষ অধ্যায়ে, যখন 'পথের দাবী' ভেঙে যাচ্ছে, সব্যসাচী এসেছেন শেষ বিদায় জানাতে। তাঁকে দেখে ভারতীর প্রবল আবেগের উচ্ছ্বাস দীর্ঘ দিনের জমে থাকা সুমিত্রার ভুল ধারণাকে পরিষ্কার করে দিল। তার মাথা হেঁট হয়ে গেল। সুমিত্রার মধ্যে যে ঈর্ষার সৃষ্টি হয়েছিল সব্যসাচীর প্রতি গভীর ভালবাসা থেকে, তার অবসান হল অন্তিম লগ্নে। 'পথের দাবী'র সুমিত্রা চলে যাচ্ছে সুরবায়াতে সম্পত্তি পেয়ে। ব্রজেন্দ্র বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দলের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। সব্যসাচী সবই জানেন। তবু স্থির, অটল, ধীর, প্রশান্ত। আগের মতই শশীকবিকে বললেন 'তুমি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গান গেয়ে যাও'। আর অপূর্বকে বললেন ভারতীকে নিন। অপূর্ব বলল, 'চিরদিন যারা অন্ন যোগায়, বস্ত্র যোগায়— সেই কৃষককূল আজ নিরন্তর, নিরক্ষর এবং নিরুপায় হয়ে মৃত্যুপথে এগিয়ে চলেছে। তাই আমি আর ভারতী গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে এদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করব'। সকলের উদ্দেশ্যেই সব্যসাচী বললেন, 'দরিদ্র কৃষকের ভালো করতে চাও কর, আমি আশীর্বাদ করি। তবে, এদের অর্থাৎ এই চাষীদের দুঃখদুর্দশার মূলে শিক্ষিত ভদ্রজাতি আছে, একথা সত্য নয়। সে মূল বার করতে গেলে তোমাকে আর একদিক খুঁড়ে বার করতে হবে।' স্পষ্ট করে না বললেও সমাজ ব্যবস্থার জন্যই যে কৃষক এবং মজুরের জীবনের এই বেদনাময় পরিণতি— এই বিজ্ঞানসম্মত সমাজচিন্তার একটা আভাস পাওয়া যায়। অন্যদিকে ব্যথাভরা হৃদয়ে ভারতী যখন বলছে, 'তোমার এদেশের মেয়েদের প্রতি ছিল বড় লোভ, সেকি বলি দেওয়ার জন্য?' সব্যসাচী বলছেন, 'এই কথাই তুমি তাদের বলো, একটি মেয়েও যদি বুঝতে পারে এই কথা তাহলে আমি ধন্য হব'। এই রকম কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সবার মনে গভীরতম বেদনার সৃষ্টি করে যখন চলে যাচ্ছেন সব্যসাচী, তখন একমাত্র সাথী তাঁর হীরা সিং। তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শশী কবি বলছে, 'দুর্দিনের বন্ধু, তোমায় নমস্কার সর্দারজী'! উপন্যাসে আছে, 'সব্যসাচীকে হীরা সিং সর্দার মানিয়া এ জীবনের সমস্ত ভাল-মন্দ, সমস্ত সুখ-দুঃখ

বিসর্জন দিয়া কঠোর সৈনিক-বৃত্তি মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। আর তাহার তর্ক নাই, আলোচনা নাই, সময়-অসময়ের হিসাব নাই'। তদানীন্তন সময়ের এই আনুগত্য দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কি না, এ বিচার করার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর।

একের পর এক এই ঘটনাপ্রবাহ থেকে মনে হবে যেন সব শেষ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, পাঠকের মনে হবে, সব শেষ হয়নি। এর মধ্যে দিয়ে কোন হতাশার সৃষ্টি হয়নি। পাঠকের তন্ত্রীতে বেদনার মধ্য দিয়েই জেগে ওঠে এক অপূর্ব অনুপ্রেরণার সুর। অশ্রুসিক্ত পাঠকের মনের মধ্যে ভেসে উঠবে উপন্যাসের প্রথম দিকে জাহাজঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা অপূর্বের কল্পনায় আঁকা তখনও অজানা এক বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ কথাগুলি— 'তুমি তো আমাদের মত সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারেনা, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাই তো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ। দূর্গম পাহাড় পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়; কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল— সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার!' পাঠকের হৃদয়ে অনুরণিত হতে থাকবে এর আবেদন। আঘাত করবে তার চেতন সত্তায়। জাগবে সব্যসাচী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

বর্তমান সময়ে প্রয়োজন 'সব্যসাচী'-উত্তর বিপ্লবী চেতনা

আমরা জানি, চিন্তা কখনও হাওয়ায় ভাসেনা, চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তা প্রতিভাত হয়, প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। উন্নত সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল, তার মধ্যে বহু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত থাকলেও পাঠকমনে মুদ্রিত হয় চরিত্র বা চরিত্রগুলি। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সব্যসাচীর যে চরিত্র এঁকেছেন— রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলা যায়, 'তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে।' সেই বিপ্লবী চেতনার নির্যাসটুকু আজকে নিতে হবে যুগের প্রেক্ষাপটে। এও মনে রাখতে হবে, আজকের যুগে দাঁড়িয়ে এই 'পথের দাবী'র সব্যসাচী কি পথ দেখাবে? না, তা সম্ভব নয়। আমরা বিপ্লবের স্তরের বিচারে এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছি। আজকের যুগে পথ দেখাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা— মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উন্নততর উপলব্ধি। আর যথার্থ মার্কসবাদী হতে হলে আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে বিগত যুগের সর্বোন্নত চিন্তাকে। এই প্রসঙ্গে মহান মাও সে তুং বলেছেন যে, 'প্রকাশিত বই আর অন্যান্য সাংস্কৃতিক সৃষ্টি যা রয়েছে, সেগুলি ঝরণায় উৎসমুখ নয়, সেগুলি আসলে উৎস থেকে বয়ে আসা জলধারামাত্র। ও সব সৃষ্টি করে গিয়েছেন আমাদের পূর্বসূরী দেশী বিদেশী শিল্পী সাহিত্যিকরা— যাঁরা তাঁদের সমাজের সময়কার জনগণের জীবন থেকেই সে সব শিল্প সাহিত্যবস্তু অনুসন্ধান ও আহরণ করেছেন। ...আমরা আমাদের পূর্বগামী আর বিদেশী লেখকদের কাছ থেকে এইসব উদাহরণ নিতে গররাজী হব না, এমনকি তা যদি সামন্তী আর বুর্জোয়া শ্রেণীরও হয়, তবুও না। ...আমরা সেগুলিকে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু তা করতে গেলে বিচার বিবেচনা করে নেব, এ যুগের জনসাধারণের জীবনকে চিত্রিত করবার জন্য।'

শ্রমিক বিপ্লবের বর্তমান প্রয়োজনে সাম্যবাদী চরিত্র অর্জন করতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে মহান লেনিনের শিক্ষা। তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'নতুন প্রজন্ম, যারা সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলবে তাদের শুরু করতে হবে পুরানো যে সব উপাদান রেখে গেছে সেখান থেকে অনুশীলন এবং শিক্ষা নিয়ে।' তারই পাশাপাশি এও বলেছেন, 'সাম্যবাদ শিক্ষা কেবলমাত্র সাম্যবাদী বই ও পুস্তিকায় নিবদ্ধ বিষয়গুলিকে পড়াই নয়— এর ফলে আমরা খুব সহজেই শাস্ত্রবাগীশ অথবা দাম্ভিক কমিউনিস্ট পাবো। ...মানবসমাজ যে জ্ঞান সম্পদ সংগ্রহ করেছে তাকে আয়ত্ত না করে সাম্যবাদী হওয়া যায় না। জ্ঞানসম্ভারের পরিণতিই হল সাম্যবাদ। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে মার্কসবাদ।

মার্কসবাদই দেখিয়েছে কীভাবে মানুষের জ্ঞান সম্ভারের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদের উদ্ভব ঘটেছে।' তাই মানবতাবাদী সাহিত্যিক টলস্টয়— যিনি শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝতে পারেননি, সেই টলস্টয়কে লেনিন অভিহিত করেছেন 'রাশিয়ার বিপ্লবের দর্পণ' হিসাবে। তিনিই বলেছেন, এগোতে গেলে অবশ্যই টলস্টয়কে জানতে হবে।

দেশের সংস্কৃতির জগতে অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বর্তমান যুগের শ্রমিক বিপ্লব বা সর্বহারা বিপ্লবের প্রয়োজনে সর্বহারা সাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে শরৎসাহিত্যকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ বার বার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'সংস্কৃতির যে উচ্চ আধারটা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তৈরী হয়েছিল, আমরা তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছি না। বড় কথাগুলো আমরা বিশ্বের থেকে আহরণ করেছি, কিন্তু দেশের মাটিতে গড়ে ওঠা উচ্চ সংস্কৃতির সুরের সঙ্গে আমরা যেন যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। সেই যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে। অথচ, তার সঙ্গে আজ বিরোধও অবশ্যম্ভাবী। কারণ, তিনি ছিলেন পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদ এবং মানবতাবাদের উপাসক। আর, আমাদের করতে হবে শ্রমিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব— পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লব। কাজেই বিপ্লবের সাধনায় আমাদের আর একটা ধাপ এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে তখনই পারব, যখন আমরা শরৎচন্দ্রকে বুঝেছি এবং বুঝে তার সমস্ত রসটুকু নিংড়ে নিয়ে তার ছিবড়েটা ফেলে দিয়েছি, তার অকার্যকরী দিকটা ফেলে দিয়েছি, তার মধ্যে যা কিছু সম্পদ ছিল— সমস্ত সম্পদগুলো নিয়ে আমরা নিঃশেষিত করে ফেলেছি।' আরও বলেছেন, 'আমাদের দেশে আজ যদি যুগের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে সর্বহারা সংস্কৃতি, সর্বহারা সাহিত্য গড়ে তুলতে হয়, তা তখনই সম্ভব হবে যখন মানবতাবাদী সাহিত্যের সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক ধারাটি, যা শরৎসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হব। ...আজকের দিনের সর্বহারা সংস্কৃতির উত্তরসাধকরা যদি শরৎ সাহিত্যকে উপযুক্তভাবে অনুধাবন করতে না পারেন, তাহলে সর্বহারা শ্রেণীর সাহিত্যও তাঁরা ফর্মূলা মাফিক তৈরী করবেন— তার স্বরূপ তাঁরা ধরতে পারবেন না।' সত্যিই তাই। আমাদের দেশে তথাকথিত কমিউনিস্টরা শরৎচন্দ্রকে অনুধাবন করতে না পারায় যথার্থ সর্বহারা সাহিত্য গড়ে উঠতে পারেনি। বেদনার বিষয় হলেও এসত্যকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

আজকের যুগে আমাদের প্রত্যেকের মুক্তি এবং সেই অর্থে মহিলাদেরও সত্যিকারের মুক্তির জন্য এই পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। নারীকে প্রয়োজনে বেরিয়ে আসতে হবে ঘরের আঙিনা ছেড়ে। নারীরা মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিলে দুর্নাম হবে এই সমস্ত প্রচলিত ধারণা এবং সমালোচনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এগিয়ে আসতে হবে। মেয়েদের কাজ ঘরের মধ্যে -- এই কুসংস্কারের মধ্যে আচ্ছন্ন না থেকে বেরিয়ে আসার কথা এসেছে 'পথের দাবী'তে। যদি পঁচানব্বই বছর আগে সব্যসাচী বা সুমিত্রা বলতে পারেন, তাহলে আজকের যুগের নারীসমাজকে তো আরও অগ্রণী হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে আজকের যুগের বিপ্লবের প্রয়োজনে। যে কোনো সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নারীসমাজের ভূমিকা কত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আজকের নারীসমাজকে বুঝতে হবে।

সর্বোপরি, শরৎসাহিত্য, শরৎচন্দ্রের দর্শন এবং তাকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষের বিপ্লববাদ, যা পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদ, সেই পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের মধ্যেও বিদ্যুৎচমকের মতো শ্রমিক আন্দোলনের কিছু কথা, যান্ত্রিক বস্তুবাদী দর্শনের সীমানার বাইরে বেরিয়ে আসা, তার প্রকাশের যে ক্ষণিক দ্যুতি, হৃদয়বৃত্তি ও মূল্যবোধের কিছু আঁচড় এবং তাকে ভিত্তি করে সব্যসাচীর চরিত্র চিত্রণ সহ আরও কিছু বিষয়— যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করলাম, তা মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রজ্ঞাদীপ্ত চিন্তার যতটুকু আমার উপলব্ধিতে এসেছে, তার ভিত্তিতে। □

(পথের দাবী প্রকাশের ৯৫ তম দিবসে এআইএসএসএস অনলাইনে একটি প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সেই আলোচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'নারী সংহতি' পত্রিকার .....২০২০ সংখ্যায়। এটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে পুনর্মুদ্রণ করা হল। এখানে আলোচক সামান্য কিছু সংযোজন করেছেন। —সম্পাদক)

ভারতপথিক রামমোহন রায়

সুব্রত গৌড়ী

নির্মাণ (making of modern India) বলেছেন। তাঁর কথায় সমকালীন ভারতের সবচেয়ে জ্যোতির্ময় বিন্দুকেই রামমোহন তাঁর জীবনে প্রতিভাত করতে পেরেছিলেন।

এই যে রামমোহন — এই রামমোহন ঘন তমসার মধ্যে নতুন আলোর শিখা নিয়ে এই বঙ্গ দেশে আবির্ভূত হলেন কী করে? খুবই আশ্চর্য হতে হয়। সত্যিই বিস্ময়কর। কিন্তু কাকতালীয় তো নয়। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রই আমরা জানি যে, সমাজে কোনও আদর্শ বা সেই আদর্শের মূর্তরূপ কোনও ব্যক্তিত্বের জন্ম হঠাৎ করেই হয় না। সমাজ বাস্তবতায় অর্থাৎ সমকালীন উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে সেই আদর্শ বা সমাজ চিন্তা গড়ে ওঠার জমি আগে তৈরি হয়, পুরানো উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন সম্পর্ক, জীবনরীতি ও আদর্শকে ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষা সমাজ আকাঙ্ক্ষা হিসাবে দেখা দেয়। জন্ম নেয় নতুন আদর্শবোধ। সেই আদর্শবোধ যখন সর্বোত্তম রূপে কোনও ব্যক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তিনিই সেই বিশেষ সমাজ বাস্তবতায় যুগপুরুষের মর্যাদা পান। শত শত বছরের সামন্তী শাসনের অমানিশার অবসানের পথে নবজাগরণের নতুন সূর্যোদয়ের কালে এ দেশের বুকে রামমোহনের আবির্ভাবকে সেই সমাজবাস্তবতায় যুগপুরুষের আবির্ভাব হিসাবে চিত্রিত করা যায়।

আবার একথাও সত্যি যে, রামমোহন যে শুধু অভিনন্দিত হয়েছেন তা নয়, যে আচলায়তনের বিরুদ্ধে তিনি অসমসাহসী লড়াই লড়েছিলেন তার ধারক-বাহকরা তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছিলে। তাঁর বিরুদ্ধে শুধু কুৎসা প্রচার করে জনমানসে তাঁর ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছে তাই নয়, এমনকী তাঁকে প্রাণে মারারও চেষ্টা করেছে। আমরা জানি, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কারের সেই অচলায়তন ভাঙা যায়নি। স্বাধীনোত্তর ভারতে শাসকশ্রেণির পক্ষ থেকে নবজাগরণের মহান আদর্শকে খর্ব করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে আমাদের দেশে সেই অচলায়তন পুষ্ট হয়েছে, তার কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে। এখন যারা শাসন ক্ষমতায় আছে সেই সংঘ পরিবার সারা দেশে ধর্মীয় বিভেদ ও অন্ধতার পরিবেশকে সমাজ মানসিকতার গভীরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অত্যন্ত নগ্নভাবে নবজাগরণের মহান মনীষীদের খাটো করার চেষ্টা করে চলেছে। তাই আমরা দেখলাম প্রধানমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় শাসক দলের স্নেহধন্য অভিনেত্রী পায়েল রোহতগি জাতীয় নবজাগরণের প্রথম পুরুষ রামমোহনের চরিত্র হননের জন্য তাঁকে 'বিশ্বাসঘাতক' এবং 'ব্রিটিশের চামচা' বলে অভিহিত করেছেন। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তারা জানে যে, ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে নানা ধরনের বস্তুপচা ধ্যান ধারণাকে সমাজ মননে নিয়ে আসার যে ধারাবাহিক পদক্ষেপ বর্তমান শাসকরা করে চলেছে, রামমোহন-বিদ্যাসাগর সহ নবজাগরণের মহান মনীষীদের সংগ্রাম ও চরিত্র এই অপচেষ্টার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

একবিংশ শতাব্দীতে সমাজের যে চেহারা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা থেকে বোঝা যায় আজ থেকে ২৫০ বছর আগে যে সমাজ পরিবেশে রামমোহনের

জন্ম, সেই সমাজ কত ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সামন্তী সমাজের এই অন্ধকার ছিন্ন করতে রামমোহনের ঘরে বাইরে কী কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

তাই রামমোহনকে বুঝতে হলে তাঁর যুগের সমাজ বাস্তবতাকে বুঝতে হবে। কী ভাবে সামন্তী সমাজের অন্ধকার ছিন্ন করে নবজাগরণের সূর্যোদয়ের আলোকচ্ছটার উদয় হয়েছিল, তা আমাদের বুঝতে হবে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রামমোহনের চিন্তা ও কর্মজীবনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারব।

নবজাগরণের উন্মেষকালের সমাজবাস্তবতা

নবজাগরণের আলোচনা করতে হলে ইউরোপীয় নবজাগরণের প্রেক্ষাপটেই আমাদের আলোচনা করতে হয়। কারণ নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল সর্বপ্রথম ইউরোপেই। ইউরোপের ইতিহাসকে সামনে রেখে বিচার করলে আমরা দেখব, সামন্ততন্ত্রের শেষ লগ্নে সামন্তী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যখন সামাজিক চাহিদা পূরণে অসমর্থ হয়ে পড়ে, তখনই সমাজ অভ্যন্তরে সামাজিক প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণের উপযোগী উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থা সৃষ্টির বাস্তব আকাঙ্ক্ষাটির উদ্ভব হয়। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্ক যখন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন দেখা দেয় সর্বব্যাপী এক সামাজিক সঙ্কট। সামন্তী ব্যবস্থার গর্ভেই নতুন উৎপাদনব্যবস্থা এবং তার পরিপূরক নতুন সমাজ চিন্তা, আদর্শ ও মূল্যবোধ নতুন সমাজ আকাঙ্ক্ষারূপে দেখা দেয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে এভাবেই সমাজবাস্তবে বুর্জোয়া শ্রেণির ভাবগত পরিমণ্ডল রূপে বুর্জোয়া মানবতাবাদ বা রেনেসাঁর ধ্যানধারণা আসার জমি তৈরি হয়।

ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এর সূচনা। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত এই যে যুগটা, ইউরোপের ইতিহাসে এই সময়কালকে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগ বলা হয়। তবে এই পুরো সময়কালকে নবজাগরণের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করলেও, এর প্রকৃতি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একইরকম ছিল না। এর শুরুতে যখন সামন্তী অর্থনীতির গর্ভে পুঁজিবাদী অর্থনীতির জন্ম হচ্ছে, তখন সেই পুঁজিবাদের চরিত্র ছিল বণিকী পুঁজিবাদ। নবজাগরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, বণিকী পুঁজির যুগে, অর্থাৎ নবজাগরণের সূচনার পর্বে এর চরিত্র ছিল social reformation বা সমাজসংস্কার আন্দোলন। এমনকী এমন ঘটনাও আছে যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইউরোপের দু'একটি দেশে ধর্মের সাথে মিলিয়েই নবজাগরণের চিন্তা এসেছে। আবার যখন বণিকী পুঁজির বিকাশের পথে শিল্প পুঁজি গড়ে উঠতে শুরু করেছে, তখন নবজাগরণের চিন্তা- চেতনাতেও এসেছে পরিবর্তন। শিল্প পুঁজির বিকাশের প্রয়োজনেই আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চাকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে পার্থিব মানবতাবাদের ধারণা গড়ে উঠেছে। তাই মার্টিন লুথার কিং-এর social reformation আন্দোলন বা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির শিল্পকলা যে যুগে বিকাশলাভ করেছে, সেই গোড়ার যুগে পার্থিব মানবতাবাদের ধারণা পরিপূর্ণতা নিয়ে গড়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে শিল্পবিপ্লবের যুগে নিউটনের সময়কালে আধুনিক বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে সেক্যুলারিজমের ধারণা প্রকৃষ্ট রূপ নিয়েছে। ভারতীয় নবজাগরণের জন্ম ও বিকাশকে বুঝতে হলে, বিশেষ করে রামমোহনের সময়কালকে বুঝতে হলে ইউরোপীয় নবজাগরণের বিকাশের এই বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হবে।

এখন নবজাগরণের সূচনাপর্বের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিচার করে দেখা যাক। জমি ভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদন হত ভোগের উদ্দেশ্যে। স্বয়ংসম্পূর্ণ আঞ্চলিক গ্রামীণ অর্থনীতিতে উৎপাদিত পণ্যের বিনিময়ের প্রয়োজনেই মুদ্রার ব্যবহার হত। পণ্য-মুদ্রা-পণ্য, এই ছিল সামন্তী অর্থনীতির মূল সূত্র। কিন্তু সামন্তী ব্যবস্থার গর্ভে যখন বণিকী পুঁজির উদ্ভব হল, তখন অর্থনীতি কেবল পণ্যের বিনিময়ের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকল না। কেবল ভোগ নয়, উৎপাদিত নানা দ্রব্য, এমনকী কৃষিজাত পণ্যও বাজারে বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে ধনবৃদ্ধির যে প্রক্রিয়া, সেটাই হল বণিকী পুঁজিবাদ। স্পষ্টতই বোঝা যায়, 'পণ্য-মুদ্রা-পণ্য'-এর সূত্রে তা আবদ্ধ নয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় পণ্য

চলাচলের নিয়ম 'মুদ্রা-পণ্য-মুদ্রা'য় রূপান্তরিত হয়। বণিকী পুঁজির স্তরেও পণ্য চলাচলের এই নিয়মই কাজ করে।

তাই বণিকী পুঁজির বিকাশ ঘটার অর্থই হল, সামন্তী উৎপাদন ব্যবস্থার ধ্বংসের সূচনা। সামন্তী অর্থনীতি, তার উৎপাদন সম্পর্কে মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে অসমর্থ হয়ে পড়ার সাথে সাথে স্বাভাবিক নিয়মে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হতে থাকে। এই বণিকী পুঁজির বিকাশকালেই নবজাগরণের সূত্রপাত।

রামমোহন ঃ সামাজিক প্রেক্ষাপট

আমরা জানি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ দেশে আসার আগেই ভারতবর্ষের বণিকী পুঁজিবাদের ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল। ফলে এদেশে তখন পণ্য চলাচল গ্রামীণ অর্থনীতির ঘেরাটোপের মধ্যেই আটকে ছিল না। সামন্তী বাজারের গণ্ডী পেরিয়ে বৃহত্তর বাজারে, এমনকী সওদাগরী রপ্তানীর পথে সেই পণ্য দূর-দূরান্তের বিদেশের বাজারেও পৌঁছে যেত। মানের উৎকৃষ্টতা ভারতীয় পণ্যকে অন্যান্য দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের উপরে স্থান দিয়েছে। বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিতে ভারতীয় পণ্য বিশ্ববাজারে বহু ক্ষেত্রেই নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করেছে। এই পণ্য সরবরাহ যখন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে, তখন সাধারণ অর্থনীতির নিয়মে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যাঙ্কিং প্রথারও অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। এও দেখা গেছে যে, কেবল রেশম মসলিন প্রভৃতি উচ্চবিত্তের ভোগ বিলাসের সামগ্রীই নয়, তখন ভারতে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের সূতির কাপড়, শাড়ি প্রভৃতিও তৈরি হত। ফলে ব্যাপক মানুষের চাহিদা পূরণের পথেই সেদিন আঞ্চলিক বাজার ভেঙে ধীরে ধীরে বৃহত্তর জাতীয় বাজার সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। একদিকে বাজার সম্প্রসারণ ও তার সাথে সাথে বণিকী পুঁজি ও তেজারতি ব্যবসায়ের লাভ থেকে আসা পুঁজির সংমিশ্রণে শিল্পপুঁজি সৃষ্টির প্রাথমিক উদ্যোগ — এই দুই-এর মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষণগুলি দেখা দিতে থাকে।

এরকম একটা সময়েই ইংল্যাণ্ডের বণিকী পুঁজির প্রতিষ্ঠান 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' এদেশের বুকে তার রাজদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে। তাদের প্রয়োজন ছিল ব্যাপক বিস্তৃত বাজার। তাই সামন্তী ব্যবস্থার অধীনস্থ ভারতবর্ষের বিশাল বাজার তারা দখল করতে চেয়েছিল। শুধু তাই নয়, এখানকার পর্যাপ্ত কাঁচামাল ও শ্রম সম্পদও ছিল তাদের বিশেষ আগ্রহের বিষয়। তাই রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের পর বণিকী স্বার্থে তাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন ছিল সামন্তী ব্যবস্থাকে নির্মূল করা। কারণ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি বজায় থাকলে পারস্পরিক আদান-প্রদানের পথে বৃহত্তর সাধারণ বাজারটি গড়ে উঠতে পারে না। আবার এই বৃহত্তর লেনদেনের পথ সুগম করতে চাই পারস্পরিক বোঝাপড়া, সাংস্কৃতিক বিনিময়, কূপমণ্ডুকতার অবসান, বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ব্যাপকতর যোগাযোগ, সামন্তী গ্রাম্য সমাজব্যবস্থার অবসান। ফলে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই এদেশে প্রতিষ্ঠিত সামন্ততন্ত্রের সাথে কোম্পানির ঘোরতর বিরোধ দেখা দেয়। এক কথায় ভারতের সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ না করলে বিদেশি বণিকী পুঁজির এদেশের বিস্তারলাভ সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে এদেশের যথেষ্ট শক্তিশালী বণিকী পুঁজিবাদও এই সামন্তী ব্যবস্থার ধ্বংস ব্যাতিরেকে বিকাশের সন্ধান করতে পারছিল না। অর্থাৎ দেশি ও বিদেশি উভয় বণিকশ্রেণির সামনেই সেদিন দেশীয় সামন্ততন্ত্র ছিল মূল বাধা, সাধারণ শত্রু। তাই সাধারণ শত্রু সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদের প্রশ্নে এই উভয় বণিক গোষ্ঠীরই একটা স্বার্থের অভিন্নতা ছিল এবং সেই অভিন্ন উদ্দেশ্যবোধ থেকেই এবিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে ঐক্যও হয়। সেদিন সিরাজদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে লড়াই-এ এদেশের বণিক কূল — জগৎ শেঠ ও উমিচাঁদরা যে কোম্পানীকে সাহায্য করেছিল তার নেপথ্যে কাজ করেছিল এই অভিন্ন স্বার্থবোধ। কিন্তু এই ঐক্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পরবর্তীকালে দেশীয় বাজার অধিকার করা নিয়ে ভারতীয় বণিকী পুঁজিবাদের সাথে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। দেশজ শিল্পের উৎকৃষ্টতার সাথে এঁটে উঠতে না পেরে বিদেশি বণিকরা দমন-পীড়ন ও নৃশংসতার আশ্রয় নেয়। বলপূর্বক এদেশের শিল্পগুলিকে নষ্ট করার উদ্যোগ নেয়। তাঁতিদের আঙ্গুল কেটে দেওয়ার

মতো ঘটনা এই সময়েই ঘটে। নীল চাষিদের উপর অকথ্য অত্যাচার নেমে আসে। ফলে বণিকী পুঁজির বিকাশের পথে তার শিল্পায়নের যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি এদেশের বুকে ঘটতে চলেছিল তার গতি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাথে যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয়ের পর এদেশের বণিকী পুঁজি ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ হয়ে পড়ে। ফলে ভারতীয় বণিকী পুঁজিপতিরা, যাদের স্বাভবিকভাবে শিল্প পুঁজি ও জাতীয় পুঁজির জন্ম দেওয়ার কথা, তারা পুরোপুরি কম্প্রাডর বুর্জোয়া বা মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিতে পর্যবসিত হয়ে যায়। অর্থাৎ বিদেশে উৎপাদিত পণ্য নিয়ে ব্রিটিশ ফার্মগুলোর এজেন্ট হিসাবে এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করতে শুরু করল।

ভারতের নবজাগরণের সমাজবাস্তবতাকে বুঝতে হলে দেশীয় বণিকী পুঁজি ও বিদেশি পুঁজির মধ্যেকার এই ঐক্য ও সংঘাতের জটিল চরিত্রকে ঠিকমতো বুঝতে হবে। তাহলেই আমরা সেদিনের সমাজমননের গতিপ্রকৃতি ও প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার চরিত্র নিরূপণ করতে পারব এবং রামমোহনের চরিত্র নির্মাণের সমাজবাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারব।

ইতিহাসকে সঠিকভাবে বুঝতে পারলে আমরা দেখতে পাব যে, এ দেশে বণিকী পুঁজিবাদ এবং তার ক্রম পরিণতির পথে নবজাগরণের চিন্তা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে দেখা দিলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আসার আগে তা দানা বাঁধবার সুযোগ পায়নি। তবে যতটুকু বিকশিত হয়েছে, এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত শিল্প পুঁজি বা জাতীয় পুঁজি গঠনের সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে তার উত্তরণের যতটুকু অনুকূল বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে — ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থে সামন্ততন্ত্রবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তার কর্মচারীদের মারফৎ পাশ্চাত্য নবজাগরণের নানা টুকরো টাকরা ধারণা রেনেসাঁর সেই প্রস্ফুটনপর্বকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে। কোম্পানি যখন তার নিজস্ব স্বার্থে 'মুক্ত বাণিজ্যের পরিবেশ' সৃষ্টির জন্য এদেশের স্বয়ংশাসিত গ্রাম্য সমাজ ভাঙতে চেয়েছে, অচল-অনড় সামাজিক ভিত ধরে নাড়া দিয়েছে, কূপমণ্ডুকতা ও কু-আচার-এর উপর আঘাত হেনেছে, তখন এদেশের সমাজ বাস্তবতায় নবজাগরণ আসার বা মানবতাবাদী চিন্তা চেতনা জন্ম নেবার যে ক্ষেত্রটি প্রস্তুত ছিল সেটি সতেজ ও সরস হয়ে ফল দিতে শুরু করেছে। সমাজ আকাঙ্ক্ষায় গণতান্ত্রিক জীবনবোধের যে আকুতি সুপ্ত ছিল, তার প্রকাশ ঘটেছে।

এ প্রসঙ্গে মার্ক্সের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংল্যাণ্ডকে ঃ একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক — পুরাতন এশিয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।"

তিনি আরও বলেছিলেন, "একথা সত্য যে, ইংল্যাণ্ড হিন্দুস্থানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীন স্বার্থবুদ্ধি থেকে এবং সে স্বার্থ সাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল ঃ এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে তাহলে ইংল্যাণ্ডের যত অপরাধই থাক, সেই বিপ্লব সংগঠনে ইংল্যাণ্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।"

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রামমোহনের সমসাময়িক কালে তো বটেই, এমনকী তার আগে থেকেই নবজাগরণের চিন্তা এদেশের বুকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমন এক কথায় "অভিশাপের মধ্য দিয়ে আসা পরোক্ষ আশীর্বাদের" মতো নবজাগরণের এই স্ফূরণকে আরও ব্যাপকতর করেছে, বিষয়গত দিক থেকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছে। এই জন্যই মার্ক্স ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডের ভূমিকাকে ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ইংল্যাণ্ডের এই ইতিবাচক ভূমিকাকে সে যুগে সবচেয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন রামমোহন। সে সময় ভারতে তাঁর মতো করে যুগশক্তিকে কেউ বুঝতে পারেন নি। যুগশক্তিকে বুঝতে পারাটা মহাপুরুষের সবচেয়ে বড় লক্ষণ। দার্শনিক হেগেল বলেছিলেন যে, ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক শক্তিকে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না, কারণ সে অন্ধ। যিনি বুঝতে পেরে সেই শক্তির কাছে

আত্মসমর্পণ করেন, তার সাথে সামিল হয়ে এবং তার পরিপার্শ্বকে নিজের মতো করে ইতিহাসের ধারার সাথে সামিল হতে সাহায্য করে প্রগতির দরজাকে খুলে দিতে পারেন, তিনিই হলেন মহাপুরুষ। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী রামমোহনই নবজাগরণের উত্থানপর্বের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। কারণ তাঁর আগে তাঁর মতো করে ইতিহাসের গতিকে বুঝে সমাজের অবরোধের প্রাচীর আর কেউ ভাঙ্গতে পারেনি।

নবজাগরণের উত্থান পর্বের মহানায়ক রামমোহন

রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই আর একভাবে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এক একটা যুগসন্ধিক্ষণে যাঁরা নতুন যুগের বার্তা বয়ে নিয়ে আসেন, তাঁরাই সমাজকে নতুন পথের সন্ধান দেন, তাঁরাই পথপ্রদর্শক। ভারতবর্ষে নবজাগরণের ঊষাকালে নতুন যুগের বার্তা এনেছিলেন রামমোহন রায়। তাই তিনি ভারত পথিক।

তিনি আরও বলেছিলেন, "দীর্ঘ সুপ্তির পর রামমোহন রায় আমাদিগকে নিদ্রোত্থিত করিয়া দিয়াছেন। এমন কিছুদিন আমাদের চিত্তবৃত্তির পরিপূর্ণ আন্দোলন হইলে তবে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক সত্যক্ষুধা সঞ্চার হইবে — তখনি সে যথার্থ সত্যকে সত্যরূপে লাভ করিতে সক্ষম হইবে।"

আগেই বলেছি, রামমোহনের সমসাময়িককালে আরও কিছু মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে নবজাগরণের চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে। তাই কেউ কেউ রামমোহনকে এই কৃতিত্ব দিতে চান না। বাস্তবে একজন চিন্তানায়কের অভ্যুত্থান কী ভাবে ঘটে, তার বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক কারণ সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকেই এ ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

আমরা যাঁদের যুগনায়ক বলি, বা একটা বিশেষ যুগের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র বলি, তার সৃষ্টি হয় কীভাবে? এ সম্পর্কে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে আমরা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ব। সেই দিক থেকে বিচার করলে আমরা দেখব, সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক ধারায় সমাজ অভ্যন্তরে চলতে থাকা অবিরাম দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন সমাজ চাহিদাকে কেন্দ্র করে যখনই কোনও নতুন চিন্তা বা মতাদর্শের জন্ম হয়, প্রাথমিক পর্যায়ে টুকরো টুকরোভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্য দিয়েই সেই চিন্তার বিক্ষিপ্ত স্ফূরণ ঘটে। সামগ্রিক রূপ নিয়ে সাথে সাথেই তার ব্যক্তিকরণ ঘটে না। সমাজের অভ্যন্তরে ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলতে চলতেই এক সময় এই নতুন সমাজ চিন্তা জীবনের বহু দিককে যুক্ত করে যখন একটা সামগ্রিক জীবনদর্শনের রূপে বিশেষ কোনও ব্যক্তির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে, তখন ঐ বিশেষ ব্যক্তিকেই আমরা সেই যুগের প্রতিনিধি চরিত্র বা যুগনায়ক আখ্যা দিই।

এ দেশের নবজাগরণের আন্দোলনে রামমোহনের ভূমিকাকে এই প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বের ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম বিচার করলে আমরা দেখতে পাব যে, রামমোহনের আগেই এ দেশে সমাজ অভ্যন্তরে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে ইতস্তত কিছু কিছু নতুন চিন্তা বা আকাঙ্ক্ষা জাগতে শুরু করেছিল। এমনকী কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার বাস্তব অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছিল, যদিও সেগুলি ছিল আংশিক। এই বিক্ষিপ্ত চিন্তা চেতনাই ইংরেজি শিক্ষার পথ বেয়ে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত করে সামগ্রিক একটি জীবনদর্শনের রূপ নিয়ে সর্বপ্রথম রামমোহনের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক চিন্তা-চেতনার অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিংবা কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম — সমস্ত দিক থেকেই রামমোহনের মধ্যে সামগ্রিক রূপে নতুন যুগচেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল। এই অর্থে রামমোহনই ছিলেন এ দেশের নবজাগরণের সূচনা পর্বের প্রতিনিধি চরিত্র বা যুগনায়ক।

যে সময় রামমোহনের আবির্ভাব, ভারতবর্ষে তখন মোগল শাসন অবলুপ্তির পথে এবং তার পরিবর্তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে সারা দেশে সম্প্রসারিত করছে। একদিকে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্ধ কুসংস্কার, কু-আচার ধর্মীয় গোঁড়ামি ও নানাবিধ শোষণের জাঁতাকলে

পিষ্ট সমাজ জীবনে এক সম্পূর্ণ বন্ধ্যা দশা চলছে, অপর দিকে ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের সাথে সাথে একদল মানুষের ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এরই প্রভাবে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে একদল মানুষের ইউরোপীয় নবজাগরণের চিন্তাভাবনার সাথে পরিচয় ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে রামমোহনই সর্বপ্রথম অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা, সামাজিক অনুশাসন ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে এক সর্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুললেন। রামমোহনের প্রখর যুক্তিবাদী মন ধর্মকে অন্ধবিশ্বাসের আসন থেকে সরিয়ে এনে মানব কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাল। যুক্তিবাদের কষ্টিপাথরে বিচার করে তিনি হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা, হিন্দু সমাজের বহু কুপ্রথা, নারীজাতির উপর নির্যাতন, ব্রাহ্মণ বা সমাজপতিদের অত্যাচার — এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন।

রামমোহন যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা, ছোঁয়াছুঁয়ি ও প্রাত্যহিক আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এবং সতীদাহ প্রথা রদ করার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে তিনি শাস্ত্রকে ব্যবহার করেছিলেন বা শাস্ত্রের নানা উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বেদান্তকে আশ্রয় করে হিন্দুধর্ম সংস্কার করতে চেয়েছিলেন এবং এই নতুন চিন্তার চর্চার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখ করে কেউ কেউ তাঁকে নবযুগের পথিকৃৎ বলতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু একটা বিষয় তাঁদের নজর এড়িয়ে গেছে। মোহমুক্ত মন নিয়ে যদি তাঁরা বিচার করতেন, তাহলে সহজেই দেখতে পেতেন যে, পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্বরা যেভাবে হিন্দুধর্ম ও বেদান্তকে আশ্রয় করেই জীবনবোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, রামমোহনের মধ্যে তা দেখা যায় না। এমনকী আলাদা করে তিনি কোনও ধর্মমতই প্রতিষ্ঠা করেননি। তিনি শুধুমাত্র ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই সমাজকে ধর্মের রূপ দেননি। তা দিয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ। রামমোহনের বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, রামমোহন রায়ের সারা জীবনের প্রধান কাজ ছিল হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করা। তাঁর এই কাজের প্রেরণা কোনও ধর্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভুত হয়নি। কারণ বিশেষ কোনও ধর্মের সাথে তিনি নিজেকে যুক্ত করেননি। তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাবো যে, প্রাচীন বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম বা বেদান্তের আদর্শকে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার বিন্দুমাত্র কোনও ভাবনা বা আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। অর্থাৎ এককথায় নবযুগের আহ্বানকে উপেক্ষা করে তিনি প্রাচীন হিন্দুসমাজকেই আদর্শ সমাজব্যবস্থা মনে করে তার পুনরুজ্জীবনের আহ্বান জানান নি। বরং এর বিপরীতে বাস্তব জীবনসত্য, তার গতিপ্রকৃতি, তার কল্যাণের দিক — কোনও অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত হয়ে এগুলিকে তিনি উড়িয়ে দেননি। এগুলির উপলব্ধি যে জাতি বা সমাজের কল্যাণের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন তাই ব্যক্ত করেছেন। ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "একজনের বিশ্বাসের দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না, যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্যই প্রকাশ করে।" এই কথাগুলো কি বেদান্তের মায়াবাদের অনুসারী বলে মনে হয়? আসলে হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতার হাত থেকে হিন্দু সমাজকে মুক্ত করার জন্য হিন্দুধর্মের সাথে যুক্ত মূল দর্শন বেদান্তের আশ্রয় তাঁকে নিতে হলেও বেদান্তের অন্ধ স্তাবক তিনি ছিলেন না। তাই তিনি যখন এ দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন, তখন বেদান্তের শিক্ষা বা শাস্ত্রীয় শিক্ষার কথা ভাবেন নি। বিজ্ঞান ও আধুনিক দর্শনের শিক্ষার কথা ভেবেছেন। ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে না পারলেও ব্যবহারিক জীবনে, সামাজিক অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক ও মানসিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন যে ন্যূনতম হয়ে পড়েছে, এমনকী তা মানুষের মনকে শৃঙ্খলিত করছে — এই উপলব্ধি যে রামমোহনের ছিল তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় — লর্ড আমর্হাস্টকে লেখা তাঁর ঐতিহাসিক চিঠিখানিতে। এই চিঠিতে তিনি সুস্পষ্টভাবে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের স্বপক্ষে এবং সংস্কৃত

শিক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। এ দেশে যুক্তিবাদ নির্ভর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন — "সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থা দেশকে অন্ধকারে নিমগ্ন রাখার একটি সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ।

যে বৈদিক মতবাদ বিশ্বাস করতে শেখায় যে, কোনও দৃশ্যমান বস্তুরই অস্তিত্ব নেই, তা যুবকদেরকে সমাজের উন্নত সদস্য হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উপযোগী হবে না।

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সরকার হিন্দু পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে যে সব বিষয় চালু রয়েছে, সেগুলি পড়ানোর জন্য সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করছে।.... ছাত্রছাত্রীরা সেখানে দু'হাজার বছর আগে যা জানা ছিল, সেইসব জ্ঞানই শুধু অর্জন করবে।"

তৎকালীন হিন্দু সমাজের পারিবারিক জীবনে যে প্রচণ্ড ধর্মীয় পরিবেশে তাঁকে থাকতে হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটটি না জানলে বোঝা যাবে না যে, ধর্মীয় সংস্কারের পথে কেন তাঁকে নবজাগরণের চিন্তাকে আনতে হয়েছে। সামাজিক দুর্নীতি, ব্যাভিচার, সমস্তরকম সামাজিক কুপ্রথা, যা গোটা সমাজকে পঙ্গু করে ফেলেছিল, সে সব ক্ষেত্রে তাঁর আপসহীন লড়াই কি প্রকৃতি বিচারে ধর্মীয় রীতিনীতি ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ মানবতাবাদেরই লড়াই ছিল না?

মানবতাবাদের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ রামমোহন সেক্যুলার মানবতাবাদের পৃষ্ঠপোষক না হলেও তিনি একদিকে যেমন ধর্মীয় জগতের আবর্তিত জঞ্জাল থেকে মানুষের জীবন ও মননকে মুক্ত করে তার স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠার পরিবেশকেই আনতে চেয়েছেন, অন্যদিকে এরই পাশাপাশি এমন কতকগুলি সামাজিক সংস্কারের কাজে ব্রতী হয়েছেন, যা গোটা দেশের বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নবযুগের বার্তা বয়ে এনেছে।

ইউরোপের নবজাগরণের ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা এই জিনিসই দেখতে পাব। সেখানেও নবজাগরণ আন্দোলন সর্বপ্রথম ধর্মসংস্কার আন্দোলনরূপেই শুরু হয়েছিল। নতুন সমাজ আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য নবজাগরণের প্রবক্তারা অনেকেই সেদিন অতীতকে হাতড়েছেন। অতীতের মূল্যবোধকে নতুন ভাবনায় সঞ্জীবিত করে একটা নতুন রূপে আনতে চেয়েছেন। দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত ধর্মীয় চিন্তায় আচ্ছাদিত মনকে নাড়া দেবার জন্য ধর্মকে সংস্কারমুক্ত করে তার মূল্যবোধকে তাঁরা একটা মানবতাবাদী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেদিন তাঁরা ধর্মকে যুক্তিহীন আনুগত্য বা আত্মসমর্পণ হিসাবে না নিয়ে যুক্তির ভিত্তিতে আত্মসুদ্ধির বা নৈতিক উন্নয়নের পাথেয় রূপে গ্রহণের আহ্বান রেখেছিলেন। এই ছেদটাই ছিল নবজাগরণের চিন্তা-জাত, যা বিজ্ঞানের পথে একদিন অতিপ্রাকৃত সত্তার সম্পূর্ণ অস্বীকৃতির পথ বেয়ে পার্থিব মানবতাবাদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেছে। আগেই আলোচনা করে দেখানো হয়েছে, বণিকী পুঁজির বিকাশের পথে যখন শিল্প পুঁজির জন্ম হচ্ছে, তখনই একমাত্র সেক্যুলার চিন্তার জন্ম হওয়া সম্ভব। রামমোহনের যুগটা ছিল এদেশের বণিকী পুঁজির যুগ। এই প্রেক্ষাপটেই রামমোহনের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে বুঝতে হবে। তাহলেই আমরা বুঝতে পারব যে, কেন তাঁর পক্ষে ধর্মীয় চিন্তার ঘেরাটোপ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না।

রামমোহনের কর্মজীবন ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য

রামমোহন চরিত্রকে বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে স্মরণে রাখতে হবে। রামমোহন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যথার্থই বলেছিলেন, "এ পর্যন্ত আমরা তাঁর স্মৃতি সভায় কেউ তাঁর রাজনীতি, কেউ শিক্ষা, কেউ সমাজ সংস্কারক — এইরূপ খণ্ড খণ্ড করে তাঁর জীবনের এক একটা দিক আলোচনা করেছি। এমন টুকরো টাকরা করে কোনও মহৎ চরিত্র আলোচনা করা আমি অন্যায় বলে মনে করি, ইহাতে তাঁকে সম্মান না করে অপমান করা হয়।"

তাই রামমোহন নিয়ে আলোচনায় তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

প্রথমে শিক্ষা সংস্কারের প্রশ্নে আসা যাক। এ দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। বেদান্ত নির্ভর সংস্কৃত শিক্ষা নয়, বিজ্ঞান নির্ভর ইংরেজি শিক্ষা চাই — এটাই ছিল তাঁর শিক্ষা চিন্তার মূল কেন্দ্রবিন্দু। রামমোহনের অসাধারণ প্রতিভা এ সত্য সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে,

ইউরোপের উন্নত দেশগুলির সমপর্যায়ে যদি এ দেশকেও উন্নত করতে হয়, ওই সব দেশের সাধারণ নাগরিক যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে, তা যদি এদেশের মানুষের কাছেও সহজলভ্য করতে হয়, তাহলে সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন, সামাজিক বহু কুপ্রথা দূরীকরণের সাথে সাথে এ দেশে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার ঘটানো দরকার। তিনি এ কথাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই শিক্ষার সুযোগ শুধুমাত্র সমাজের উপরতলার কিছু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং অনেক বেশি জোর দিতে হবে নরনারী নির্বিশেষে সমাজের ব্যাপক জনসাধারণ, বিশেষ করে নিচুতলার মানুষের শিক্ষালাভের সুযোগ সম্প্রসারিত করার উপর। রামমোহন তাঁর এক প্রিয় শিষ্যকে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষে আজ যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হল, শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং সেক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার দরকার যাতে সমাজের নিচুতলার মানুষ সর্বাগ্রে শিক্ষার সুযোগ পায় কারণ তাঁর মতে ''রন্ধন কখনোই সম্ভব নয়, যদি পাত্রটিকে নিচের থেকে গরম না করা হয়।'' বহুযুগের সঞ্চিত কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার হাত থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করার জন্য যেমন একদিকে তিনি স্কুল স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হন, অন্যদিকে এই একই উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের সংবাদপত্র 'সংবাদ কৌমুদী'কে কাজে লাগান। এই শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি যে ধর্মীয় অনুশাসনকে প্রাধান্য দিতে চান নি বা বেদান্তের ভাষ্য সহজ করে তাই দিয়েই শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে ভারাক্রান্ত করতে চাননি, তার উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তিনি তাঁর নিজস্ব ব্যয়ে 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল' নামে যে অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেন, সেখানে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম চিন্তানায়ক ভলতেয়ারের লেখা 'সুইডেনের দ্বাদশ চার্লসের ইতিহাস' বইটিকে স্থান দেন।

এছাড়াও তিনি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটিকে নানাভাবে সাহায্য করেন, যাতে তারা এই প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর নিজের লেখা বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত ভূগোলের পাঠ্যপুস্তক উপহার দেন এবং ফার্গুসনের Introduction to Astronomy বইটির বাংলা অনুবাদ সংশোধন করে প্রকাশে সাহায্য করেন। আধুনিক শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তিনি 'সংবাদ কৌমুদী'তে শ্রুতিযন্ত্রে প্রতিধ্বনি, চুম্বকের ধর্ম, বেলুনের বিবরণ, মাছের আচরণ প্রভৃতি প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা প্রকাশ করেন।

আমরা জানি, শিক্ষা সংস্কারের পাশাপাশি তিনি ধর্ম-সংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলনও পরিচালনা করেন। তাঁর নিজের ও গোষ্ঠীগতভাবে তাঁর পরিচালিত বিভিন্ন সংবাদপত্র যেমন 'সংবাদ কৌমুদী' (বাংলা), 'মিরাট-উল-আকবর' (পার্সী), 'জম-ই-জহন্নুমা' (উর্দু, পরবর্তীকালে পার্সী), বেঙ্গল হেরাল্ড (ইংরেজি, বাংলা, হিন্দুস্তানী, পার্সী) একদিকে যেমন সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সাথে তর্কসভা ও বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে এগুলির বিরুদ্ধে এক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল, অন্যদিকে সুসভ্য ইংরেজ জাতির গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও উন্নত জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভারতে অবস্থিত তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্য আন্দোলনও তিনি এ দেশে গড়ে তুলেছিলেন। সতীদাহ প্রথা রদ করার জন্য রামমোহন দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে যে প্রচার চালিয়েছিলেন তারই ফলে এবং প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ব্রিটিশ শাসকবর্গের একাংশের সহযোগিতায় অবশেষে ১৮৩২ সালে এই প্রথা সরকারিভাবে রদ করা হয়।

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের লড়াই তাঁর জীবনে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই। এই দীর্ঘ লড়াই-এর পথে তাঁকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শুধু ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কুৎসা ও নিন্দা রটনাই নয়। সমাজে যাঁরা সতীদাহ প্রথা রদের আইনকে সমর্থন করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধেও সমাজপতিরা ফতোয়া জারি করেছিল — তাঁদের সঙ্গে কেউ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে না, খাওয়া-দাওয়া করতে পারবে না। যারা করবে তাদেরকেও জাতিচ্যুত করা হবে। এই ছিল সমাজপতিদের ঘোষণা। এমনকী পরিস্থিতি এরকম হয়েছিল যে, রাস্তাঘাটে রামমোহনের নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে চলাফেরা

করতে হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পিছু হঠেন নি। কারণ তিনি ছিলেন সত্যের পূজারি।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "রামমোহন রায়ের ও অন্য গতি ছিল না — সত্য শিক্ষা তাঁহার অন্তরাত্মায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল — সমাজ তাঁহাকে যত লাঞ্ছনা, যত নির্যাতন করুক, তিনি সেই আলোক কোথায় গোপন করিবেন?"

শুধুমাত্র সতীদাহ প্রথা রদ করার ক্ষেত্রেই নয়, স্ত্রী-স্বাধীনতা, নরনারীর সমতা, নারীর মর্যাদাবোধ এবং পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে মেয়েদের সমানাধিকার— এ সব ক্ষেত্রেও যাতে উপযুক্ত আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার জন্যও তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাই রামমোহন হিন্দু বিধবার দুর্দশা দূর করার জন্য হিন্দুনারীর অধিকার সম্পর্কে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার বা স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর অধিকার নিয়ে যেমন চিন্তা করেছিলেন, তেমনি বহুবিবাহ প্রথারও তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। বহু বিবাহ ছাড়াও রামমোহন বাল্যবিবাহ, কন্যাদান বা কন্যা বিক্রয়, কৌলিন্য প্রথা প্রভৃতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক কুপ্রথার বিরোধিতা করেন। এছাড়াও মেয়েদের এমনকী বিধবা বিবাহের পক্ষেও মতামত ব্যক্ত করেন।

শুধু তাই নয়, জাতিভেদ প্রথার প্রশ্নেও রামমোহন এ সত্য উপলব্ধি করেন যে, এই দুরূহ সামাজিক ব্যাধি এ দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক স্বার্থকে প্রতিহত করছে, তাদের দেশীয় চেতনায় ও সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

এছাড়াও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের সুযোগ এবং শোষিত জনসাধারণের প্রতি অসীম সহানুভূতির বহু নিদর্শন আমরা বহু ঘটনার মধ্যে পাই। যেমন ১৮২৩ সালে জন অ্যাডাম সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য এক নতুন আদেশ জারি করেন। তাতে বলা হয় —

"এমন কোনও ব্যক্তি কোনও সংবাদপত্র প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলে প্রধান সেক্রেটারির স্বাক্ষরিত সকৌন্সিল গভর্নর জেনারেল-এর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।" রামমোহন গভর্নর জেনারেলের এই অর্ডিন্যান্স যাতে আইনে পরিণত না হয়, তার জন্য এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদন উপেক্ষা করে অর্ডিন্যান্সকে আইনে বিধিবদ্ধ করে। ফলে এই আইনের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছেও অ্যাপিল পাঠান। কিন্তু এই আবেদন সেখানেও অগ্রাহ্য হয়।

১৮২৭ সালের গোড়ার দিকে 'জুরি আইন' পাস হয়। এই আইনে বলা হয় কোনও হিন্দু বা মুসলমান জুরি দেশীয় বা বিদেশীয় কোনও খ্রীষ্টানের বিচার করতে পারবে না। কিন্তু খ্রীষ্টান জুরির ক্ষেত্রে এরকম কোনও বাধা-নিষেধ ছিল না। এই আইনে আরও বলা হয়েছিল যে, দেশীয় বিচারের ক্ষেত্রেও কোনও হিন্দু বা মুসলমানের 'গ্রাণ্ড জুরি'তে বসার কোনও অধিকার থাকবে না। এই আইনের বিরোধিতা করে জে ক্রফোর্ডকে তিনি একটি চিঠি পাঠান। সেই চিঠিতে তিনি বলেন — "যে সুসভ্য ইংরেজ জাতি স্বাধীনতার পক্ষপাতী ও জ্ঞান প্রচারের এত উৎসাহদাতা, ভারতবর্ষ অর্ধশতাব্দী তাহাদের দ্বারা শাসিত হইতেছে। কিন্তু তাহাদের মনোভাবের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া এবং তাহাদের কোনও মতামত জিজ্ঞাসা না করিয়া গভর্ণমেন্ট আইন ও বিধান প্রণয়ন করেন। সেইজন্য ইংরেজ শাসনে ভারতের কল্যাণ হইবে ভাবিয়া যাঁহারা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত, তাঁহাদের সহিত আমিও গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি।"

গণতান্ত্রিক অধিকার ও মূল্যবোধের প্রতি তিনি কতটা একাত্মতা অনুভব করতেন তা বোঝা যায় আন্তর্জাতিক নানা ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর উচ্ছাস ও মতামত প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি, নেপলস, ইতালি প্রভৃতি দেশে যখন জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার বইছিল তখন রামমোহন তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। আবার নেপলসের জনসাধারণ তাদের স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের কাছ থেকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি ও সংবিধান আদায়ের প্রতিশ্রুতি লাভের পর রাশিয়া, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া, সার্ডিনিয়া ও নেপলসের সম্রাটদের যৌথ উদ্যোগে এবং অস্ট্রিয়ার সৈন্যদের আক্রমণে যখন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরাভূত হয় তখন তাঁর মনের মধ্যে যে বেদনা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়, তার পরিচয় পাওয়া যায় মিঃ বাকিংহামকে লেখা এক চিঠিতে। তাতে

তিনি বলেন, "I consider the cause of the Nepolitons as my own and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be ultimately successful."

গণতান্ত্রিক চেতনার ও অধিকারের উপর তাঁর এতখানি আস্থা ছিল। তাই স্পেনীয় মুক্তিকামী জনসাধারণের বিজয়বার্তা শুনে একটি বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেন। ঠিক একইভাবে পর্তুগালে রাজতন্ত্রের সমর্থক ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকদের মধ্যে লড়াইয়ে সেখানকার লিবারেল পার্টির সাফল্যে এবং ১৮৩০ সালের ফরাসি বিপ্লবের বিজয়বার্তায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। আবার আয়ারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক অধিবাসীদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সংকীর্ণ ও উগ্র আচরণের প্রতিবাদ জানান। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের স্বীকৃতি স্বরূপ আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানটি তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত হয়।

এ দেশের শ্রমিক কৃষক আপামর জনসাধারণের জীবন জীবিকার প্রশ্নও তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের যে একতরফা সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তার ফলে চাষিদের দুর্দশা যে বহুগুণ বেড়ে গেছে, তা বুঝতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি। চাষিদের দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "যারা দেশের যে কোনও স্থানে চক্রাকারে একশ' মাইল ঘুরে দেখেছেন তারা জানেন যে, জমিদারদের শোষণের ফলে অন্য সমস্ত লোকের সম্পদ স্বাধীনতা বা জীবনধারণের সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই। জমিদাররা যে সুবিধা ভোগ করেন তার উৎস দুটি — (ক) যে সমস্ত পতিত জমিতে আগে ভূমি কর ছিল না তাতে চাষ শুরু ও কর আদায় এবং (খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তীকালে সাধারণভাবে জমির খাজনা বৃদ্ধি।" সে জন্যই ১৮৩১ সালে পার্লামেন্টারি কমিটির সামনে সাক্ষ্যে তিনি অভিমত দেন যে, কোনও অবস্থাতেই জমিদারকে খাজনা বৃদ্ধির অধিকার দেওয়া উচিত নয়। তিনি তাঁর বিখ্যাত রাজনৈতিক রচনা "Exposition of the practical operation of the Judicial and Revenue system of India'. বইটিতে সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানান, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— (ক) প্রজার কর লাঘব করা, (খ) জমিদারদের দেয় রাজস্ব কমানো, (গ) জমিতে প্রজাকে চিরস্থায়ী স্বত্ব দান করা, (ঘ) দেশরক্ষার ব্যয় কমানো এবং ভারতীয়দের উন্নতিকল্পে ব্যয়বহুল স্থায়ী সৈন্যদলের পরিবর্তে প্রজাদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা। শ্রমিকদের সমস্যা নিয়েও তিনি চিন্তাভাবনা করেছেন। তাঁর সময়ে এ দেশে খুব বড় কোনও শিল্প না গড়ে উঠলেও নুনের ব্যবসায় ভাল পরিমাণ অর্থলগ্নি করা হত। নুন তৈরির কাজে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শ্রমিক কাজ করত এবং নুনের ব্যবসায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার ছিল। ফলে এই শ্রমিকদের দুর্গতির সীমা ছিল না। এর বিরুদ্ধে রামমোহন জোরদার আন্দোলন শুরু করেন। যার ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে নুনের একচেটিয়া ব্যবসা চলে যায়, নুন সস্তা হয় এবং লক্ষাধিক মানুষ জীবনধারণের সুযোগ পায়।

বাংলা ভাষার উন্নতির ক্ষেত্রে রামমোহনের ভূমিকা দিয়েই এই আলোচনা শেষ করব। আমরা জানি, ভাষা চিন্তার বাহন। তাই যুগে যুগে যাঁরাই কোনও নতুন চিন্তাকে সমাজ মননে আনতে চেয়েছেন তাঁদেরকে ভাষার উন্নয়ন ঘটাতে হয়েছে। রামমোহনও তার ব্যতিক্রম নন। রামমোহনকেই আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী বললে ভুল বলা হবে না। বাংলা গদ্য এক হিসেবে রামমোহনেরই সৃষ্টি। বাংলা গদ্যের সেই আদি যুগে তিনি বাঙালিকে বাংলা 'পড়তে' ও 'লিখতে' শিখিয়েছেন। বাংলা গদ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন।" রামমোহনের গদ্যের দুটি গুণ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, একটি ভাষার সংহতি — অত্যন্ত অল্প কথায় অনেকখানি ভাব প্রকাশের ক্ষমতা, অন্যটি বাক্যবন্ধে যুক্তিক্রম অনুসরণ। বাংলা গদ্যের প্রচলন করার ক্ষেত্রে অন্যরা কেউ কেউ ভূমিকা পালন করেছেন। যেমন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বাংলা গদ্য রামমোহনের আগেই পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা গদ্যের সেই আদি যুগে প্রায় কেউই

রামমোহনের মতো মননশক্তি ও রচনাশক্তির অধিকারী ছিলেন না। রামমোহনের গদ্য রচনারও বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৮১৫-১৬ সালে তাঁর গদ্য রচনা এবং ১৮৩১-৩২ সালের গদ্য রচনা তুলনা করলে এই বিবর্তন সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। তাঁর রচনাশৈলীর আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সংযম। বিরোধীদের সাথে বিতর্কের সময় কোনও ব্যক্তিগত পক্ষপাত বা রাগ-উত্তেজনা প্রকাশ পায়নি। তিনি কখনও প্রতিপক্ষের মতো দুর্বাক্য বা কটূক্তি ব্যবহার করেন নি।

উপসংহার

এই হল রামমোহনের সুবিশাল কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, জীবনের সর্বশক্তি ব্যাপ্ত করে তিনি নবজাগরণের চিন্তাকে এদেশের বুকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করেছেন এবং শত সহস্র বছরের মধ্যযুগীয় অন্ধতার ঘনায়মান অন্ধকারের মাঝে প্রথম আলো জ্বেলেছিলেন। তিনি ধর্মীয় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি ঠিকই; কিন্তু শিক্ষা সংস্কার বা সামাজিক ক্রিয়াকর্মকে তিনি ধর্মীয় প্রভাব থেকে দূরে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর চলার পথে যুক্তির উপরই নির্ভর করেছিলেন, কোনও অন্ধবিশ্বাসের উপর নয়। তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডকে তিনি যুক্তিবাদের উপর দাঁড় করানোর সংগ্রাম করেছিলেন। তাই তিনিই হলেন আমাদের দেশে প্রথম রেনেশাঁ ব্যক্তিত্ব।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, হিন্দুত্ববাদীরা কেন রামমোহনের উপর খড়্গহস্ত। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে মূলধন করে সারা দেশের মানুষকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে চায়, তাদের কাছে রামমোহন তো চক্ষুশূল হবেনই। শুধু তাই নয়, রামমোহন জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণে বহুধা বিভক্ত সমাজে ঐক্যের আহ্বান এনেছিলেন। রামমোহনের এই ভূমিকাকে যথার্থ উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন —

"আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভকালেই এসেছেন রামমোহন রায়। এখন এ যুগকে কি বিদেশি কি স্বদেশি কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারেনি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলো প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন সেখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান কারো স্থান সংকীর্ণতা নেই। তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়; তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে, স্বীকৃতি আছে।"

রামমোহন কীভাবে এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কারণ তিনি জন্মেছিলেন এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন অসম্ভব গোঁড়া, ঈশ্বরবিশ্বাসী, মূর্তিপূজায় আসক্ত মানুষ। মা ছিলেন তার থেকে বেশি ধর্মভীরু, দেবদ্বিজে নিবেদিতপ্রাণ এবং গোঁড়া। ইংরেজি শিক্ষা এবং উদারমনস্ক ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে পাশ্চাত্যের নবজাগরণের চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে তিনি সামগ্রিকভাবে অন্ধতামুক্ত যুক্তিবাদী মনের অধিকারী হয়েছিলেন, এ কথা সত্য। কিন্তু শৈশবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন পৌত্তলিকতা-বিরোধী, নিরাকার স্রষ্টার উপাসক, নির্গুন ব্রহ্মে বিশ্বাসী মানুষ। ছোটবেলা থেকেই ছিল তাঁর প্রখর যুক্তিবাদী মন। এতে তাঁর বাবা কষ্ট পেতেন। মা মেনে নিতে পারতেন না ছেলের এই প্রথা-বহির্ভূত ধর্ম চেতনা। পরবর্তীকালে তাঁর মা এতই বিরূপ হয়েছিলেন যে, বাবার মৃত্যুর পর রামমোহন যখন পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হলেন, তখন কোম্পানির আদালত ও রাজার আদালত উভয়ের কাছেই ছেলের বিরুদ্ধে মামলা দাখিল করেন। যে ছেলেকে তিনি ধর্মদ্বেষী বলে মনে করতেন তাঁকে তিনি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে দেবেন না — এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প।

রামমোহনের মা তারিণী দেবী কোর্টে বিচারের সময় বলেছিলেন, "ধর্মত্যাগী পুত্রের মস্তক যদি এখানে ছিন্ন করা হয় তাহলে তা আমি অত্যন্ত পূণ্য কাজ বলে মনে করব।" কিন্তু আইন তো আর ধর্মের দোহাই দিয়ে চলে না। ছেলে মামলায় জয়ী হন। কিন্তু মামলায় জয়ী হওয়ার পর ছেলে তাঁর প্রাপ্ত সম্পত্তি মাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ, যাঁর যুদ্ধ মায়ের করা মামলার বিরুদ্ধে নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় গোঁড়ামি-কুসংস্কারের আকণ্ঠ

নিমজ্জিত সমাজের বিরুদ্ধে।

তাহলে রামমোহন কিশোর বয়স থেকেই এই মানসিক ধাঁচাটা পেলেন কীভাবে? অসম্ভব স্বাধীনচেতা ছিলেন বলেই রামমোহন ছোটবেলা থেকেই নিজের মতো করেই পড়াশুনা করেছেন, বহু ভাষা আয়ত্ত করেছেন। তাঁর ছিল একটা সত্যানুসন্ধানী মন। স্বজাতিকে পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রাথমিক প্রেরণা ছিল কোরাণ ও মহম্মদের বাণী। জ্ঞানী মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা তাঁর মনের উপর নতুন আলোকপাত করেছিল। রামমোহন তাঁদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে শুরু করলেন। ফলে তিনি তাঁর পরিবার, পরিজন ও সমাজ— সকলের বিরাগভাজন হলেন। আত্মরক্ষার জন্য কলকাতায় পালিয়ে এলেন। সেখানে তিনি মিশতে শুরু করলেন ইউরোপীয়দের সঙ্গে — উদার, প্রজ্ঞাদীপ্ত ইউরোপীয়রা তাঁর মনের যুক্তিশীল অনুধাবনকে আরও প্রসারিত করে দিলেন। হিন্দু দেশবাসীকে জাগরিত করার, তাদের মনের অন্ধকার দূর করার জন্য তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন।

তাই তিনি ইংরেজি বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করে বিবেক ও সরলতার আদেশে যে পথ অবলম্বন করেছি তাতে আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়গণের তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হতে হল। কিন্তু যাই হোক না কেন, আমি বিশ্বাসে ধীরভাবে সমস্ত কিছু সহ্য করতে পারি যে, একদিন আসবে, যখন আমার এই সামান্য চেষ্টা লোকে ন্যায়দৃষ্টিতে দেখবে।"

এইভাবে প্রখর যুক্তিবাদী ও দৃঢ়চেতা রামমোহন এদেশের বুকে নবজাগরণের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ধর্মীয় তমসার ঘন অন্ধকার ছেদ করে সেই আলো নতুন সূর্যোদয়ের নিশান নিয়ে এল। তাঁর বেদান্ত চর্চা যুক্তিবাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। ধর্মীয় প্রভাব থেকে সমাজমননকে মুক্ত করার পথে এটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। এই পথেই পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত চিন্তা বা পার্থিব মানবতাবাদের জন্ম দিয়েছিলেন। সেই কারণেই রামমোহনকে ভারতীয় নবজাগরণের ভগীরথ বলা যুক্তিসঙ্গত। □

তথ্যসূত্র ঃ

১। উনিশ শতকে নবজাগরণ — স্বরূপ সন্ধান — আলোক রায়

২। ভারতীয় রেনেসাঁ ও রামমোহন ঃ মানিক মুখোপাধ্যায়, পথিকৃৎ, ১৯৮৪

৩। ভারতীয় নবজাগরণ — সুকোমল দাসগুপ্ত

৪। রামমোহন রায় স্মরণ — মৃত্যু সার্ধশতবর্ষপূর্তি সংকলন ঃ রাজা রামমোহন স্মৃতিরক্ষা কমিটি

৫। ভারত পথিক রামমোহন রায় — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬। বাংলার আর্থিক ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী) — সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

৪। রামমোহন রায় — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতী, কার্তিক, ১৩০৩

মহান প্যারি কমিউন : সার্ধশতবর্ষপূর্তি

মৃদুল দাস

প্যারি কমিউন। ফ্রান্সের প্যারিসে ১৮৭১ সালে ১৮ মার্চ এই কমিউনের পত্তন হয়ে টিঁকে ছিল মাত্র ৭২ দিন। ইতিহাসের কালের বিচারে এ তো এক পলকও নয়। কিন্তু মানব সভ্যতার বিকাশের ধারায় এই কমিউন সম্পূর্ণ নতুন একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সৃষ্টি করে সমাজে একটা গভীর দাগ রেখে গেল। ইউরোপের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কমিউন-সৃষ্ট বিপুল এই আলোড়নের উল্লেখ করে মহামতি লেনিন বলেছেন, 'প্যারিসের কামানের বজ্রনির্ঘোষ সর্বহারা শ্রেণির সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশকে জাগিয়ে তুলেছিল গভীর সুপ্তি থেকে এবং সর্বত্র বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক প্রচারের কাজকে উদ্দীপ্ত করেছিল।' বাস্তবে প্যারি কমিউনের মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রথম শ্রমিকশ্রেণির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হল। আর এই নতুন ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতেই হতচকিত ফ্রান্সের বুর্জোয়াশ্রেণি প্রমাদ গুনল। আতঙ্কিত হয়ে উঠল ইউরোপের বুর্জোয়াশ্রেণি। নতুন এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে পরিণত হওয়ার কোনও রকম সুযোগ না দিয়ে ফ্রান্সের বুর্জোয়া শাসকরা অঙ্কুরেই প্যারি কমিউনের বীর যোদ্ধাদের উপর নামিয়ে আনল ভয়াবহ আক্রমণ, রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে ধ্বংস করল তাকে। এই বীর যোদ্ধাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধায় শিল্পী রেনোয়া বলেছেন, 'পাগল, ওরা সব বদ্ধ পাগল। কিন্তু কী মহৎ পাগলামি! এরা এই মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছিল!' সেই প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠার দেড়শো বছর পূর্ণ হয়েছে এবছর ১৮ মার্চ। নিপীড়িত মানুষের মুক্তি-পথের সন্ধানী মানুষ আজও স্মরণ করে প্যারি কমিউনকে। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে শোষকদের হাত থেকে কমিউনকে রক্ষার প্রচেষ্টায় নিবেদিত প্রাণ বীর যোদ্ধা কমিউনার্ডদেরকে।

কেমন ছিল নতুন সমাজ-ব্যবস্থার বিদ্যুৎ-রেখা সেই কমিউনের রূপ, কীভাবে তার সৃষ্টি, কী ছিল তার নতুনত্ব এবং কেন তা ধবংস করা হল — আমাদের তা জানতে হবে। কারণ, আমরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার যে রূপ প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে প্রত্যক্ষ করছি, তাতে আশার আলো কিছু নেই। চারিদিকে হাহাকার, ক্ষুধা, মৃত্যুযন্ত্রণা, কর্মহীনতা, ব্যাভিচার, লাম্পট্য, দুর্নীতিতে ছেয়ে থাকা সমাজে অন্ধকার ছাড়া আর যেন কিছু নেই। আছে বিপুল সম্পদের পাহাড়, কিন্তু তা সমাজের নয়। মুষ্টিমেয়'র ব্যক্তি-মালিকানায় তা আরও স্ফীত হয়ে চলেছে, আরও প্রকট করে তুলেছে বৈষম্যের তীব্রতাকে। এই অন্ধকারে আলোর ঠিকানা যাতে কেউ পেতে না পারে তার জন্য রয়েছে বিবেক মনুষ্যত্ব নৈতিকতাকে ধবংস করার বিপুল আয়োজন। তার মধ্যেও মানুষের হাহাকার দেখে বিবেক জেগে উঠলে তা নিয়ে উচ্চারণ করার নেই কোনও অধিকার। হৃদয়হীন, সংবেদনহীন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তার টুঁটি টিপে ধরতে উদ্যত। এমনটা চলতে দিতে না চাইলে, এই দমবন্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি-পথের সন্ধান পেতে চাইলে প্যারি কমিউনের ইতিহাস আমাদের জানতে হবে, শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে তার সাফল্য-ব্যর্থতা থেকে।

পূর্বক্ষণ

১৭৮৯ সালের 'ফরাসি বিপ্লব' যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার ঢেউ ফ্রান্সে বার বার ফিরে ফিরে এসেছিল। জনতার দাবি নিয়ে বার বার উত্তাল হয়েছে ফ্রান্স। ১৮০০ সালে প্রথম প্রজাতন্ত্রের পতন, নেপোলিয়ানের উত্থান-পতন, ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লব, ১৮৪৮ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, জুন অভ্যুত্থান,

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের অপমৃত্যু এবং নানা আন্দোলনের জয়-পরাজয়ের চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে ফ্রান্স পৌঁছে গিয়েছিল ১৮৭০ সালে। দীর্ঘ ৮০ বছর ধরে এতগুলি লড়াইয়ের পর্যায় পার হওয়া ফ্রান্সের এই উত্থান-পতনের বিশ্লেষণ করে এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ফ্রান্সেই ঐতিহাসিক শ্রেণি সংগ্রাম প্রতিবারই চূড়ান্ত পরিণতিতে এসে উপনীত হয়েছে এবং তার ফলে যে সব পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক রূপের মধ্যে এই শ্রেণি সংগ্রাম বিকাশ লাভ করেছে এবং তার ফলাফল ব্যক্ত হয়েছে, ফ্রান্সেই সেই রাজনৈতিক রূপগুলি স্পষ্ট রেখায় ফুটে উঠেছে। ... ফ্রান্সই মহাবিপ্লবে সামন্ততন্ত্রকে বিধ্বস্ত করে বুর্জোয়া শ্রেণির অবিমিশ্র আধিপত্য এমন বিশুদ্ধ রূপে প্রতিষ্ঠা করে যে ইউরোপের অন্য কোনও দেশে তার তুলনা মেলে না। এখানেই আবার শাসক বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সচেষ্ট শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম এমন তীব্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে যে, অন্য কোথাও তেমনটি আর দেখা যায়নি।"

ফ্রান্সের বুর্জোয়ারা তখন ইউরোপে শিল্পসমৃদ্ধ শক্তিধর হয়ে উঠছে। এই প্রেক্ষাপটে বুর্জোয়াদের মুনাফা-ক্ষুধা মেটানোর জন্য দেশের শ্রমিকশ্রেণির উপর বঞ্চনার তীব্রতা বৃদ্ধি, অন্যদিকে প্রতিবেশী ইউরোপীয় দেশগুলিতে আধিপত্য বৃদ্ধির বুর্জোয়া আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা কর্তব্য হয়ে উঠল শাসক তৃতীয় নেপোলিয়ানের।

ফ্রান্সের পুঁজিপতিদের আধিপত্য বিস্তারের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের বাধা হয়ে দাঁড়াল প্রুশিয়া। প্রুশিয়ার বুর্জোয়াদের আকাঙ্ক্ষাও একই — আধিপত্য বিস্তার। বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রুশিয়া তখন জার্মান একীকরণের কাজ শুরু করেছে। ইউরোপে কর্তৃত্বকারী ভূমিকা নিতে হলে নেপোলিয়ানের তখন জার্মানির কর্তৃত্বের অবসান ঘটাতে হবে এবং সেক্ষেত্রে যুদ্ধ না করে কোনো উপায় নেই।

নেপোলিয়ান প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে জাতিবাদী জিগির তুলে যুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। অতীতের এক সময়কার ফ্রান্সের সীমানা অনুযায়ী রাইন নদীর বাঁদিকের ভূখণ্ড তার চাই। তার এই রাজ্যগ্রাসী পরিকল্পনার সমর্থনে ১৮৭০ সালের ১৫ জুলাই পুলিশের সহায়তায় নেপোলিয়ানপন্থীরা প্যারিসে একটি উগ্র জাতিবাদী শোভাযাত্রাও বের করল। পরদিন, ১৬ জুলাই ফ্রান্সের পার্লামেন্টে নেপোলিয়নের যুদ্ধ প্রস্তাব অনুমোদিত হল।

ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার যুদ্ধ

এই যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণি। আন্তর্জাতিকের প্যারিসস্থ সদস্যরা ১২ জুলাই 'রেভেইল' পত্রিকায় 'সকল জাতির শ্রমিকদের প্রতি' শিরোনামে এক ইস্তেহারে বলে — "ইউরোপীয় শক্তি-সাম্য রক্ষার অছিলায়, জাতীয় সম্মান রক্ষার অছিলায় বিশ্বশান্তি আরেকবার রাজনৈতিক দুরাকাঙ্ক্ষায় বিপন্ন। ফরাসি, জার্মান, স্পেনীয় শ্রমিক! আসুন আমরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েই একযোগে ধিক্কার দিই যুদ্ধকে। রাষ্ট্র প্রাধান্য বা রাজবংশগত অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধ শ্রমিকদের চোখে এক অপরাধী উদ্ভটত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। ... সর্বসাধারণের দুর্দশায় নতুন ফাটকা খেলার সুযোগ দেখে যারা সব যুদ্ধমুখী ঘোষণা করছে, তাদের প্রতিবাদ করছি আমরা। আমরা চাই শান্তি, কাজ ও মুক্তি। ... জার্মানির ভাইয়েরা! আমরা বিভক্ত হয়ে পড়লে স্বৈরাচারের পরিপূর্ণ বিজয় ঘটবে রাইন নদীর উভয় তীরেই। ... শ্রমজীবী আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য আমরা কোনও সীমানাই মানি না; অবিচ্ছেদ্য সংহতির শপথ স্বরূপ তোমাদের কাছে আমরা পাঠালাম ফরাসি শ্রমিকদের শুভেচ্ছা ও সেলাম।" আন্তর্জাতিকের বার্লিন শাখা প্যারিসের শ্রমিকদের এই বার্তায় সাড়া দিয়ে বলে, "আমরা মনে-প্রাণে আপনাদের প্রতিবাদে যোগ দিচ্ছি ... সগাম্ভীর্যে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সকল দেশের শ্রমের সন্তানদের মিলিত করার সাধারণ কর্তব্য থেকে কোনও রণদুন্দুভিই, কোনও কামান-গর্জনই, কোনও জয়, কোনও পরাজয় আমাদের বিচ্যুত করতে পারবে না।" একই ভাবে জার্মানির ব্রুনসভিক শহরেও বিশাল শ্রমিক সমাবেশ থেকে যুদ্ধের বিরোধিতা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। খেমনিৎস শহরে শ্রমিক-সভায় বলা হয় যে, "সকল দেশের শ্রমিকরাই আমাদের মিত্র আর সকল দেশের স্বৈরাচারীরাই আমাদের শত্রু।"

শ্রমিকরা যখন এইভাবে নানাজাতির শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের বার্তা দিচ্ছে, শ্রমিকদের শান্তি প্রচেষ্টাকে

নস্যাৎ করে পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে ১৯ জুলাই ফ্রান্স শুরু করল প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ২ আগস্ট নেপোলিয়নের বাহিনী জার্মানির সীমান্ত অতিক্রম করলে জার্মান বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে। তীব্র পাল্টা আক্রমণের ধাক্কায় ফ্রান্সের বাহিনী ছত্রখান হয়ে যায় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই আলসেস ও লোরেন প্রদেশ দু'টি চলে যায় জার্মানির হাতে। নানা ফ্রন্টে পর পর চলতে থাকে পরাজয়ের ধারা। সবশেষে ২ সেপ্টেম্বর সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্সের বাহিনীর চরম পরাজয় হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রুশিয়ার হাতে বন্দি হয় এবং ফ্রান্সে নেপোলিয়ন যুগের অবসান হয়।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

নেপোলিয়ানহীন ফ্রান্সের জনগণ ১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সকে একটা প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করল। বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি থিয়ের ও তাঁর জেনারেল ত্রশ্যু এই প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা দখল করে বসল। কে এই থিয়ের? ইনি সেই ব্যক্তি যিনি ১৮৩০ সালের অভ্যুত্থানের পর প্রজাতন্ত্র-বিরোধী বুর্জোয়া রাজতন্ত্রী লুই ফিলিপের মন্ত্রীসভায় স্থান করে নিয়েছিলেন। ইনিই ১৮৪০ সালে মন্ত্রীসভার প্রধান রূপে একনিষ্ঠভাবে ফ্রান্সের বৃহৎ বুর্জোয়াদের সেবা করেছেন। কার্ল মার্কস এই থিয়েরের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, "কিম্ভূত বামন এই থিয়ের প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ফ্রান্সের বুর্জোয়াদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন, কারণ তিনি হলেন তাদের শ্রেণি কলুষের সবচেয়ে সম্পূর্ণ প্রকাশ। রাষ্ট্রনেতা হবার আগে ঐতিহাসিকরূপে তিনি নিজের মিথ্যাভাষণ শক্তির প্রমাণ দেন। তার রাজনৈতিক জীবনের ইতিবৃত্ত হল ফ্রান্সের দুর্ভাগ্যের ঘটনাপঞ্জী। ... থিয়ের একনিষ্ঠ ছিলেন কেবল ধন-লালসায় এবং সম্পদ যারা উৎপাদন করে তাদের প্রতি ঘৃণায়। লুই ফিলিপের অধীনে প্রথম মন্ত্রীত্ব পদে যখন তিনি প্রবেশ করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন জোবের মতো দরিদ্র; যখন সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তিনি লক্ষপতি। ... ছোটখাট রাষ্ট্রিক শয়তানিতে সেয়ানা, মিথ্যাভাষণ ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে সুনিপুণ, পার্লামেন্টে দলগত লড়াইয়ের তুচ্ছ কলাকৌশলী, ধূর্ত কুচক্র ও হীন প্রতারণায় ওস্তাদ; মন্ত্রীত্ব হারালেই বিপ্লবকে খুঁচিয়ে তুলতে, আবার রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ফিরে পেলেই রক্তগঙ্গা বইয়ে তাকে দমন করতে যার চক্ষুলজ্জা নেই; ভাবনার বদলে শ্রেণি সংস্কার, হৃদয়ের জায়গায় আত্মম্ভরিতা; রাজনৈতিক জীবন যেমন ঘৃণ্য, ব্যক্তিগত জীবনও তেমনই কলঙ্কময়।" এহেন থিয়ের ফ্রান্সের জনগণের সাথে কী রকম বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

ফ্রান্সের বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সামনে তখন সমস্যা হল, প্যারিসের দিকে ধেয়ে আসা প্রুশিয়ার বাহিনীকে প্রতিরোধ করা। অথচ প্রুশিয়াকে প্রতিরোধ করার মতো সৈন্য ও অস্ত্রবল তখন ফ্রান্সের নেই। তাই প্যারিসকে রক্ষা করতে গেলে সেখানকার শ্রমিককে, জনসাধারণকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করতে হবে, এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। এদিকে প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণি যেমন জুলাই মাসে প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে নেপোলিয়ানের যুদ্ধ-উন্মাদনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে দুই দেশের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও সৌহার্দ্যের বার্তা দিয়েছিল, তেমনি বিসমার্কের হাতে নেপোলিয়ান পরাজিত হবার ঠিক পরেই ৫ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের দিকে ধেয়ে আসা আগ্রাসী প্রুশিয়ান বাহিনীর ফ্রান্সের এলাকা দখলের বিরুদ্ধে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ইস্তেহারে বলেছিল, "আমরা আলসাস ও লোরেন গ্রাসের প্রতিবাদ করছি। আমরা জানি যে আমরা জার্মান শ্রমিকশ্রেণির নামেই কথা বলছি। ফ্রান্স ও জার্মানি উভয়ের স্বার্থে, শান্তি ও মুক্তির স্বার্থে, পূর্বীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে পশ্চিমী সভ্যতার স্বার্থে, জার্মান শ্রমিকেরা আলসাস ও লোরেন দখল চুপ করে বরদাস্ত করবে না ... প্রলেতারিয়েতের সাধারণ আন্তর্জাতিক আদর্শে আমরা সকল দেশের শ্রমিক ভাইদের পাশে বিশ্বস্ত হয়ে দাঁড়াব।" এই সময়, ৯ সেপ্টেম্বর, মার্কসও প্যারিসের শ্রমজীবী জনগণকে সতর্ক করে পরিষ্কার পথনির্দেশ দিয়ে বললেন, "ফরাসি শ্রমিকশ্রেণি চলেছে চরম দুরূহ অবস্থার মধ্য দিয়ে। যখন শত্রু প্রায় প্যারিসের দরজায় ঘা দিচ্ছে, এই সংকটকালে এই সরকারকে উল্টে দেবার কোনও চেষ্টা হলে তা হবে চরম মূঢ়তা। নাগরিক হিসাবে তাদের যা কর্তব্য, ফরাসি শ্রমিকদের তা সম্পাদন করতেই হবে। সেই সঙ্গে তাদের ... ... কর্তব্য হল ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা। প্রজাতান্ত্রিক

স্বাধীনতার যেসব সুযোগ-সুবিধা আছে, শান্ত ও দৃঢ়চিত্তে সেগুলি তারা ব্যবহার করে শ্রেণি সংগঠনের কাজে যেন তারা তা কাজে লাগায়। তাতে তারা পাবে ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন ও আমাদের সাধারণ কর্তব্য শ্রমের মুক্তি সাধনের জন্য বিপুল শক্তি।"

এই জরুরি পরিস্থিতিতে প্যারিসের জনগণ প্রাক্তন প্রতিনিধিদের নিয়ে 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার' গঠিত হতে দিয়েছিল। আর দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে কাঁধে বন্দুক তুলে নিতে সক্ষম প্যারিস শহরের প্রায় প্রতিটি মানুষ 'জাতীয় রক্ষী বাহিনী'তে নাম লিখিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হল, যেখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষীই এসেছিল শ্রমিকশ্রেণির থেকেই। ফলে, একদিকে বুর্জোয়া সরকার এবং অন্যদিকে সশস্ত্র শ্রমিক প্রতিরক্ষা বাহিনী তৈরি হওয়ার পরেই তাদের মধ্যকার বিরোধ তীব্র হয়ে উঠল। তাই জাতীয় সরকার গঠনের পর কয়েকদিন না যেতেই বিপ্লবভীত ফ্রান্সের বুর্জোয়ারা সিদ্ধান্ত নিল, কোনও মতেই প্যারিসের শ্রমিকদের সশস্ত্র রাখা চলবে না, বরং ওদের হাতে যে অস্ত্র আছে তা কেড়ে নিতে হবে। তার জন্য যে কোনও মূল্যে প্রুশিয়ার সাথে একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে। তাহলেই বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে। ষড়যন্ত্রের এক একজন পাণ্ডাকে বসানো হল প্যারিসের গভর্নর, পুলিশ কর্তা, জাতীয় রক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক, নানা দেশে রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি পদে।

প্যারিসের সশস্ত্র শ্রমিক বাহিনীর অস্তিত্বের বিপদ উপলব্ধি করতে প্রুশিয়ার চ্যান্সেলর বিসমার্কেরও অসুবিধা হল না। সহজেই বিসমার্ক বুঝতে পারলেন প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণি যদি ক্ষমতার দখল নিয়ে নেয় তাহলে বিপদ শুধু ফ্রান্সের বুর্জোয়াদের নয়, বিপদ জার্মান বুর্জোয়াদেরও। কারণ সেখানেও শ্রমিকশ্রেণি মালিকদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়ছে। এই শ্রেণি-অনুভূতি দুই দেশের বুর্জোয়াদের মিলিয়ে দিল। সেদান এবং মেৎসে অঞ্চলে যুদ্ধে বন্দী নেপোলিয়ানের সৈন্যদের বিসমার্কের বিশেষ অনুমোদনে মুক্তি দিয়ে তুলে দেওয়া হল থিয়েরের হাতে, যাতে থিয়ের এদের প্যারিসের শ্রমিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই থিয়ের বা অন্য বুর্জোয়া নেতারা চেষ্টা করছিল যাতে প্যারিসের সশস্ত্র শ্রমিকরা প্রুশিয়ার বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই কাজটি তারা করেছে খুবই সন্তর্পনে। প্রথমে তারা চেয়েছে প্রুশিয় সৈন্যদের দিয়ে প্যারিস দখলের মাধ্যমে প্যারিসকে দমন করাতে। কিন্তু বুদ্ধিমান বিসমার্ক প্যারিসের জনগণের প্রতিরোধের প্রকৃতি দেখে এই প্রচেষ্টায় রাজি হননি। তখন এই বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকেরা বিসমার্কের অনুমোদন নিয়ে বিসমার্কের হাতে বন্দীদের সাথে মিলিত হয়ে চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে, জাতীয় সম্মান বিসর্জন দিয়ে সরাসরি আত্মনিয়োগ করল প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণিকে উৎখাত করার কাজে। সেই লক্ষ্যেই পরিকল্পনা ও কাজ শুরু করল ফ্রান্সের থিয়ের সরকার। ইতিমধ্যে কতগুলি সিদ্ধান্ত নিল থিয়ের। প্যারিস থেকে জাতীয় সভা স্থানান্তরিত করল ভার্সাই শহরে। প্রকাশনা সংস্থা ও প্রজাতন্ত্রী পত্রিকাগুলির উপর চাপানো হল নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা।

বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও প্যারিসের শ্রমিকরা অসীম বীরত্বের সাথে লড়াই করে প্রুশিয়ার সেনাদের দ্বারা অবরুদ্ধ প্যারিসকে মুক্ত রেখেছিল। ১৮৭০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে দীর্ঘ পাঁচমাস ধরে প্রুশিয়ার সেনাবাহিনী প্যারিসকে অবরুদ্ধ করে রাখলেও প্যারিস আত্মসমর্পন করেনি। তাদের অস্ত্রগুলির মধ্যে প্রধান ছিল কামান আর বন্দুক। এই কামানগুলি জনতার কাছ থেকে চাঁদা তুলে কেনা হয়েছিল। কিন্তু থিয়ের ঘোষণা করল, প্যারিসের জাতীয় রক্ষী বাহিনীর কামানাদি রাষ্ট্রের সম্পত্তি, তাই তা রাষ্ট্রকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এর উদ্দেশ্য ছিল প্যারিসকে নিরস্ত্র করা। তারপর তাকে রক্তগঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া। অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করল প্যারিসের শ্রমিকরা। তারা স্বাধীনতা হারাতে চাইল না। দৃঢ় প্রত্যয়ে ও অসীম মনোবল নিয়ে তারা এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে লাগল। লড়াইয়ের মোড় ঘুরে গেল থিয়েরের বাহিনী বনাম প্যারিসের সশস্ত্র সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে। পুরো মাত্রায় শুরু হল ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ।

প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠা ও তার কাজ

১৮ মার্চ ভোর তিনটায় থিয়েরের বাহিনী ঘুমন্ত প্যারিসকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে শহরে প্রবেশ করল। লাইনের সৈন্যদের তিনি আদেশ দিলেন 'জাতীয়

রক্ষীবাহিনী'র নিজস্ব কামানগুলির দখল নিতে। ঘোষণা করল প্যারিসে এতদিন অস্ত্র হাতে রাখা আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ কারীরা আত্মসমর্পণ করুক। বাস্তবে প্যারিসের জনগণের উপর এই সংগ্রাম চাপিয়ে দিল ভার্সাই সরকার। প্যারিসের শ্রমিক জনগণের প্রতিরোধ ভেঙে দিতে সফল হবে ভেবে তারা আগেভাগেই বিজয় ঘোষণার বিবৃতিও ছাপিয়ে রেখেছিল। তারা ভেবেছিল জাতীয় রক্ষী বাহিনীর তিরিশ হাজার সদস্য বোধহয় থিয়ের সরকারের পেছনে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু সেই রক্ষী বাহিনীর তিরিশ হাজার সেনার মধ্যে মাত্র তিনশ সেনা যোগ দিল থিয়েরের সাথে। অন্যেরা রয়ে গেল শ্রমিক বাহিনীর সাথে। ঘরের মেয়ে বৌ-রা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে নেমে এসেছিলেন পথে। ৮৮ নং ব্যাটেলিয়ানের সৈন্য ও জাতীয় রক্ষী বাহিনীর মাঝখানে মহিলারা 'মানব ব্যাড়িকেড' তৈরি করেছিলেন। থিয়ের-বাহিনী কল্পনাও করতে পারেনি যে জনশক্তির সংগঠিত রূপ এমন তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। অবশ্য এই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তাদের মূল্য দিতে হয়েছে অসংখ্য জীবনের বিনিময়ে। শুধু প্যারিস-রক্ষায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা নয়, প্যারিসের সেই জনশক্তি একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করল থিয়েরের বাহিনীকে। লড়াকু মহিলা লুইজি মিচেল একে বলেছেন 'মুক্তির উজ্জ্বল প্রভাত'। প্যারিস মুক্ত হল, শ্রমজীবী মানুষের গৌরবমণ্ডিত বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা হল প্যারি কমিউন।

১৯শে মার্চ জাতীয় রক্ষী বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি জনগণের উদ্দেশে এক আহ্বানে বলল — প্যারিসের জনগণ তাদের উপর চাপানো শৃঙ্খল ছিন্ন করে ফেলেছে। কেন্দ্রীয় কমিটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করে জনপ্রতিনিধিদের হাতে শাসন ভার তুলে দিতে চায়। তারা ঘোষণা করল জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন হবে ২৬শে মার্চ। কেন্দ্রীয় কমিটি ২৬ মার্চের ভোটকে বৈধতা দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে কমিউন পরিচালনার ভার তুলে দিল।

জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে কমিউন একটির পর একটি সিদ্ধান্ত নিতে লাগল। স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বদলে শ্রমিকদের সংখ্যাধিক্যে গঠিত 'জাতীয় রক্ষী বাহিনী' প্রতিষ্ঠার দরুণই প্যারিসের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। এই বাস্তব ঘটনাটিকে প্রথায় রূপায়িত করে কমিউন প্রথম আদেশ দিল, স্থায়ী সৈন্যদলের অবলুপ্তি ঘটিয়ে তার স্থানে 'সশস্ত্র জনবল' প্রতিষ্ঠা' করা হবে। বুর্জোয়া পার্লামেন্ট বা আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শুধু আইন প্রণয়ন করে। তা কার্যকর করার দায়িত্ব তাদের নয়, তা কার্যকর করে প্রশাসন, পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থা। কিন্তু শুধু পার্লামেন্টারি সংস্থা না হয়ে কমিউন হল একটি কাজেরও সংস্থা — একই সঙ্গে কার্যনির্বাহক ও আইন প্রণয়নকারী। প্রশাসন ও পুলিশের কর্মকর্তারা দায়বদ্ধ থাকতে হবে কমিউনের কাছে। বড় আমলাদের মাতব্বরির প্রথা অবলুপ্ত করার সাথে সাথে তাদের কায়েমী স্বত্ব ও ভাতা বিলুপ্ত করা হল। শুধু পৌর শাসন নয়, রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত উদ্যোগই অর্পিত হল কমিউনের হাতে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের কবল থেকে মুক্ত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হল অবৈতনিক শিক্ষালাভের জন্য। এর ফলে শিক্ষা সকলের আওতায় এল এবং শ্রেণিগত কুসংস্কার ও সরকারি শক্তির শৃঙ্খল থেকে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উঠল বিজ্ঞান। শোষিত জনগণকে পুরোহিত-শক্তির দ্বারা 'আধ্যাত্মিক বলে' বশে রাখার ব্যবস্থা চূর্ণ করা হল গির্জার সঙ্গে সরকারের সম্বন্ধ ছিন্ন করে। সমাজের অন্যান্য কর্মচারিদের মতোই ম্যাজিস্ট্রেট, ও জজেরাও হয়ে উঠল নির্বাচিত ও কাজে সফল না হলে প্রত্যাহার্য। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল — নির্বাচিত হওয়ার পর জনসাধারণের জন্য অবশ্য করণীয় কর্তব্য জনপ্রতিনিধিদের পালন করতে হবে এবং সেই কর্তব্য না পালন করলে তাদের যে কোনও সময়ে ফিরিয়ে আনার অধিকার জনগণের থাকবে।

কমিউনের কাজের এই চরিত্র দেখে মার্কস বললেন, "কমিউনের কাজ আর সক্রিয় অস্তিত্বটাই হল তার শ্রেষ্ঠ সামাজিক কীর্তি। তার বিশেষ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কেবল জনগণ কর্তৃক জনগণকে শাসনের প্রবণতা।" এঙ্গেলসও বলেছিলেন, "... প্যারিসের আন্দোলনের শ্রেণি চরিত্রটি তীক্ষ্ণভাবে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হতে থাকে ১৮ মার্চ থেকে। যেহেতু কমিউনের সভায় বসত হয় খাঁটি শ্রমিকরা, না হয় শ্রমিকদের স্বীকৃত প্রতিনিধিরা, সেহেতু তার সিদ্ধান্তগুলিতেও প্রলেতারীয় চরিত্রটি সুপরিস্ফূট। ... কমিউন জারি করল এমন সব হুকুম যেগুলি সরাসরি শ্রমিকশ্রেণিরই প্রত্যক্ষ স্বার্থে, সমাজের

প্রাচীন ব্যবস্থাতে যেগুলি কিছুটা গভীর ঘা দেয়।"

এতদিন পর্যন্ত মালিকরা নিজেরাই ছিল আইন রচয়িতা, বিচারকর্তা, শাস্তিদাতা এবং শ্রমিকের মজুরির আত্মসাৎকারী। নানা অজুহাতে শ্রমিকের ঘাড়ে জরিমানা চাপিয়ে মজুরি কেটে নেওয়া, রুটির কারিগরদের সারা রাত কাজ করানো, যখন তখন কারখানা বন্ধ করে দেওয়া ছিল মালিকী-রেওয়াজ। কমিউন রুটির কারিগরদের রাতের শিফ্‌টের অবসান ঘটালো, শ্রমিকের ঘাড়ে জরিমানা চাপানো দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করল। বড় পদে চাকুরের সাথে দক্ষ শ্রমিকের বিপুল বেতন-বৈষম্যের অবসান ঘটালো কমিউন। ১৮৭০ সালের অক্টোবর থেকে পরের বছরের এপ্রিল পর্যন্ত অবরোধে দুর্দশাগ্রস্ত সময়কালের সব বসতবাড়ির ভাড়া কমিউন মকুব করে দিল। বন্ধ করে দেওয়া কারখানা শ্রমজীবী সমিতির হাতে পরিচালনার জন্য সমর্পণ করা হল। কমিউন প্যারিসের শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্বের একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে ইতিহাসে প্রথম শ্রমিকশ্রেণিকে শাসন পরিচালনায় উন্নীত করল।

পূর্ববর্তী শাসকদের দ্বারা বিচারের নামে যে গিলোটিনে মানুষকে হত্যা করা হতো, সেই গিলোটিন নিয়ে এসে বিপুল উল্লাসে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হল। ভাঁদোম ময়দানে স্থিত উগ্র জাতিবাদ ও জাতি বৈরিতার প্রতীক বিজয়-স্তম্ভটি ধবংস করা হল ১৬ মে তারিখে।

কমিউনের চারপাশ ঘিরে ছিল কৃষক জনতা। গ্রাম-শহরের বুর্জোয়াদের দ্বারা নিষ্পেষিত, নিপীড়িত কৃষকদের কাছে মুক্তির আশ্বাস নিয়ে গেল কমিউন। মার্কস বলেছেন, "কমিউন পারত বুর্জোয়া স্বৈরাচার থেকে কৃষকদের মুক্ত করতে, পারত তাদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে আধুনিক শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে এবং সর্বোপরি পারত কৃষকদের নিজের পায়ে দাঁড় করাতে। কমিউনের শাসন ফ্রান্সের কৃষক জীবনে এই উন্নতি ডেকে আনতে পারত। কিন্তু কমিউনের আবির্ভাবে গ্রামের বুর্জোয়ারাও ছিল ভীত সন্ত্রস্ত। তারা বুঝতে পেরেছিল, কমিউনের শাসন তাদের বিরুদ্ধে কৃষকসমাজ ও গ্রামের সর্বহারাদের অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দিতে পারে। অচিরেই তারা শহরের সর্বহারাদের নিজেদের নেতা বলে মেনে নেবে। এই কারণে তারাও কমিউনের বিরোধিতা করতে লাগলো প্রাণপণ।"

প্যারি কমিউন যখন এইভাবে একটার পর একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে লাগল তার প্রভাব পড়ল ফ্রান্সের অন্যান্য শহরে। ১৮ মার্চের কয়েকদিন পরেই কমিউন ঘোষণার লক্ষ্য নিয়ে লিয়োঁ এবং মার্সেই-তে গণ-অভ্যুত্থান হল, যদিও সেই গণঅভ্যুত্থান নির্মমভাবে দমন করা হল। এই জনজাগৃতি দেখে ফরাসি বুর্জোয়াশ্রেণি ভয়ে কাঁপছিল — এই বুঝি সমগ্র ফ্রান্স 'কমিউনপন্থীদের' হাতে চলে যায়। কৃষক-জাগৃতির লক্ষণ দেখে বুর্জোয়ারা আরও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এই রকম পরিস্থিতিতে থিয়ের সরকার এমন ভাব করতে লাগল, যেন তারা শান্তি চায়, এমনকি প্রয়োজনে তারা কমিউনের সাথে আলোচনায় বসতেও প্রস্তুত।

কমিউন ধবংসের গভীর চক্রান্ত

১৮ মার্চ কমিউন সৃষ্টির পর থেকেই বুর্জোয়ারা নিজেদের শক্তি সংহত করে কমিউনকে ধ্বংস করার আয়োজন করতে লাগল। ৭ এপ্রিল প্যারিসের পশ্চিম রণাঙ্গনে নিউলি-তে শেন নদীর খেয়াঘাট দখল নেয় ভার্সাই সেনাদল। ১১ এপ্রিল দক্ষিণ রণাঙ্গনে ঘটে আক্রমণ। তখন থেকেই থিয়ের-বাহিনীর প্যারিসের উপর অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ চলছিলই। উপর্যুপরি এইসব আক্রমণের ফলে ১৯ এপ্রিল কমিউন এক ঘোষণাপত্রে বলল— "প্যারিসকে আবার যন্ত্রনাদায়ক অবরোধের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ওরা বোমা বর্ষণের আয়োজন করছে। এর ফলে আমাদের ভাইয়েদের রক্ত ঝরবে, রক্ত ঝরবে আমাদের সন্তানদের, মা-বোনেদের। এই হল আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকবার সময়। ... আবার প্যারিস সমস্ত ফ্রান্সের জন্য দুঃখ বরণ করছে। দুঃখ বরণ করছে তার নৈতিক, বৌদ্ধিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য।"

কিন্তু ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা বললেও কমিউনের ভেতরের সকল সদস্য শ্রমিকশ্রেণির চিন্তা নিয়ে চলতেন না। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন দোদুল্যমান। জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ব্ল্যাঙ্কিপন্থী ও প্রুধোঁপন্থী নৈরাজ্যবাদী। বুর্জোয়া ও অভিজাতরা ছিল কমিউন-বিরোধী। থিয়েরের গুপ্তচররা ছেয়ে যাচ্ছিল প্যারিসে দিকে দিকে। কমিউনের রক্ষা-প্রচেষ্টাকে থিয়ের

আখ্যা দিতেন ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র' বলে। ২৭ এপ্রিল এক সভামঞ্চ থেকে থিয়ের ঘোষণা করলেন — প্যারিসে আয়োজিত ষড়যন্ত্র ছাড়া তার নেতৃত্বে পরিচালিত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্য কোথাও কোনও চক্রান্তের অস্তিত্ব নেই। এর জন্য তারা ফরাসি রক্ত ক্ষয় করতে বাধ্য হচ্ছে। অস্ত্রধারীদের হাত থেকে এসব পাপঅস্ত্র খসে পড়লেই মাত্র গুটিকয়েক অপরাধী ছাড়া আর সবার জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। এই আসন্ন আক্রমণের বিপদ বুঝে কমিউন নিজেকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করল।

প্যারিস ও ভার্সাই-এর মধ্যে এই সংগ্রাম যে কোনও বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে শেষ হবে না তা নিয়ে কমিউনার্ডদের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। আর প্যারিসের এই সংগ্রাম যে শুধুমাত্র ভার্সাই-এর বিরুদ্ধে নয়, বরং সমগ্র ইউরোপের বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধে, তাও অনেকে বুঝতে পারছিল।

যে ফ্রান্সের সাথে ক'দিন আগেই প্রুশিয়ার যুদ্ধ হল, যে প্রুশিয়া ফ্রান্সের আলসেস ও লোরেন দখল করল, সেই ফ্রান্সের বুর্জোয়াদের সাথে প্রুশিয়ার শত্রুতার মনোভাব তখনও টাটকা থাকার কথা। অথচ, অদ্ভুত উপায়ে তাদের মধ্যে শত্রুতা উধাও হয়ে প্যারিসকে ধ্বংস করার জন্য পুরোপুরি বোঝাপড়া হয়ে ১০ মে এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। আর ১৮ মে ভার্সাইয়ের জাতীয় সভায় সেই শান্তি চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নিলেন থিয়ের। বোঝাপড়া অনুযায়ী বিসমার্ক তার হাতে বন্দী ফ্রান্সের অবশিষ্ট সৈন্যদের মুক্তি দিয়ে থিয়েরের হাতে তুলে দিল। ফ্রান্সের উপর যুদ্ধের যে ক্ষতিপূরণ বিসমার্ক চাপিয়েছিল, 'প্যারিসকে ঠাণ্ডা করা'র শর্তে তার প্রথম কিস্তির পরিমাণ ঠিক করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। সম্রাট ভিলহেলম-এর সৈন্যদলও থিয়েরকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল। এইসব সাহায্য পেয়ে থিয়ের সমস্ত দিক থেকে পরিকল্পনা করতে লাগলেন বিদ্রোহী প্যারিসকে পরাজিত করে রক্ত-বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়ার। জাতীয় সভায় তিনি বললেন, 'আমি হব নির্মম'।

কমিউনের পরাজয়

অবশেষে শৃঙ্খলা, ন্যায় ও সভ্যতার নামে প্রথা-মাফিক ধ্বনি দিয়ে এল এক বীভৎসতা শুরুর মুহূর্ত। ভার্সাই-সেনাদের যে আক্রমণ মে মাসের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল, তাকে আরও তীব্রতর করে পশ্চিম রণাঙ্গনে সেই বাহিনী এগোতে লাগল ধীরে ধীরে নগরীর প্রাকার পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রামগুলি দখল করতে করতে। পৌঁছে গেল একেবারে প্রধান রক্ষাব্যূহের সম্মুখে। তারপর প্যারিসেরই একদল বিশ্বাসঘাতকদের সৌজন্যে এবং সেখানকার মোতায়েন জাতীয় রক্ষী বাহিনীর অসাবধানতার দরুণ ২১ মে প্যারিসের দরজা খুলে গেল থিয়েরের বাহিনীর সামনে। আক্রান্ত হওয়ার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। ২২ মে সকাল হতেই গোটা কমিউন রাস্তায় নেমে পড়ল। রাস্তায় রাস্তায় সর্বত্র গড়ে উঠল ব্যারিকেড। যে যেভাবে পারে নামল প্রতিরোধে। মাল টানা গাড়ির উপর বালির বস্তা, রাস্তার খোয়া, ইট বা যা কিছু হোক জড়ো করে তৈরি করা হয়েছিল সেই সব ব্যারিকেড। আর এই কাজে উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল মেয়েরা। তারপর থেকে প্রতিটি ব্যারিকেডকে রক্ষা করার জন্য চলতে থাকে অসম যুদ্ধে জেতার মরণপণ লড়াই। কমিউনের প্রাণকেন্দ্র রক্ষার জন্য ভার্সাই-বাহিনীর ষাটটি কামানের বিরুদ্ধে বারোটি কামান নিয়ে লড়েছে কমিউনার্ডরা। রক্তস্রোতে ভেসে গিয়েছে ব্যারিকেডের চারদিক, তারা মারা পড়েছে দলে দলে। বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে ভার্সাইয়ের সেনারা এক ইঞ্চি জমিও দখল করতে পারেনি।

তীব্র সংঘর্ষের এই দুঃসময়ে একদল অস্থিরচিত্তের দোদুল্যমান মানুষ হতাশা এবং গুজবের পেছনে ছুটে প্যারিসের সংগ্রামী আবহাওয়াকে সংশয়াকুল করে তুলল। তাদের পেটিবুর্জোয়াসুলভ মানসিকতা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিপ্লব বিরোধিতার কাজে ব্যবহৃত হল। শত্রুর আক্রমণ যখন শুরু হয়েগেছে পূর্ণোদ্যমে, তখন সর্বোচ্চ ঐক্য গড়ে তোলার বদলে এদের ভূমিকা ফ্রান্সের বুর্জোয়াদের হাতকেই শক্তিশালী করেছিল।

২৬ মে থেকে ভার্সাইয়ের সৈন্যরা শহরময় অবশিষ্ট কমিউনার্ডদের সন্ধানে হন্যে হয়ে হায়নার মতো ঘুরেছে আর সামান্যতম সন্দেহ হলেই নারী-শিশু-বৃদ্ধ সহ নির্বিচারে গুলি করে মেরেছে। মারার আগে জিজ্ঞাসাবাদের ভড়ংটুকুও তারা করত না।

কমিউনের পরাজয় যখন ঘনিয়ে আসছে সেই সময়কার কাহিনী তুলে ধরে লণ্ডনের 'ডেইলি মেল' লিখেছে —"এখনও মাঝে মাঝে দূর থেকে বিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। পের লাশেজের কবর-স্তম্ভের আনাচে কানাচে বিনা চিকিৎসায় আহত হতভাগ্যেরা মারা যাচ্ছে। ভূগর্ভের গোলকধাঁধায় ছ'হাজার ভীতসন্ত্রস্ত নিরাশায় নিমজ্জিত বিদ্রোহী ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাগ্যহীনদের রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দলে দলে মেসিনগানের সামনে গুলিবিদ্ধ হবার জন্য।"

এমন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সত্ত্বেও পরাজয় এল ২৮ মে দুপুরে। শেষ ব্যারিকেডটা ছিল 'রু রামপোনিউ'তে। কমিউনার্ডরা ব্যারিকেডের পিছনে দাঁড়িয়ে লড়াই করল, ব্যারিকেডের উপর থেকে ভার্সাইয়ের পতাকা নামিয়ে ফেলল তিনবার। কিন্তু বেলা একটার সময় সমস্ত প্রতিরোধের অবসান হল। কমিউনার্ড ডেলেশুল্‌জকে ব্যারিকেডের উপর গুলি করে হত্যা করা হল, অন্যরা আহত হয়ে গ্রেপ্তার বরণ করলেন। গর্বের সাথে থিয়ের ঘোষণা করলেন — 'আমরা মাত্র তিন হাজার মানুষকে হত্যা করেছি।'

এই লড়াইয়ে ভার্সাই-বাহিনীর অত্যাচার দেখে মার্কস বলেছিলেন, "১৮৪৮-এর জুনের বুর্জোয়াদের অত্যাচারের বীভৎসতা পর্যন্ত ১৮৭১-এর জঘন্যতার কাছে ম্লান হয়ে যায়। যে আত্মোৎসর্গী বীরত্বে স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে প্যারিসের জনসাধারণ ভার্সাই-দলের প্যারিসে প্রবেশের পর আটদিন লড়াই করেছিল — তাতে তাদের আদর্শের মহনীয়তা প্রতিফলিত হয় ...।"

প্যারিসের ধনীদের ঘরে ঘরে তখন আনন্দের উচ্ছ্বাস। এমন মৃত্যুর বিভৎসতার মাঝেও থিয়েরের সেনাপতি ম্যাকমোহনের ঘোষণায় তারা উচ্ছসিত হয়ে মদ, বিলিয়ার্ড আর স্বৈরিণী নারীদের নিয়ে ফ্যাসনদুরস্ত রেস্তোরাঁগুলিতে রজনীর শান্তিভঙ্গ করে প্রমোদোৎসবে মাতোয়ারা। যা দেখে কমিউন কর্তৃক নিষিদ্ধ ভার্সাই-সমর্থক 'জার্নাল দ্যে প্যারিস' পত্রিকার এক সাংবাদিক পর্যন্ত লিখেছেন — "যেভাবে প্যারিসের জনগণ গতকাল তাদের সন্তুষ্টির প্রকাশ দেখাল, সেটা চাপল্যের চেয়েও গুরুতর, এবং আমাদের ভয় হচ্ছে দিন দিন এটা আরও অবনতির দিকে যাবে। প্যারিসের চেহারা আজ উৎসবমুখর — এটা অত্যন্ত বেমানান, আর আমরা যদি 'অবক্ষয়গ্রস্ত প্যারিসবাসী' বলে আখ্যাত না হতে চাই তার জন্য এ জাতীয় বিষয়ের অবশ্যই অবসান চাই।"

কমিউন ধবংস করার জন্য ভার্সাই-সেনারা যে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল তা ২৮ মে'র পরও একইভাবে অব্যাহত থাকল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর খুন করা লোকেদের স্তূপীকৃত মৃতদেহের কী গতি করা যায়, সেটাই হয়ে উঠেছিল এক বিরাট সমস্যা। প্যারিসের কমিউনার্ড ও প্রুশিয়ার সেনাদের মধ্যে সরাসরি কোনও যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু প্যারিসের ধবংসসাধন আর প্রলেতারিয়েতের মৃতদেহগুলি বিসমার্ককে দিল প্রভূত আনন্দ।

যুদ্ধ জয়ের পর থিয়েরের কাজ ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে নির্বিচারে গ্রেপ্তার আর বিচার প্রহসন করে কমিউনের নেতা ও লড়াকু জনগণকে হত্যার অনুমোদন করিয়ে নেওয়া। কমিউন রক্ষার জন্য কত প্রাণ বলি হয়েছিল তার সঠিক হিসার কেউ জানে না। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছিল যে, শুধু প্যারিসের পৌরসভা সতেরো হাজার মৃতকে সমাহিত করার খরচ বহন করেছে। ফেরে, অস্যিব, ত্রিনেক্‌ত, বুর্জো, গাস্তোঁ ক্রেমিউ, লুই মিশেল সহ অসংখ্য কমিউনার্ড যে ভাবে সেই বিচারসভায় তাদের কর্তব্য-কর্মের পক্ষে ভয়লেশহীন ভাবে বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন, তাও পরবর্তীকালের শোষিত মানুষের সংগ্রামে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

প্যারি কমিউনের শিক্ষা প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন

মার্কস তাঁর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন গড়ে তোলার সাথে সাথে সমসাময়িক কালের সারা বিশ্বের শ্রেণি সংগ্রামগুলির উপরও তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক চিন্তায় ও সংগ্রামে এগিয়ে থাকা ফ্রান্সের ধারাবাহিক সংগ্রামগুলি থেকে তিনি তাঁর তত্ত্বের সঠিকতা খুঁজে পেতেন। ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী ফ্রান্সের প্রতিটি ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন ক্লান্তিহীনভাবে। 'ফ্রান্সের শ্রেণি সংগ্রাম', 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থগুলির ছত্রে ছত্রে তা উল্লিখিত।এই রচনাগুলিতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর

মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি ও শ্রেণিস্বার্থ কী ভাবে কাজ করে তা দেখিয়ে দেওয়া।

প্যারি কমিউনের ক্ষেত্রে মার্কস এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করতেন, প্যারি কমিউনের ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে একটা নতুন যুগের সূচনা হল। প্যারিসের সংগ্রামের সাথে সাথে পুঁজিপতিশ্রেণি ও তার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম একটা নতুন স্তরে প্রবেশ করল। কমিউন ধ্বংসের পর প্যারিসের এই সংগ্রাম থেমে গেলেও শ্রমিকশ্রে ণি ও বুর্জোয়াদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব যে শেষ হতে পারে না তার উল্লেখ করে কমিউনের পরাজয়ের ঠিক দু'দিন পর মার্কস লিখেছেন, "ফরাসি শ্রমিকশ্রেণি ও তাদের উৎপাদনের দখলদারদের মধ্যে শান্তি বা সন্ধি আর সম্ভব নয়। ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর দৃঢ়মুষ্টি সাময়িকভাবে হয়ত উভয় শ্রেণিকে একই পীড়নে বেঁধে রাখতে পারবে। কিন্তু ক্রমশ সম্প্রসারিত ব্যাপ্তি নিয়ে এই সংগ্রাম বার বার দেখা দেবে, আর শেষ পর্যন্ত কে জয় লাভ করবে — মুষ্টিমেয় দখলদার না বিপুল সংখ্যক শ্রমিকরা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।" বললেন, "কমিউন সহ শ্রমিকশ্রেণির প্যারিস চিরকাল এক নতুন সমাজের গৌরবদীপ্ত অগ্রদূত হিসাবে নন্দিত হবে। যাঁরা শহিদের মৃত্যুবরণ করলেন শ্রমিকশ্রেণি সমগ্র হৃদয় দিয়ে তাঁদের চিরকাল মনে রাখবে — আর তাঁদের জহ্লাদদের করবে ঘৃণা।"

কমিউনের চরিত্র ব্যাখ্যা করে মার্কস বললেন, "কমিউন হল মূলত একটা শ্রমিকশ্রেণির সরকার। শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই এর জন্ম। শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক মুক্তি কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ঘটতে পারে অবশেষে তা আবিষ্কৃত হল।"

প্যারি কমিউনের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সত্ত্বে ও তার দুর্বলতার দিকগুলি মার্কসের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কমিউন যখন পূর্ণ উদ্যমে কাজ করছে সেই সময়, ১৮৭১ সালের ১২ এপ্রিল, কুগেলমানের কাছে এক পত্রে মার্কস লিখলেন, "কমিউন যদি পরাজিত হয় তবে তার জন্য একমাত্র দায়ী হবে তাদের সহৃদয়তা। প্রথমে ভিনুয়া ও পরে প্যারিস জাতীয় রক্ষী বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশটা পশ্চাদপসরণ করার পরই তাদের উচিৎ ছিল ভার্সাই আক্রমণ করা। সে সুযোগ তারা নষ্ট করেছে। তারা গৃহযুদ্ধ শুরু করতে চায় নি, যেন সেই দুষ্টবুদ্ধি শয়তান থিয়ের প্যারিসকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে ইতিমধ্যেই গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেয় নি। দ্বিতীয় ভুল, কমিউনকে স্থান ছেড়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি বড় তাড়াতাড়ি তার ক্ষমতা সমর্পণ করেছে।"

এঙ্গেলস কমিউনার্ডদের মতাদর্শগত দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করার সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বকারীদের মধ্যে চিন্তাগত পার্থক্য এবং মতাদর্শগত দোদুল্যমানতাকেও দেখিয়েছেন। প্যারি কমিউনে আন্তর্জাতিকের সদস্যদের প্রভাব ছিল তুলনামূলকভাবে কম। নেতৃত্ব ছিল মূলত প্রুধোঁপন্থী ও ব্ল্যাঙ্কিপন্থীদের হাতে। তাই তাদের সংগ্রাম বীরত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বে ও কঠিন সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করতে পারেন নি। এই দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, "সেই জন্য বোঝা যায় কেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কমিউন অনেক কিছুই করেনি যা এখন আমাদের মতে করা উচিৎ ছিল। যে রকম ভক্তি-বিহ্বল ভাব নিয়ে ব্যাংক অব ফ্রান্সের দেউড়ির বাইরে এরা সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে ছিল, সেটাই সবচেয়ে দুর্বোধ্য। এটা একটা গুরুতর রাজনৈতিক ভুলও। কমিউন যদি ব্যাংক দখল করত তবে তার গুরুত্ব বিপক্ষের দশ হাজার সেনাকে বন্দী করার চেয়েও বেশি হত। তা ঘটলে সমগ্র ফরাসি বুর্জোয়াশ্রেণি ভার্সাই সরকারের উপর চাপ দিতে বাধ্য হত কমিউনের সাথে শান্তি চুক্তি করার জন্য।"

মার্কস এঙ্গেলস ১৮৭২ সালের ২৪ জুন কমিউনিস্ট ইস্তেহারের নতুন জার্মান সংস্করণে লিখেছিলেন, "কমিউন বিশেষভাবে একটি বিষয় প্রমাণ করেছে, তা হল এই যে — শ্রমিকশ্রেণি আগের তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্র শুধুই করায়ত্ত করে তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চালনা করতে পারে না।"

পরবর্তীকালে লেনিনও মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষাগুলিকে তুলে ধরে প্যারি কমিউনের শিক্ষার আরও নানাদিক তুলে ধরেছেন। নেপোলিয়ানের পরাজয়ের পর প্রজাতন্ত্র গঠন এবং পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কসের ভবিষ্যৎবাণী প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন, "একথা সুবিদিত যে, কমিউনের মাস কয়েক আগে ১৮৭০ সালের হেমন্তে মার্কস প্যারিস শ্রমিকদের হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন যে,

সরকার উচ্ছেদের চেষ্টা হবে হতাশার মূর্খতা। কিন্তু ১৮৭১ সালের মার্চে যখন শ্রমিকদের ওপর চূড়ান্ত লড়াই চাপিয়ে দেওয়া হল এবং মজুররা তা গ্রহণ করল, যখন অভ্যুত্থান হয়ে দাঁড়াল ঘটনা, তখন তার অশুভ দুর্লক্ষণাদি সত্ত্বেও বিপুলতম উল্লাসে মার্কস তাকে স্বাগত করেন। 'অকাল' আন্দোলনকে পণ্ডিতি চালে নিন্দা করেননি মার্কস। ... মার্কস শুধু ... 'স্বর্গাভিযানী' কমিউনার্ডদের বীরত্বেই উচ্ছ্বসিত হননি। লক্ষ্য অর্জন না হলেও মার্কস এই গণবৈপ্লবিক আন্দোলনটার মধ্যে দেখেছিলেন বিপুল গুরুত্বের একটা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লবের একটা অগ্র পদক্ষেপ, একটা ব্যবহারিক পদক্ষেপ যা শত শত কর্মসূচি ও যুক্তির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ, তা থেকে রণকৌশলের শিক্ষা গ্রহণ, তার ভিত্তিতে নিজ তত্ত্বের পুনর্বিচার — নিজের জন্য এই কর্তব্য নিয়েছিলেন মার্কস।''

বুর্জোয়া পার্লামেন্ট থেকে কমিউনের পার্থক্য তুলে ধরে লেনিন বলেছেন, ''বুর্জোয়া সমাজের দুর্নীতিতে দুষ্ট ও গলিত পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার বদলে কমিউন এমন প্রতিষ্ঠান খাড়া করে, যেখানে আলোচনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা মরিচিকায় পর্যবসিত হয়নি, কারণ সেখানে পার্লামেন্টের সভ্যদের নিজেদেরই কাজ করতে হত, নিজেদের তৈরি আইন নিজেদেরই চালু করতে হত, বাস্তব জীবনে সেই আইনের ফলাফল নিজেদেরই পরীক্ষা করতে হত, নির্বাচকদের কাছে সরাসরি জবাবদিহি করতে হত।''

লেনিন আরও লিখেছেন, ''কমিউন যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল এবং মার্কস যেগুলির উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন, ... সেই-সব ব্যবস্থা হল সমস্ত প্রকার প্রতিনিধিত্বের ভাতা বিলোপ, কর্মকর্তাদের বেলায় আর্থিক সমস্ত বিশেষ সুবিধার বিলোপ এবং রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মচারীর বেতন কমিয়ে শ্রমিকের মজুরির সাথে সমান করা। এখানেই সবচেয়ে স্পষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায় যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণির গণতন্ত্রের দিকে মোড় ঘুরেছে, অত্যাচারীদের গণতন্ত্র অত্যাচারিত শ্রেণিসমূহের গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে, শ্রেণি বিশেষকে দমনের জন্য 'বিশেষ শক্তি' রূপে যে রাষ্ট্র তার রূপান্তর ঘটেছে। এখানে জনগণের অধিকাংশের, শ্রমিক ও কৃষকদের সাধারণ শক্তি দিয়ে অত্যাচারীদের দমন করা হচ্ছে না।''

লেনিনও শত্রুকে ধ্বংস করার কাজে কমিউনের নেতাদের গড়িমসি এবং সম্পত্তিবান শ্রেণির সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার কাজ শুরু না করাকে অন্যতম ত্রুটি বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ব্যাংক অব ফ্রান্সের দখল না নেওয়াটা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের আন্দোলনে যুক্ত করা প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন, ''১৮৭১ সালে, ব্রিটেন বাদে সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ডের কোনও দেশেই মজুরশ্রেণি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। যে-বিপ্লব জনসাধারণের অধিকাংশকে বিপ্লবের অনুকূলে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেইরূপ কোনও 'জনবিপ্লব' ঘটা সে সময়ে সম্ভব হ'ত মাত্র একটি শর্তে, অর্থাৎ মজুরশ্রেণি ও কৃষকরা উভয়ই যদি সেই বিপ্লব-আবর্তে নেমে আসত। 'জনসাধারণ' তখন এই উভয় শ্রেণিকে নিয়েই গঠিত ছিল। 'আমলাতান্ত্রিক-সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্র' এই উভয় শ্রেণিকেই নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও শোষণ করে, সেই কারণেই তারা ঐক্যবদ্ধ। 'জনসাধারণে'র অধিকাংশের, মজুর ও অধিকাংশ কৃষকদের স্বার্থ হল এই 'যন্ত্র'টাকে ভাঙা ও চূর্ণ করা। মজুরশ্রেণির সাথে দরিদ্র কৃষকদের স্বাধীন মৈত্রী গড়ে ওঠার এইটিই হচ্ছে 'প্রাথমিক শর্ত'। এইরূপ মৈত্রী ছাড়া গণতন্ত্র স্থায়ী হতে পারে না এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন অসম্ভব। ... প্যারিস কমিউন এইরূপ মৈত্রী গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল, যদিও আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নানা কারণ বশত সে-চেষ্টা সফল হতে পারেনি।''

কিন্তু এ সব দুর্বলতা সত্ত্বেও কমিউন ছিল শ্রমিকশ্রেণির রাজত্ব কায়েমের প্রথম অভিজ্ঞতা। পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও যেভাবে অতি অল্প সময়ে কমিউন বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছিল এবং কমিউন প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষায় বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিল, লেনিনের চোখে তা ছিল এক মহান সংগ্রাম। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অসারতা দেখিয়ে লেনিন বলেছেন, ''সমস্ত ভ্রান্তি সত্ত্বেও কমিউন ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বহারা আন্দোলনের অভূতপূর্ব উদাহরণ। ... কমিউনের আত্মত্যাগ সর্বহারার সংগ্রামের সামনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইউরোপের বুকে এই সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ... এই সংগ্রাম ছদ্ম দেশপ্রেমের মুখোশ খুলে দিয়েছিল। ... কমিউন দেখিয়ে দিয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য ইউরোপের

সর্বহারাশ্রেণিকে কী কী দায়িত্ব পালন করতে হবে।''

মার্কসের শিক্ষা প্রসঙ্গে লেনিন আরও বলেছেন, ''পুরাতন সমাজ থেকে নতুন সমাজের জন্ম, পুরাতন সমাজ থেকে নতুন সমাজে উত্তরণের রূপ মার্কস প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসাবে পর্যালোচনা করেছেন। শ্রমিকশ্রেণির একটা গণআন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে মার্কস ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করেছেন। নিপীড়িত শ্রেণিদের বিরাট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বড় বড় বিপ্লবী চিন্তানায়করা পশ্চাদপদ হননি। মার্কসও ঠিক তেমনই কমিউনের অভিজ্ঞতা থেকে 'শিক্ষা গ্রহণ' করেছেন; বড় বড় বিপ্লবী চিন্তানায়কদের মতোই মার্কস নিপীড়িত শ্রেণিকে পণ্ডিতি চালে কখনও উপদেশ দেননি ...।''

কমিউন সৃষ্ট এই সব শিক্ষা গ্রহণ করে মার্কসবাদী জ্ঞান ভাণ্ডারকে আরও বিকশিত ও সমৃদ্ধ করে লেনিন রাশিয়ার বুকে গড়ে তুলেছিলেন শ্রমিকশ্রেণির সঠিক বিপ্লবী দল। শ্রমিকশ্রেণির সঠিক বিপ্লবী দল গঠনের এই প্রক্রিয়াটিই হল 'লেনিনীয় মডেল'। রাশিয়ার মাটিতে সেই দল বলশেভিক পার্টি গঠন ও তার নেতৃত্বে প্রথম সর্বহারা বিপ্লব সফল করে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনে প্যারি কমিউনের শিক্ষা অত্যন্ত মূল্যবান।

কমিউনের অপূরিত স্বপ্ন ও আমাদের কর্তব্য

আজ বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী শাসনে সর্বত্র অন্ধকার, মানুষের কোনও ক্রমে বেঁচে থাকার সংগ্রামটাও তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। দেশে দেশে চলছে অপ্রতিরোধ্যভাবে চলছে সাম্রাজ্যবাদী হানাদারি। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি কোনও কিছুতেই মানুষের কোনও অধিকার নেই। কোটি কোটি মানুষের বেকারত্ব, লক্ষ লক্ষ মানুষের উচ্ছেদ, হাজার হাজার মানুষের বিনা চিকিৎসায় অসহায় মৃত্যু শাসকদের হৃদয়ে সামান্যতম উদ্বেগের সঞ্চার করে না। এক শতাংশ মানুষের হাতে জমা হয় ৭৩ শতাংশ সম্পদ, তাতেও সম্পদশালীরা খুশি নয়। তাদের খুশি করতে রাষ্ট্র সেই সম্পদকে আরো স্ফীত হতে সাহায্য করে। এই রাষ্ট্রের কাছে জনগণের আশা করার কিছু নেই। রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় এই অনাহার, বঞ্চনা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু বললেই তা রাষ্ট্রের চোখে হয়ে যায় 'দেশদ্রোহিতা'। মানবতাবিরোধী, সভ্যতা বিরোধী এই রাষ্ট্র দেবে আরও বেকারত্ব, আরও অশিক্ষা, আরও ক্ষুধা ও মৃত্যু। প্যারি কমিউনের শিক্ষা, পরবর্তীকালে রাশিয়ার বিপ্লবের শিক্ষা এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের পথ দেখায়। সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে সবলে এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠা করতে আহ্বান জানায় শ্রমিকরাজ, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হতে।

প্যারি কমিউনের ঐতিহাসিক সংগ্রামের দেড়শো বছর পরও বিশ্বজুড়ে শোষিত মানুষ শ্রদ্ধার সাথে তাকে স্মরণ করে। মার্কস-এঙ্গেলসের কথায়, 'পুরানো পৃথিবীর শক্তিগুলি যাকে নির্মূল বলে মনে করে, সেই কমিউন তাই বেঁচে আছে আরও শক্তিশালী হয়ে'। শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে ওঠার অপরিণত-ভ্রূণ প্যারি কমিউনের সেই আদর্শগত শক্তি আমাদের আহ্বান জানায় তাকে পরিণত রূপ দিয়ে গড়ে তুলতে। আহ্বান জানায় সেই আকাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠনের জন্য সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে। সেই সমাজ গঠনের সংগ্রাম সফল হতে পারে সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে। মার্কসবাদ লেনিনবাদের শিক্ষার ভিত্তিতে আমাদের দেশে শোষিত মানুষের সংগ্রামের সেই আদর্শগত সাংগঠনিক হাতিয়ার গড়ে তুলেছেন এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তিতে তাকে বলীয়ান করে গড়ে তুলে এদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার সংগ্রামে নিয়োজিত হতে পারার মধ্যেই রয়েছে প্যারি কমিউনের দেড়শো বছর উদযাপনের তাৎপর্য। □

তথ্যসূত্র ঃ

১) ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ (এঙ্গেলসের ভূমিকা সহ) - কার্ল মার্কস
২) ফ্রান্সের শ্রেণি সংগ্রাম - কার্ল মার্কস
৩) লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা - ফ্রেডরিক এঙ্গেলস
৪) রাষ্ট্র ও বিপ্লব - ভি আই লেনিন
৫) প্যারী কমিউন - অমলেন্দু সেনগুপ্ত
৬) সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ, জুলাই ২০২১, এসইউসিআই (কমিউনিস্ট), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি'র প্রকাশনা

ব্যারিকেড

ভিক্টর হুগো

ব্যারিকেড আর খোয়া— পাথরের মাঝে
যেখানে শুদ্ধ শোণিত ধুইয়ে দেয় রক্তের নোংরা দাগ...
ধরা পড়ল একটি বছর বারোর ছেলে
আরো কিছু মানুষের পাশাপাশি।
— তুইও কি ওদের দলে নাকি রে ছোঁড়া?— আমরা সবাই, বলল সে ছেলে
— বেশ, অফিসার বলে, তাহলে গুলি খেতে হবে
— দাঁড়া তোর পালাও আসবে— ছেলেটি দেখল বন্দুকের ঝলকানি
আর তার সাথীরা এলিয়ে পড়ল দেওয়ালের গায়ে।

সে অফিসারকে বলে আমি যেতে পারি
ঘড়িটা নিয়ে আমার বাড়ি, মাকে দিয়ে আসতে?
ও তুই পালাতে চাস? — না, আমি ফিরে আসব
বদমাশগুলো ভয় পেয়েছে— কোথায় থাকিস তুই?
সেই সেখানে, ওই ফোয়ারার পাশে। আমি ঠিক আসব ফিরে
ক্যাপ্টেন মহাশয়
— ভাগ হতচ্ছাড়া! — ছেলেটি চলে যায়
যত্তোসব গোদা চালাকি!
অফিসারের অট্টহাস্য স্ফীত হয় সৈন্যদের যোগদানে
মানুষের মৃত্যু-আর্তনাদ মিশে যায়
সেই শব্দের উদগীরণে

কিন্তু হাসির সে ফোয়ারা থমকে যায়, সহসা
কারণ— চমকে দিয়ে আবার যে হাজির সেই বিবর্ণ বালক...
অনেকটা ভিয়ালার মতো গর্বিত
এসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় আর বলে ওঠে
এই যে আমি।

তাই তো নির্বোধ মৃত্যু লজ্জায় মুখ ঢাকে
আর বাক্‌রুদ্ধ উর্দি দীর্ঘশ্বাসে বলে —
তুমি চলে যাও।

অনুবাদ ঃ পার্থ মুখার্জী
প্যারি কমিউনকে দমন করতে ফরাসি শাসক শ্রেণির নির্মম অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভিক্টর হুগো। ১৮৭৪ সালে লেখেন কবিতাটি।

শতবর্ষে : অভাগীর স্বর্গ

অনিন্দিতা জানা

অভাগীর স্বর্গ। একশ বছর আগে লেখা শরৎচন্দ্রের চার-পাঁচ পাতার একটি ছোট গল্প। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জমিদার, ব্রাহ্মণ, তথাকথিত উঁচু শ্রেণির মানুষের শাসন, শোষণ অত্যাচার, পীড়নে অতিষ্ঠ অবহেলিত মানুষের দুঃখ, বেদনা, তাদের জীবনের ছোট ছোট আশা, আকাঙ্ক্ষা মমত্বের সকরুণ কাহিনীর কথা বলে এই গল্প। যে গল্পে বর্তমান আধুনিক জীবনের কোনো ছাপ নেই। যে যুগটাকে আমরা ফেলে এসেছি অনেক কাল আগে। তবুও পাঠক কী এক অমোঘ আকর্ষণে আজও তা পড়ে! পড়তে পড়তে কাঁদে। চোখের জলে অতীতকে চেনে, বর্তমানের সঙ্গে তাকে মেলাতে চায় আর ভবিষ্যতের কথা ভাবে। এই করুণ রসে সিক্ত হতে তার বারবার ভালো লাগে। তাই এই সাহিত্যের প্রাঙ্গণে তার ফিরে ফিরে আসা। সঙ্গীতের করুণ রাগের মতোই ব্যথাতুর পাঠক হৃদয় পূর্ণ হয় কী এক অনির্বচনীয় আনন্দে। পাঠক এখানেই খুঁজে পায় নিজেকে, তার আত্মবোধকে। আর্তের সাথে একাত্মতা আর অত্যাচারীর প্রতি বিরাগের অনুভূতিতে সে হয়ে ওঠে সামাজিক। আর এখানেই সাহিত্য হয় কালজয়ী।

গল্পটির শুরু আর শেষ যেন একই তরঙ্গের সমাপতন। সেই অনুরণনের ক্রিয়া আমাদের অনুভূতিতে অনন্য হয়ে ওঠে। পাঠক মনে রেখে যায় তার দীর্ঘ রেশ। গল্পের শুরুতে মুখুজ্জে গিন্নির অন্তিম যাত্রার দৃশ্য। মুখুজ্জে মশাই সঙ্গতি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ। তার উপচে পড়া সুখ, সমৃদ্ধি। ভরা সংসারের এমন সুখের মায়া কাটিয়ে মুখুজ্জে গিন্নির অন্তিম যাত্রার সমারোহের ঘটা দেখে মনে হয়, দ্বিতীয় বার যেন মুখুজ্জে গিন্নি পতিগৃহে যাত্রা করছেন। এ দৃশ্যের সাক্ষী থাকে গোটা গ্রাম। ইহকাল পরকালের এমন সৌভাগ্যের নিদর্শন বিরল! যাদের ইহকালে কেবলই অবহেলা, বঞ্চনা, আর সীমাহীন দুঃখ তারা এমন সৌভাগ্যকে ইহকালে না হোক, পরকালে কামনা করে। ইহকালের সব দুঃখ এই প্রত্যাশায় তারা মাথা পেতে নেয়। তাদেরই একজন অভাগী। তার জন্মের পরেই তার মা মরেছিল। এমন অলুক্ষুণে মেয়ের নাম বাবা রাগ করেই রেখেছিল অভাগী। বাবার ছন্নছাড়া সংসারে অভাগীর বেড়ে ওঠাটাই ছিল বিস্ময়ের। না খেতে পেয়ে কিংবা কোনো কঠিন অসুখে ভুগে সেও মারা যেতে পারতো। এত কিছু অতীতের অপ্রকাশিত কথার অবতারণা না করেই শরৎচন্দ্র কেবল লিখলেন- 'তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু।' তুলির এই একটি আঁচড়ে, নিপুণ শৈলীতে পাঠককে ইঙ্গিতে অনেক কথা বলে দেওয়া এ এক অসামান্য লেখনীর দক্ষতার প্রকাশ। যা শরৎচন্দ্রের লেখনীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই রসাস্বাদন করতে করতেই পাঠক গল্পের মর্মবস্তুতে প্রবেশ করে। এ ভাবেই পাঠক পরিচিত হয় চরিত্রের সঙ্গে । অভাগীর আর একটি পরিচয়, সে কাঙালীর মা। সারা জীবন ঘিরে এটুকুই তার প্রাপ্তি। তার ভবিষ্যতের একমাত্র আশা, স্বপ্ন। বাকি সমাজের কাছে সে অস্পৃশ্য, মনুষ্যেতর কোন প্রাণিরই সমতুল্য। তারা জাতে দুলে এবং তার চেয়েও বেশি সে এই অবহেলিত অংশের মধ্যে আরো অবহেলিত নারী সমাজের অংশ। স্বামীর সংসার করার সৌভাগ্য তার হয়নি। স্বামী রসিক বাগের অন্য সংসার আছে। লেখক

রসিকতা করে বলছেন, বাঘের অন্য বাঘিনী আছে। এই সমস্ত বঞ্চনার বিরুদ্ধে অভাগীর কোনো অভিযোগ নেই। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার একটিমাত্র ইচ্ছে, ইহকালের মায়া কাটিয়ে পরকালে যাত্রায়, স্বামীর পায়ের ধুলো আর ছেলের হাতের মর্যাদার আগুনটুকু! তাতে নাকি রথে চড়ে স্বর্গে যাওয়া যায়! সতীলক্ষ্মী মুখুজ্জে গিন্নির দাহকালে ওই হরিধ্বনি আর ছেলের হাতের আগুনে জ্বলন্ত চিতার ধোঁয়া ও শিখার মধ্যে পরম বিশ্বাসে অভাগী তাই, অপূর্ব রথে চড়ে গিন্নির স্বর্গযাত্রা দেখে। ছেলেকে ও বলে — 'দ্যাখ বাবা — বামুন মা ওই রথে চড়ে স্বর্গে যাচ্চে! মায়ের কথায় বিস্মিত সরল বালক কাঙালীর বস্তুগত নিরীক্ষণ ও সহজ সিদ্ধান্ত 'ও ত ধুঁয়া!' সে মৃতদেহকে মড়া বলেই জানে। তার কাছে সেটাই সত্য। স্বর্গ-মর্তের ফারাক তার তখনো বুদ্ধির অগোচর। কিন্তু দীর্ঘদিনের সংস্কার, সামন্তী সমাজের চিন্তার রেশ তার মায়ের মনে। যে সমাজ যুগযুগ ধরে বুঝিয়ে এসেছে রাজা, মহাজন এঁরাই সমাজের প্রতিভূ, এ জীবনের সকল ভোগবিলাস কেবল তাঁদের জন্য। আর বাকিদের উপর তাদের উৎপীড়নটাই স্বাভাবিক। তাঁরা ঈশ্বর প্রতিনিধি! অভাগীরা এই সমাজের যে অংশের প্রতিনিধিত্ব করে, সমাজের বঞ্চনা, অবহেলা আর সমস্ত কষ্টকে নির্বিবাদে তাদের মাথা পেতে নেওয়াটাই দস্তুর। এবং তাহলেই নাকি পরকালে স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা প্রশস্ত হয়, আর এ পথেই স্বর্গের দ্বার খুলে যায়। ইহকাল-পরকাল, স্বর্গ-মর্ত্যের এই ধারণা সামন্তী সমাজের। কিন্তু সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া, নিতান্ত সরল কাঙালী নিজের চোখে যা দ্যাখে, ভাবনায় তার প্রকাশ ঘটে। সমাজের সমস্ত আচার, নিয়ম, শাসন নিপীড়নের বাস্তব রূপ তার তখনো উপলব্ধির বাইরে। মাকে সে বিশ্বাস করে, আবার মায়ের সব চিন্তার সঙ্গে তার মেলে না। প্রতিবেশী বিন্দির মার কাছে সে শোনে 'ক্যাঙলার মার মতো সতীলক্ষী আর দুলে পাড়ায় নেই। 'তাই তার স্পষ্ট যুক্তি, মুখুজ্জে গিন্নি যে অধিকারে স্বর্গলাভ করে, তার মারও সে অধিকার আছে, কারণ তার মাও সতীলক্ষী। জীবনের অনেক হাতছানিকে তার মা অস্বীকার করেছে কেবল তারই জন্য। চরিত্রে তার মা অনন্য। তাই এখানেও সহজভাবেই সেই কঠিন প্রশ্নটি সে তার মায়ের কাছে রাখে — 'হাঁ মা, তুই নিকে করলে আমি কোথায় থাকতুম? আমি হয়তো না খেতে পেয়ে এতদিনে কবে মরে যেতুম!' এ প্রশ্ন শুধু তার মায়ের কাছে কি? অনিশ্চিত ভবিষ্যতের এ প্রশ্ন কাঙালীর মুখ দিয়ে লেখক রেখেছেন গোটা সমাজের কাছে। ঘটনার সংক্ষিপ্ত প্রবাহে সেই মা 'ছেলের হাতের আগুন' এই শেষ ইচ্ছে রেখে অসময়েই চলে যায়। তখন কাঙালী অবোধ বালকের পর্যায়ে। বড় দুঃখ আর যন্ত্রণার মধ্যেও মায়ের স্নেহের আঁচলের তলায় যে অভয় আশ্রয় তার ছিল, মায়ের মৃত্যুর সাথে সেটুকুও গেল। এইবার শুরু হল বাস্তবের কঠিন মাটির সাথে পরিচয়ের সত্যিকার পালা। নিজেদের উঠোনে মায়ের হাতে পোঁতা গাছেও যে তার অধিকার নেই সে এই প্রথম জানল, রে রে করে তেড়ে আসা জমিদারের দারোয়ানের কাছ থেকে। তার সামনেই বাবাকে চড় মারে, অসম্মান করে, কাঠকাটার কুড়ুল কেড়ে নিয়ে গালিগালাজ করে ওই জমিদারের পেয়াদা। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে, নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অসচেতন কাঙালীর কণ্ঠে ফুটে ওঠে প্রতিবাদের স্বর 'এ যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ, দারোয়ানজী। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?' এর পরিনাম কী হতে পারে পাঠক সহজেই আন্দাজ করতে পারে। কাঙালী শুধু বেঁচে যায় মড়া ছোঁয়ার মতো এক সংস্কারবোধ থেকে। এখানে কোনো সুরাহা না পেয়ে ছেলের সহজবুদ্ধিভাবে, দারোয়ান ঘুষ খায়। কিন্তু জমিদার, যিনি আসল কর্তা, তাঁর কাছে নিশ্চই এর প্রতিকার পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানেও তার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে যুক্ত হয় এক নিদারুণ ব্যথার সঞ্চয়। তারা যে নিচু জাত, দুলে, তাদের জাতের মড়া পড়ানোর ইচ্ছে নাকি ছোটলোকের আস্পর্ধাই! মায়ের শেষ ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেও কোনো লাভ হয় না। উল্টে গাছের দাম বাবদ পাঁচ টাকা চায় জমিদার। এ যে অসম্ভব কথা! কারণ সামান্য এক টাকার উত্তরীয় কেনার জন্য তাদের খাওয়ার কাঁসার থালাটা ইতিমধ্যে বাঁধা পড়েছে। তাই শুধু বঞ্চনাই নয়, জোটে গলাধাক্কা, জোটে চূড়ান্ত অপমান। এ সবের কারণ কী, কী বা তার অপরাধ সে বুঝে উঠতে পারল না। দুঃখে, অপমানে চোখে অঝোর ধারা নামে। জমিদার, গোমস্তা নির্বিকার। কারণ নিষ্ঠুর জমিদারি ব্যবস্থা, যাদের হাতে টিকে থাকে, সেই সব কর্মচারীদেরও এমন হৃদয় হীনতায় অভ্যস্ত নির্বিকার ও নিরেট হওয়াটাই যোগ্যতার পরিচয়। জমিদার এখানেই ক্ষান্ত নন। তিনি আরও নির্দেশ দেন দেখতো হে, এ ব্যাটার

খাজনা বাকি পড়েছে কি না? থাকে তো জালটাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয় — হারামজাদা পালাতে পারে। 'এরপর কাঙালী যায় সমাজের মাথায় বসে থাকা ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিনিধি মুখুজ্জে মশায়ের কাছে, যার গিন্নির অন্তিম যাত্রার সমারোহ দিয়ে এই গল্পের সূচনা। সেখানে মুখুজ্জে গিন্নির শ্রাদ্ধের সমারোহ আয়োজন আর ঘটা। সেখানেও কাঙালীর সকরুণ আবেদন। আর তার পরিণাম ও একই ভাবে নিষ্ঠুর আঘাতে ব্যর্থ হয়। শিল্পী শরৎচন্দ্রের অতুলনীয় বাচনভঙ্গি বিদ্যুৎ ঝলকের মত ঝলসে ওঠে — 'ঘন্টা দুয়েকের এই অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল'। মৃত্যুর পর নিজের দেহ কাঠের আগুনে দাহ হবে, ছেলের হাতের আগুন পেয়ে স্বর্গে যাবে, এই স্বপ্নটুকুকেও নিষ্ঠুর সমাজ সম্পন্ন হতে দেয় না। সবশেষে অনন্যোপায় কাঙালী নদীর চরের গর্তে মায়ের শেষ শয্যা পাতে, আর খড়ের আঁটির নুড়ো জ্বেলে মায়ের শেষ ইচ্ছে পূরণ করে আর নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে খড়ের আঁটির থেকে উদ্যত স্বল্প ধোঁয়ার দিকে। একই সমাজের অন্তর্গত দুই ধরনের মানুষ, একদল সমাজের সকল সম্পদ, সুখ, ঐশ্বর্যের ভাগীদার, আর একদল নিপীড়িত, বঞ্চিত, অবহেলিত। এই বৈপরীত্য পাঠকের মনে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে হাজারো প্রশ্ন তোলে। মনে মনে সে হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। সার্থক সুন্দর হয়ে ওঠে লেখকের এই চিত্রায়ণ। এখানে শরৎচন্দ্রের আর একটি প্রখ্যাত ছোট গল্প মহেশের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯২১শে শরৎচন্দ্র লেখেন অভাগীর স্বর্গ আর ১৯২২-এ মহেশ গল্প। এ গল্পেও শরৎচন্দ্র অসামান্য দক্ষতায় জমিদার ও ব্রাহ্মণ সমাজের দাপট, নিপীড়নের মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেছেন। দরিদ্র মুসলমান কৃষক গফুর, মেয়ে আমিনা, আর পুত্র-স্নেহে পালিত বলদ মহেশ। অস্পৃশ্যতা, জাতপাতের আবর্তে এদের অভাবের জীবনে তথাকথিত সমাজপতিদের অত্যাচারের কাহিনীর শেষে করুণ পরিণতি, মেয়ের হাত ধরে গভীর রাতে ফুলবেড়ের চটকলের উদ্দেশে চলে যাওয়ার আগে গফুরের স্বগতোক্তি 'আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিও, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।' যেন অন্য ইঙ্গিত বহন করে। একটা বিদ্রোহের, সমাজকে পাল্টানোর একটা সুর রেখে যায় পাঠক মনে।

এই গল্প যখন লিখছেন শরৎচন্দ্র, প্রায় দেড়শো বছরের পরাধীন ভারতবর্ষে তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। রাজনৈতিক জগতে তখন গান্ধীজি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপত রাই প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। কংগ্রেস তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম। শরৎচন্দ্র যোগ দিয়েছেন কংগ্রেসে। কাজ করছেন দেশবন্ধুর সাথে নিষ্ঠার সঙ্গে। সাহিত্য জগতের রবীন্দ্রনাথ তখন মধ্য গগনে। ১৯১৩-তে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পাওয়া, পরাধীন ভারতবর্ষকে আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদার ভাষা জুগিয়েছিল। মুখে মুখে তখন রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতা সমাদৃত। কিন্তু শরৎচন্দ্র নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় গভীরভাবে দেখেছেন সমাজ জীবনকে। বিশেষ করে গ্রামীণ জীবন তখনও ছিল জাতপাত, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিভেদ ও নানা বিধিনিষেধের নিগড়ে বন্দী। পাশ্চাত্যের নবজাগরণের ধারায় রামমোহন পরবর্তীকালে আরো বলিষ্ঠরূপে বিদ্যাসাগর ধর্ম নিস্পৃহ অপার্থিব মানবতাবাদের নতুন আলোয় এ দেশের অন্ধকার দূর করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের পরবর্তীকালে সেই ধারাকে অব্যাহত রাখতে যে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল তা হয়নি। ফলে সমাজ জীবনে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার প্রভাব ও তার রেশ থেকে গিয়েছে তখনও। প্রাচীন বৈদিক যুগে বর্ণাশ্রম প্রথা ছিল মূলত কাজ, যোগ্যতা, দক্ষতাকে কেন্দ্র করে। তাকে ভিত্তি করেই এসেছিল বর্ণের চারটি বিভাগ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। 'বর্ণ' এই শব্দটি এসেছে Vrn থেকে। যার অর্থ 'to choose' বা পছন্দ করা, পছন্দ অনুযায়ী আশ্রম বা পেশা নির্ধারণ করা। আজ যেমন ডাক্তারের ঘরে জন্মালেই ডাক্তার হওয়া যায় না, ডাক্তারি পড়ে, সার্টিফিকেট অর্জন করতে হয়, তেমনিই বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ-এর ঘরে জন্মালেই ব্রাহ্মণ হওয়া যেতো না। ঋষি ঐতরেয় ছিলেন দাসের পুত্র। কিন্তু তিনি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে লেখেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, হয়ে ওঠেন শীর্ষ ব্রাহ্মণদের একজন। তেমনি সত্যকাম জবালা, পতিতার পুত্র। যিনি পরে একজন ব্রাহ্মণ হন। এ রকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। সেই বর্ণাশ্রম প্রথা ধীরে ধীরে সমাজের ঘাত, প্রতিঘাতে, শাসকের সুবিধা মতো হিন্দুধর্মের হাত

ধরে অস্পৃশ্যতা, জাতপাতের নানা সংস্কারে পরিবর্তিত হতে হতে সমাজ অভ্যন্তরে তার শিকড় ছড়িয়েছে অনেক দূর। জাতিভেদ প্রথা রূপে। তৈরি হয়েছে নানা বিধি, নানা শাস্ত্র। মনু সংহিতা শাস্ত্রের মতে শূদ্রদের জ্ঞান অর্জনের কোনো অধিকার ছিল না। শাস্ত্র মতে ব্রহ্মা সৃষ্ট এই চারটি বর্ণের বাইরে অস্পৃশ্য ও অচ্ছুৎ সম্প্রদায়। ভাষায় যাকে বলে দলিত সম্প্রদায়। ব্রাত্য জনগোষ্ঠী। এই ধরনের নানা প্রথা, নানা সংস্কার আষ্টেপৃষ্ঠে শিকড় গেড়েছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে। কৌলিন্য প্রথা, সতীদাহ প্রথার মতো নৃশংস, নিষ্ঠুর প্রথা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল এই সমাজ অভ্যন্তরে। পাশ্চাত্যের নবজাগরণ, ব্রিটিশ শাসনের হাত ধরে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব আমাদের দেশে কাজ করছিল মূলত কিছু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অংশের মধ্যে। নতুন যুগের এই ছোঁয়া শরৎচন্দ্রের মনেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু সমাজ মননে তখনও কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামির যে রেশ, স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাও তার থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি অনুভব করছিলেন, জাতপাতের এই সমস্যা, গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজের দাপট সামাজিক মুক্তির পথে এক অন্যতম অন্তরায়। সেদিন মানবতার এই অসম্মানের বেদনাকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার গুরুত্ব ছিল অসামান্য। যেগুলো মানুষের মনে সংস্কার হিসেবে গ্রথিত হয়ে আছে তাকে দূর করতে হলে সাহিত্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যার প্রাঙ্গণে মানুষকে বারবার যেতে হয়। মানুষ পড়তে পড়তে কাঁদে, আর কাঁদতে কাঁদতে পাল্টে যায়। তেমন সাহিত্য রসে সিক্ত হতে হতে মনের গভীরে বাসা বেঁধে থাকা তা থেকে সংস্কার মুক্ত হওয়ার আকাঙ্খা তৈরি হয়। সেই কাজটিই সার্থকভাবে করেছেন শরৎচন্দ্র। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি উপযুক্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজটি করে গিয়েছেন শিল্প শৈলীতে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। আজও এত বছর পরে সমাজ সভ্যতা আধুনিক হয়েছে ঠিকই। মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তার রেশ আজও বয়ে নিয়ে চলেছে এই সমাজ। দলিত সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার, নিম্নবর্ণের মেয়েদের উপর উচ্চবর্ণের পুরুষের গায়ের জোরে সম্ভোগের জঘন্য মানসিকতা, কেবল ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে যাওয়ার কারণে দলিত সম্প্রদায়ের ছেলেকে পিটিয়ে নৃশংস হত্যার ঘটনা কিংবা অনার কিলিং-এর মতো অজস্র ঘটনা আজও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে সংঘটিত হয়। উচ্চশিক্ষার অঙ্গনেও চুনিকোটাল কিংবা রোহিত ভেমুলাদের আত্মহত্যা করতে হয়, আজও অস্পৃশ্যতার যে নিম্ন মানসিকতা সমাজ অভ্যন্তরে বিরাজ করছে তার কারণে। শাসকের দুষ্ট রাজনীতি, জাতপাত আর ধর্মের নামে চূড়ান্ত অধর্ম, উগ্র অন্ধতা গ্রাস করতে চাইছে আজ গোটা দেশকে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৈষম্য, অভাব দারিদ্র্যের যাতনা, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি মানুষের বাঁচার সমস্ত আনন্দকেই যেন বিদ্রুপ করে চলেছে। প্রেম, ভালবাসার সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি হারিয়ে যাচ্ছে জনসমাজ থেকে। চরম বৈষম্য ও পক্ষপাতদুষ্ট এ সমাজের সকল সম্পদ, সকল বৈভবের অধিকার মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কুক্ষিগত। ওই গুটিকতক বা মুষ্টিমেয় ছাড়া মানুষ যে ভালো নেই এ কথা বুঝতে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানই যথেষ্ট। চোখ বুজে দু'দণ্ড ভাবলেই একজন সংবেদনশীল ব্যক্তির বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মানুষ বড় কাঁদছে! কিন্তু আজ লেখকের কলমে সমাজের এই মর্মবেদনা ধ্বনিত হচ্ছে কই? সমাজের 'ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে 'প্রান্তিক মানুষদের মধ্যেও এক অতি অকিঞ্চিৎকর অভাগী- কাঙালীর জীবনের একটি মাত্র দিনের দিনলিপি তার হৃদয়ের ভাষা, তার মর্মস্পর্শী কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণের অমোঘ আশ্চর্য দু-একটি তুলির টান পাঠককে কীভাবে আপ্লুত করে দেয়! পড়তে পড়তে সেই বেদনার অনুভব আরো গভীরতর হাহাকার হয়ে ওঠে, যখন মনে হয় আজকের এই সমাজ বাস্তবতায় আমাদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের মতো একজন মরমী সাহিত্যিক নেই, যিনি ডুব দিতে পারেন মানুষের হৃদয় রহস্যে। এ সমাজে সবকিছু থেকেও যাদের কোনো কিছুতে অধিকার নেই, তাদের বুকে কান পেতে শুনে নেওয়া দীর্ঘশ্বাসের, বেদনার, বিদ্রোহের সংলাপগুলি যিনি শরৎচন্দ্রের মতো বলতে পারেন মানুষের দরবারে। সর্বহারা মানুষ তাদের মর্মস্পর্শী রিক্ততার বেদনা আর এ সভ্যতার অপরিমেয় সম্পদের স্রষ্টার গৌরব চিনতে পারে যুগপৎ? আবিষ্কার করতে পারে নিজেকে। আর এরই পথ ধরে তেমন সাহিত্য, তেমন সৃষ্টি হয়ে ওঠে কালজয়ী। □

বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ : একটি প্রতিবেদন

সুব্রত দাস

সাহিত্য-সমাজে একজন প্রখ্যাত কবির জন্ম শতবর্ষ বা সার্ধশতবর্ষ ইত্যাদি উদযাপনের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু একটি কবিতার ক্ষেত্রে তেমন উদযাপনের নজির আছে কি না সন্দেহ। নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা সেই বিরলতম উদাহরণ। এ বছর কবিতাটির প্রকাশের শতবর্ষ। এই কবিতা প্রকাশের নব্বই বর্ষ উপলক্ষেও দুই বাংলায় বহু কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ১৯২১ সালে লেখা নজরুলের বাইশ বছর বয়সের এই কবিতা সাহিত্যের যুগান্তর ঘটিয়েছে।

একশো বছর পরেও কবিতাটি নিয়ে সাহিত্য জগতে আবেগ আগ্রহ আকর্ষণ সীমাহীন। অসংখ্য লেখালিখি হচ্ছে, নানা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে নানা ভাষায় কবিতাটি অনুদিত হওয়ার পরও আরও একশোটি ভাষায় অনুবাদের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের কোনও এক মহল থেকে এমন দাবিও উঠেছে যে, যেহেতু এ বছরটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বর্ষ তাই বিদ্রোহী কবিতার ১৪৩টি পঙক্তির মর্যাদায় ১৪৩ ফুট উঁচু একটি মিনার নির্মাণ করা হোক। এ এক অভূতপূর্ব ব্যাপার।

নজরুলের কণ্ঠে বিদ্রোহী কবিতা শুনে রবীন্দ্রনাথ প্রবল আনন্দে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, কাজি, তুমি আমাকে সত্যিই হত্যা করবে। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

তৎকালীন দু-একজন কবিতাটিকে 'বড় চড়া ঢঙের' বলে খাটো করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জবাবে বলেছেন, 'কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না এসব তোমাদের আবদার বটে... আমি যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও ঐ সুর বাজত, জনপ্রিয়তা কাব্য বিচারের স্থায়ী নিরিখ নয়, কিন্তু যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে তা শুধু কাব্য নয় মহাকাব্য।'

১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় বিদ্রোহী প্রথম ছাপা হয়। কবিতাটি এত আলোড়ন সৃষ্টি করে যে, সেই সপ্তাহে 'বিজলী' দু'বার ছাপাতে হয়। দু'বারে মোট ঊনত্রিশ হাজার কপি ছাপা হয়। পরে কবিতাটি 'মোসলেম ভারত'-সহ অনেক পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। যথা, প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯২২); সাধনা, বৈশাখ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ (এপ্রিল-মে, ১৯২২); ধূমকেতু: (২২ আগস্ট ১৯২২) ইত্যাদি। ওই বছরই অক্টোবর মাসে প্রকাশিত নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'য় বিদ্রোহী সংকলিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছিল বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে।

যদিও কবিতাটির প্রকাশ সম্পর্কে একটু ভিন্নমত রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ না হলেও প্রসঙ্গত সেটা জানা যেতে পারে। ছাপার হরফের সাক্ষ্য 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে : মোসলেম ভারতে: কার্তিক ১৩২৮ বঙ্গাব্দে (অক্টোবর-নভেম্বর ১৯২১)। তার পরে প্রকাশিত হয়েছে : বিজলীতে ২২ পৌষ ১৩২৮ বঙ্গাব্দে (৬ জানুয়ারি ১৯২২)। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা হলো উল্টো। মোসলেম ভারতের প্রকাশ ছিল অনিয়মিত। কার্তিক

সংখ্যাটি প্রকাশ পেতে পেতে হয়ে গেল ফাল্গুন মাস (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯২২)। তার আগেই পাঠকের কাছে বিজলী-বাহিত হয়ে পৌঁছে গেছে নজরুলের 'বিদ্রোহী'। তাই নিয়ে অবশ্য মোসলেম ভারতের সম্পাদক কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায় না। আরো মজার কথা, বিজলীতে বলা হলো যে, কবিতাটি মোসলেম ভারত থেকে পুনর্মুদ্রিত। অথচ মোসলেম ভারত তখনো প্রকাশিতই হয়নি।' (কালি ও কলম)

যাই হোক, প্রকাশের সাথে সাথে 'বিদ্রোহী' আগুনের গোলার মতো যেন ছড়িয়ে পড়ল বাংলার সর্বত্র। সবার মুখে তখন ঘুরছে, 'আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিস'। নজরুলের এই বিদ্রোহী মন্ত্রে জেগে উঠল গোটা বাংলা। বৃটিশ রাজের ঘুম ছুটে গেল। সতর্ক হয়ে উঠল পুলিশ প্রশাসন। রাতারাতি নজরুলের উপর সরকারি আমলাদের খবরদারি বেড়ে গেল এবং তার পর একে একে নজরুলের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ সরকারি ভাবে বাজেয়াপ্ত হল।

ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্তির জন্য নজরুলের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করাত। কবিতাগুলোর মধ্যে 'বিদ্রোহী'ও ছিল। 'বিদ্রোহী'র গদ্যানুবাদ করেন বেঙ্গলি ট্রান্সলেটর অফিসের সহকারী ননীমাধব চৌধুরী। তৎকালীন বঙ্গীয় সরকারের মুখ্য সচিব 'বিদ্রোহী'কে নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। যদিও, এই তথ্যটি নিয়ে দ্বিমত আছে।

বিদ্রোহী প্রকাশের পরপরই গোঁড়া মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মুসলিম সমাজ নজরুলের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। তাদের মতে নজরুল ধর্মদ্রোহী ও কাফের হয়ে গেছেন। তিনি ইসলাম ধর্মের অবমাননা করেছেন। বিদ্রোহীতে নজরুল লিখেছেন,

'ভূ্যলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ'ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর।'

ফলে, আর রক্ষে কোথায়! মুন্‌শী মহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমেদ তাঁর 'লোকটা মুসলমান না শয়তান' প্রবন্ধে লিখলেন, 'মোসলেম ভারতে বিদ্রোহী কবিতাই কাজীর কারামৎ জাহির হয়েছিল। তারপর ধুমকেতু প্রত্যেক সংখ্যায় পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে গরল উদগীরণ করিতেছে। এ উদ্দাম যুবক যে ইসলামী শিক্ষা আদৌ পায় নাই তাহা ইহার লেখার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দুয়ানি মাদ্দায় ইহার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ। ...নরাধম হিন্দু ধর্মের মানে জানে কি? ...এইরূপ ধর্মদ্রোহী কুবিশ্বাসীকে মুসলমান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।' ইব্রাহিম খাঁ'র একটি চিঠির উত্তরে এইসব সমালোচনার উল্লেখ করে নজরুল দুঃখ করে লিখেছেন, 'মুসলমান সমাজ যে আমাকে কাফের খেতাব দিয়াছে তাহা আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ইহাকে আমি কোনদিন অবিচার বলিয়া অভিযোগের বিষয় করি নাই। কারণ আমার আগে ওমর খৈয়াম, শামসুদ্দিন হাফেজ কিংবা মনসুর আল হাল্লাজকেও কাফের বলিয়া ছিল।'

শুধু যে গোঁড়া মুসলিম সমাজ নয়, গোঁড়া হিন্দু সমাজও নজরুলকে 'সাম্প্রদায়িক' ও 'উগ্র মুসলমান' বলে আখ্যা দিয়েছিল। নজরুল বেদনাহত হৃদয়ে লিখেছেন, 'আজকালকার সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে, আমি যে মুসলমান ইহাই হইয়া পড়িয়াছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধের সামিল, আমি যত বেশি অসম্প্রদায়িক হই না কেন?'

নজরুলের যুগান্তকারী কাব্যপ্রতিভা সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারলেও বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কালের পুতুলে' লিখেছেন, '' 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে' মনে হল এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তাই, দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেন বাণী।''

বিদ্রোহী নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেও 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন,

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা মনে লইয়া একদিন বিকালে মফস্বলীয় মূঢ়তাসহ সত্যেন্দ্রনাথের সম্মুখে গিয়া দাঁড়ালাম।... ভয়ে এবং সংকোচে মরীয়া হইয়া শেষ পর্যন্ত 'বিদ্রোহী' সম্বন্ধে আমার বিদ্রোহ ঘোষণা করিলাম। বলিলাম, ছন্দের দোলা মনকে নাড়া দেয় বটে, কিন্তু 'আমি'র এলোমেলো প্রশংসা তালিকার মধ্যে ভাবের কোনও সামঞ্জস্য না পাইয়া মন পীড়িত হয়, এ বিষয়ে আপনার মত কী? প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমটা বোধ হয় সত্যেন্দ্রনাথ

একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরে একটা মৃদু হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।... তিনি বলিলেন, কবিতার ছন্দের দোলা যদি পাঠকের মনকে নাড়া দিয়া কোনও একটা ভাবের ইঙ্গিত দেয় তাহা হইলেই কবিতা সার্থক।''

'আমার শিল্পী জীবনের কথা' বইতে আব্বাসউদ্দিন দার্জিলিংয়ের একটি স্মৃতির কথা লিখেছেন, 'তিল ধারণের স্থান নেই হলের ভেতর। কাজিদা তখন আবৃত্তি করছেন তার বিপ্লবী কবিতা 'বিদ্রোহী'। পূর্ণ নিস্তব্ধতা কক্ষে বিরাজমান। জলদগম্ভীর সুরে আবৃত্তি করে চলেছেন। প্রতিটি শ্রোতা পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর মুখের পানে। শেষ হওয়ার সাথে কী বিপুল করতালি।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ায় একবার কিন্তু এমনি অকস্মাৎ তুফানের দুরন্ত দোলা লেগেছিল। সে দোলা যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সেদিন অনুভব করেননি তাদের পক্ষে শুধু লিখিত বিবরণ পড়ে সে অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ স্বাদ পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।... রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার তখন মধ্যাহ্ন দীপ্তি। দেশের যুবগণের মনে তাঁর আসনও পাকা। তারই মধ্যে হঠাৎ আর একটা তীব্র প্রবল তুফানের ঝাপটা কাব্যের রূপ নিয়ে তরুণ মনকে উদ্বেল করে তুলেছিলো।'

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি —
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি।

কবিতার ছন্দে ও ভাষায় এটি উত্তাল তরঙ্গ। কার কব্যে ধ্বনিত এ প্রচণ্ড কল্লোল?... মনে আছে, বন্ধুবর কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একটি কাগজ কোথা থেকে কিনে নিয়ে অস্থির উত্তেজনার সঙ্গে আমার ঘরে ঢুকেছিলেন। কাগজটা সামনে মেলে ধরে বলেছিলেন, পড়। অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি। রাস্তায় কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে এ কাগজ নিয়ে। কি সে এমন কাগজ? নেহাত সাধারণভাবে ছাপা, যতদূর মনে পড়ছে ডবল ডিমাই সাইজ-এর সাপ্তাহিক কাগজ। পাতাগুলো আলগা, সেলাই করা নয়। দাম বোধ হয় চার পয়সা। সেই কাগজ কেনবার জন্য সারা শহর ক্ষেপে গেছে? কেন?... পড়লাম কবিতার নাম বিদ্রোহী। ...সেদিন ঘরে বাইরে, মাঠে ঘাটে রাজপথে সভায় এ কবিতা নীরবে নয়, উচ্চকণ্ঠে শত শত পাঠক পড়েছে। সে উত্তেজনা দেখে মনে হয়েছে যে, কবিতার জ্বলন্ত দীপ্তি এমন তীব্র যে ছাপার অক্ষরই যেন কাগজে আগুন ধরিয়ে দেবে। ...গাইবার গান নয়, চিৎকার করে পড়বার এমন কবিতা এদেশের তরুণরা যেন এই প্রথম হাতে পেয়েছিল। তাদের উদাস হৃদয়ের অস্থিরতারই এ যেন আশ্চর্য প্রতিধ্বনি। এ কবিতা যে সেদিন বাংলাদেশকে মাতিয়ে দেবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে ...।' (নজরুল সন্ধা: নজরুল প্রসঙ্গে)

কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বিদ্রোহী প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এ কে নতুন কবি? নির্জীব দেশে এ কার বীর্য বাণী? বাংলা সাহিত্য নয়, সমগ্র দেশ প্রবল নাড়া খেয়ে জেগে উঠলো। এমনটি কোনোদিন শুনিনি, ভাবতেও পারিনি। যেন সমস্ত অনুপাতের বাইরে যেন সমস্ত অঙ্কপাত্রেরও অতিরিক্ত।... গদ গদ বিহ্বল দেশে এ কে এলো উচ্চণ্ড বজ্রনাদ হয়ে। আলস্যে আচ্ছন্ন দেশ — আরামের বিছানা ছেড়ে হঠাৎ উদ্দণ্ড মেরুদণ্ডে উঠে দাঁড়াল।' (জ্যৈষ্ঠের ঝড়)

এরকম আরও আলোচনা বিদ্রোহী নিয়ে রয়েছে যেগুলো কবিতাটির অনন্যতাকেই প্রকাশ করে। কিন্তু উদ্ধৃতির সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। যেটির প্রয়োজন তা হল, আজকের যুগে মনুষ্যত্বের সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী'র চেতনাকে হৃদয়ঙ্গম করা। স্মরণে রাখা বিদ্রোহী'র সেই আবেদন যা নজরুলের কবরের ফলকেও লেখা আছে,

'মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারির খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।' □

প্রসঙ্গ :
সিনেম্যাটোগ্রাফ আইন সংশোধন

একটি প্রতিবেদন

শেষ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে গেলেও তামিলনাড়ুর ৩৯ টি আসনের একটিতেও জয় পায়নি। এ নিয়ে কম আলাপ-আলোচনা হয়নি। একাধিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক এর অন্যতম একটা কারণ হিসেবে বেশ কিছু তামিল সিনেমাকে চিহ্নিত করেছেন। এই সিনেমাগুলি বিজেপির রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতাকে, তার নানা প্রকল্পের বাগাড়ম্বরকে লাগাতার প্রচার করে গেছে বলে তাদের অভিমত। সম্প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে সিনেমার বিষয়বস্তুকে নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, এটা তার একটা কারণ হতে পারে। 'সিনেম্যাটোগ্রাফ অ্যাক্ট ১৯৫২'-তে যে সংশোধনী (সিনেম্যাটোগ্রাফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২১) আনা হচ্ছে এবং একটি নতুন ধারা তাতে যোগ করা হচ্ছে তার ফলে নির্দিষ্ট আইনি ছাড়পত্র পাওয়ার পরও যে কোনও ছবির প্রদর্শন সরকার আইনানুসারে আটকে দিতে পারে। সিনেমাকে প্রদর্শনের ছাড়পত্র দেওয়ার সময় 'সিবিএফসি' (সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সার্টিফিকেশন) কোনও আপত্তি তুললে বা তার সিদ্ধান্ত সিনেমার প্রযোজক-পরিচালকের পছন্দ না হলে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য 'এফসিএটি'র কাছে যাওয়া যেত। বিজেপি সরকার ইতিমধ্যে 'এফসিএটি' (ফিল্ম সার্টিফিকেশন অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল)-কে তুলে দিয়েছে।

এর আগে নানা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ পুণে ফিল্ম ইন্সটিটিউটের শীর্ষপদে দলীয় নিয়োগ হয়েছে। বিজেপি'র মতাদর্শগত উৎস-সংগঠন আরএসএস-এর উগ্র হিন্দুত্বের ভাবধারায় আচ্ছন্ন, ইতিহাস বিকৃত করা সিনেমার প্রচার ও প্রসার বাড়ানোর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সিনেমা হলে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত শোনার ফরমান দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এটা স্পষ্ট যে, একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ধাপে ধাপে বিজেপি সরকার এগোচ্ছে। এর আগে কংগ্রেস সরকারও, জরুরি অবস্থার সময় (১৯৭৫-'৭৬)-তো বটেই, তা ছাড়াও নানা সময়ে নানা ছলে বলে কৌশলে সিনেমার বিষয়বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করার সমস্ত অপচেষ্টা করেছে। এই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক সিনেম্যাটোগ্রাফ আইনের এহেন সংশোধনে স্বভাবতই বেশ কয়েকজন সিনসিয়ার চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্ব জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সরকারের হাতে সিনেমার বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ করার এই 'সুপার সেন্সর পাওয়ার' থাকা গণতন্ত্রের পক্ষে আদৌ কল্যাণকর কি না সে প্রশ্ন নানা মহলে উঠেছে।

এ-কথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, সমস্ত শিল্প মাধ্যমের মধ্যে সিনেমা হল সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। শিল্প সম্পর্কে কথা আছে, 'Art can touch people and make them open up.' সিনেমা এই ওপেন-আপ করার কাজটা করতে পারে সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়ে। রাশিয়ায় মহান নভেম্বর বিপ্লবের (১৯১৭) পর লেনিন গোটা বিশ্বের সামনে সিনেমার গুরুত্বকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। অনুন্নত, অনগ্রসর বিশাল রাশিয়ার অগ্রগতির কাজে, জনশিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের কাজে, জনগণের কাছে মহান বিপ্লবের আবেদন পৌঁছে দেওয়ার কাজে অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসাবে সিনেমার উপযোগিতা আবিস্কার করেছিলেন তিনি। ১৯২২ সালের একটি সার্কুলারে লেনিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'Film for us is the most important of the arts.' সেই সময়ের ছোট ছোট নির্বাক (সবাক চলচ্চিত্র আসে ১৯২৭-'২৮ নাগাদ) ছবি নিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে চলে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর উদ্যোগেই আইজেনস্টাইন, পুদভকিন-সহ এক ঝাঁক তরুণ চলচ্চিত্রকার হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন। বিশ্ব চলচ্চিত্রের উন্নতি ও অগ্রগতিতে এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে চেতনার বিকাশে তাঁরা কী অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন সে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু যেটা বলার তা হল, সর্বোন্নত শিল্পমাধ্যম হিসাবে জনমত

গঠনের ক্ষেত্রে, জনমতকে প্রভাবিত করার প্রশ্নে সিনেমা দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করে। আর ঠিক এই কারণেই অন্যান্য বহু কিছুর মতো সিনেমার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটাও আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়।

শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ, এটা শুনলেই কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। শিল্পের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হচ্ছে মনে করেন। এই ধরনের ক্ষোভ বিচারসাপেক্ষ। যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ সমস্ত কিছুর উপরই রাখতে হয়, ব্যক্তিগত পরিসরে, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পরিসরে নিয়ন্ত্রণ রাখতেই হয়। তা না হলে কোনও কিছুরই শৃঙ্খলা থাকবে না। আবার, শৃঙ্খলা রাখতে গিয়ে যেন শৃঙ্খল পরিয়ে দেওয়া না হয় সেটাও দেখতে হবে। এই দেখাটাই পরিমিতিবোধ। সিনেমার ওপর নিয়ন্ত্রণ কারণ, ধনতান্ত্রিক বাজারে সিনেমা একটি সুবিশাল বাণিজ্যিক পণ্য। মুনাফা লোটার উদগ্র প্রতিযোগিতার কারণে এক শ্রেণির সিনেমায় হিংসা, অশ্লীলতা, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিদ্বেষের উসকানি ইত্যাদির প্রবেশ ঘটে সাংঘাতিকভাবে। এ জিনিস বারবার সমাজের সংহতিকে, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যকে আহত করে, শিশু-কিশোর মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। তাই, কাজের প্রয়োজনে আগুন জ্বালানো দরকার ঠিকই। আবার একই সাথে সেই আগুনের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকাটাও একান্ত জরুরি, নয়তো সব পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। তাহলে প্রশ্ন, সিনেম্যাটোগ্রাফ আইনে রদবদল ঘটিয়ে বিজেপি সরকার যে সিনেমার বিষয়বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে তাতে আপত্তি কী?

উত্তরে বলতেই হবে, হ্যাঁ, আপত্তি আছে। ঘোরতর আপত্তি আছে। আপত্তির প্রধান কারণ, বিজেপি সরকার সিনেমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে কোনও গঠনমূলক সামাজিক স্বার্থবোধ থেকে নয়, বরং দলীয় সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশে। সে চাইছে সিনেমা এমন হোক যাতে তার দলীয় উগ্র হিন্দুত্ববাদী ধারণার প্রচার ও প্রসার সমৃদ্ধ হয়। যে সিনেমা সেই কাজটা করবে এবং সেটা করার জন্য অবলীলায় ইতিহাসকে বিকৃত করবে, কল্পকাহিনীকে ইতিহাস বলে চালাতে চাইবে সেই সিনেমা এক-কথায় ছাড়পত্র পেয়ে যাবে। আর যে সিনেমা বিজেপি'র এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করবে, তার সঙ্কীর্ণ মতাদর্শকে প্রশ্ন করবে সেই সিনেমার প্রদর্শনের অনুমতি কিছুতেই পাওয়া যাবে না অথবা শর্তসাপেক্ষ অনুমতি পেতে দীর্ঘকাল কেটে যাবে। এই ধরনের স্বৈরাচারকে আরও বেশি করে, আরও শক্তপোক্তভাবে আইনী ঘেরাটোপে আনাটাই সিনেম্যাটোগ্রাফ আইন সংশোধনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

বিজেপি সরকারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য যে এইটাই সেটা কিসের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে? এ কথা বলার ভিত্তি অবশ্যই আছে। অত্যন্ত সঙ্গত ভিত্তি আছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। গত বছর 'তানাজি' নামে একটা হিন্দি সিনেমা হয়েছে। প্রচার করা হয়েছিল, তানাজি হল একটা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক যা মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সিনেমাটির ছত্রে ছত্রে হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য মরিয়া চেষ্টা করা হয়েছে এবং সে জন্য ইতিহাসকেও বিকৃত করা হয়েছে। খুব সংক্ষেপে বলা যাক। মহারাষ্ট্রের কোন্ধানা দূর্গ তখন মুঘলদের দখলে। সে দূর্গ পাহারা দিচ্ছে ঔরঙজেবের এক সেনাপতি উদয়ভান সিং। ওই দূর্গ পুনর্দখল করার যুদ্ধে শিবাজি তাঁর এক সেনাপতি তানাজি-কে দায়িত্ব দেন। যুদ্ধে তানাজি নিহত হলেও দূর্গ পুনর্দখল সম্ভব হয়। এই হল ইতিহাস। এখানে হিন্দু-মুসলমানের কোনও ব্যাপারই নেই। দু'জন দখলকারী শাসকের পারস্পরিক যুদ্ধ। তাই এখানে দেশেপ্রেমেরও কোনও ব্যাপার নেই। অথচ একে নিয়েই কার্যত ভারত-পাকিস্তান বা বলতে হয় হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের রগরগে সিনেমা তৈরি হয়ে গেল। ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন এবং একপেশে ঢঙে তানাজিকে এক অতিমানব এবং উদয়ভানকে ক্রুর রূপে তুলে ধরা হল।

কেউ বলতে পারে, দেশপ্রেম নেই কোথায় মশাই? এই যে বহিরাগত মুঘল সম্রাটদের বিরুদ্ধে লড়াই, এই তো দেশপ্রেম। এক্ষেত্রে বলতে হয়, প্রথমত, মুঘল সম্রাটদের মধ্যে বাবর, হুমায়ুন ও আকবর ছাড়া প্রত্যেকেরই জন্ম ভারতীয় মহিলার গর্ভে। এঁদের মধ্যে জাহাঙ্গির ও শাজাহানের মা ছিলেন রাজপুত মহিলা। দ্বিতীয়ত, ১৭৫১ থেকে ১৭৬১ সাল পর্যন্ত বাংলায় মারাঠা সেনাপতিরা যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও লুঠপাট চালিয়েছে, সেটা কোন দেশেপ্রেমের নমুনা? আর, মুঘল সম্রাটরাও ধর্ম দেখে যুদ্ধ করেনি। তাহলে বাবর ইব্রাহিম লোদিকে এবং তাঁর কয়েক

হাজার সৈন্যকে হত্যা করত না। বাংলার ঈশা খাঁ'র বিরুদ্ধে আকবর মান সিংহকে পাঠাতেন না। বিজাপুর দখলের জন্য ঔরঙজেব আদিল শাহি সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না।

ফলে মুঘলদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ অথবা দেশপ্রেমের যে উদ্গীরন তানাজি সিনেমার মাধ্যমে করার চেষ্টা হয়েছে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সহজেই বোঝা যায়। সে কারণেই গেরুয়া ঝাণ্ডাকেও বারবার মহিমান্বিত করার চেষ্টা হয়েছে। তানাজির মায়ের মুখে সংলাপ, 'যব তক কোন্ধানা মে ফির সে ভগওয়া নেহি লহরতা, হাম জুতে নেহি পেহেনেঙ্গে।' তানাজির মুখে সংলাপ, 'হর মারাঠা পাগল হ্যায় স্বরাজ কা, শিবাজি রাজে কা, ভগওয়ে কা।' কোন ভগওয়ার কথা বলা হচ্ছে? যেখানে ওঁ লেখা রয়েছে। এর বিরুদ্ধে মারাঠাদের এক গোষ্ঠী মামলা করেছিল। সিনেমার নানা বিষয় নিয়ে আরও বহু আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু কোনও কিছুই তাকে প্রদর্শনের পথে বাধা দিতে পারে না। কারণ, সিনেমাটি শাসক দল বিজেপির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে। পাশাপাশি, 'মহল্লা আস্সি' সিনেমাটির কথায় আসা যাক। ২০১৫ সালে তৈরি এই সিনেমাটিতে বেনারসের প্রখ্যাত আস্সি ঘাট সংলগ্ন এলাকার জনজীবনকে ভিত্তি করা হয়েছে। দরিদ্র মানুষের অসহায়তা, পুঁজির থাবায় তাদের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখানো হয়েছে। ধর্মের নামে ভড়ং দেখানো হয়েছে। ধর্মের ভেকধরা কর্তৃত্বের গা-জোয়ারি দেখানো হয়েছে। কাশীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাস বলা হয়েছে। সিনেমাতে বাবরি মজসিদ ভাঙার অন্যায়, 'মন্দির ওহি বানায়েঙ্গে' মার্কা দুষ্ট রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ফলে সিনেমাটিকে কিছুতেই প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হল না। সরকারের প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও, অনেক পরে, দীর্ঘ আইনী লড়াইয়ের পর, ২০১৮ সালের নভেম্বরে সিনেমাটি মুক্তি পেল। সিনেম্যাটোগ্রাফ আইনে সংশোধনী আনার, সরকারের হাতে 'সুপার সেন্সর পাওয়ার' আনার প্রয়োজনীয়তা এই কারণেই দেখা দিয়েছে যাতে 'মহল্লা আস্সি' ধরনের সিনেমার প্রদর্শন চিরতরে আটকে দেওয়া যায়।

এই ধরনের বহু উদাহরণ আছে। এখানে সেসব উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিজেপি সরকারের এই পদক্ষেপগুলি বন্ধ করা দরকার। যে অশ্লীল, আজগুবি এবং মারামারি-রক্তপাতের সিনেমা সমাজ মননে অসুস্থ প্রভাব বিস্তার করে সেগুলি সরকার আটকাক। কিন্তু যে সিনেমা সত্য অন্বেষণ করতে চায়, চিরাচরিত সংস্কারকে প্রশ্ন করতে চায়, সমাজকে দেখার চোখ তৈরি করতে চায়- সে সব সিনেমা প্রদর্শিত হতে দেওয়া উচিত। নানা মত, নানা ব্যাখ্যার মতাদর্শগত বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সামাজিক চিন্তা এগোয়। আবার, শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সহজে একাজ করে না। তার জন্য সাধারণ শিল্পীদেরও লড়তে হয়, আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়। আগামী দিনে বিজেপি সরকারের এই ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই হবে, সিনেমা সামাজিক অগ্রগতিতে বড় ভূমিকা নেবে এই আকাঙ্ক্ষা থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই সক্রিয় হওয়া দরকার। □

প্রতিবেদক : সুব্রত দাস

কবি শঙ্খ ঘোষ

সংঘমিত্রা চট্টোপাধ্যায়

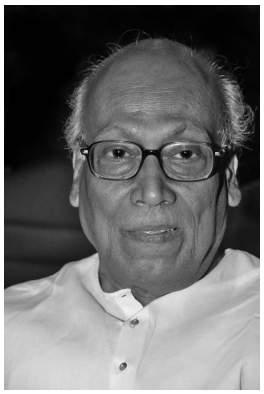

এক সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-ভবনে কবি শঙ্খ ঘোষের সাথে দেখা করতে এসেছেন এক ভদ্রলোক। পারিবারিক সূত্রে পাওয়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত কিছু দুর্লভ ছবি আর চিঠি বিক্রির আশায়। শুনলেন, অর্থমূল্যে বিনিময় হচ্ছে না এসব জিনিস। শঙ্খ ঘোষ তাঁকে বললেন, 'ভরসা করে আছি অনেকে হয়ত দান হিসাবেই দেবেন এসব, দেবেন একটা দায়িত্বের বোধ থেকে।'

ভদ্রলোক জানালেন, বড় অর্থকষ্টে আছেন তিনি। তাই বিনামূল্যে এসব দেওয়া আপাতত সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। ট্রেন ধরে অনেকদূর ফিরবেন বলে তিনি বিদায় নিলেন। আবার ফিরে এলেন রাত আটটায়। বললেন, 'রবীন্দ্রভবন থেকে ফিরে আপনার বলা কথাগুলি অনেকক্ষণ ভেবেছি আমি। ভেবে দেখলাম, সত্যি তো, এ তো আমাদের সবারই দায়িত্ব। তাই আমি মন পাল্টেছি। বিক্রি করে যেটা পাব তাতে কদিনই বা চলবে? তার চেয়ে রবীন্দ্রভবনেই থাক এ সব। আমারও যৎসামান্য দান হিসেবেই।' শঙ্খ ঘোষ লিখছেন, 'চোখে জল এল আমার'।

অনেক বিশিষ্ট মানুষের পাশাপাশি এমন সব সাধারণ মানুষের উজ্জ্বল মুহূর্তকে ধরে রেখেছেন শঙ্খ ঘোষ। তাঁর 'নিরহং শিল্পী' বইতে। মনে রেখেছেন। বলেছেন, 'শিল্পী শব্দটির তাৎপর্য বহুদূর প্রসারিত হতে পারে। চলচ্চিত্রের সঙ্গীতের নাট্যের চিত্রের ভাস্কর্যের সাহিত্যেরই শুধু নয়, শিল্পী কেউ হতে পারেন জীবনেরও, যাপনেরও।' কিছু নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, কিছু অন্যের মুখে শোনা ঘটনা, সব মিলিয়ে শঙ্খ ঘোষ বইটির সব লেখাতেই জোর দিয়েছেন এই যাপনের দিকটায়। অত্মবিজ্ঞাপনের ক্ষুদ্রতা যখন যুগধর্ম, সেরকম একটা সময়ে দাঁড়িয়ে শিল্পী হিসাবে, মানুষ হিসাবে নিরহং থাকার দায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

সাহিত্যের গোড়ার কথা সংযোগ। ওপারের মানুষটির সাথে সংযোগ তৈরি করা, কিছু কথা তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া, যা কোনও ভাবে তাঁকে ভাবাবে, তাঁর বেঁচে থাকাকে আরেকটু অর্থবহ, আরেকটু প্রেরণাময় করবে। অথচ একটু জানা, বোঝা, বলতে পারার অহং এই গোড়ার কথাটা ভুলিয়ে দেয় প্রায়শই। দুর্বোধ্যতাকেই সার্থকতা ভেবে মূর্খের স্বর্গে বাস করি আমরা। শঙ্খ ঘোষ একটি বক্তৃতায় বলছেন, 'এই অহমিকা, যে, আমি এমন-কিছু বলছি যা অন্যের আয়ত্তের বাইরে। অর্থাৎ, এইখানে আমি পৃথক, এইখানে আমি খানিকটা উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। আর, সেই পৃথক অধিষ্ঠানকে সম্ভ্রম করছে অন্য লোকে। না-বুঝবার সম্ভ্রম। আমার বুঝবার বা জানবার ক্ষমতার প্রতি অন্যের অক্ষমতার সম্ভ্রম । আর এইটেকেই আমি আমার স্বতন্ত্রতা বলে ভাবছি, ভেবে তৃপ্ত হচ্ছি।....

এখান থেকে উঠে আসা এই প্রশ্নটা তবু জরুরি যে কীভাবে, কতটা সহজে,কোনো ভাবনাকে আমরা পৌঁছে দিতে পারি শ্রোতার কাছে, বা পাঠকের কাছে।' ('অন্ধের স্পর্শের মতো', প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা ২০০৭)। এইখানেই শঙ্খ ঘোষের সাহিত্যদৃষ্টির সৌন্দর্য, কবিতারও।

এনআরসি-সিএএ'র নামে আজ যখন কেন্দ্রীয় সরকার খেটেখাওয়া মানুষের আজীবনের আশ্রয়ভূমি কেড়ে নিতে চাইছে, শঙ্খ ঘোষের কলমে সেই নিজভূমে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর অসহায়তাকে অনুভব করছি আমরা :

'গোধূলিরঙিন মাচা, ও পাড়ায় উঠেছে আজান

এ পাড়ায় বসে ভাবি - দুনিয়া আমার মেহমান
এখনও পরীক্ষা চায় আগুন সমাজ
এ মাটি আমারও মাটি - সে কথা সবার সামনে
কিভাবে প্রমাণ করব আজ।'

বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর কবিতার দিকে চোখ ফেরালে বারবার ধরা পড়ে এই সহজে পৌঁছানোর তাগিদ বা দায়বোধ।

'যমুনাবতী'র কথাই যদি ধরি, প্রথম পড়ার সময় আমরা অনেকেই হয়তো জানি না ১৯৫১'র পটভূমি। কোচবিহারে খাদ্য আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলিচালনায় কিশোরীর মৃত্যুর কথা। কিন্তু লাইনগুলো বুকে ঝড় তোলে। শুনতে, আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করে বারবার।

'কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে,
জ্বলে না—
মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না—
চলল মেয়ে রণে চলল!
বাজে না ডম্বরু, অস্ত্র ঝনঝন করে না, জানল না কেউ তা
চলল মেয়ে রণে চলল!
পেশির দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে
চলল মেয়ে রণে চলল!'

অথবা, 'বাবরের প্রার্থনা'র প্রথম স্তবক। মুখে মুখে প্রায় প্রবাদের মতো হয়ে ওঠা কটি লাইন-

'এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত—
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।'

মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের শিয়রে অসহায় পিতার এই যে প্রার্থনা, আমাদের অতি পরিচিত। কিন্তু ছবিটা যেমন করে আঁকলে পরিচিত মুহূর্ত স্মরণীয় কবিতা হয়ে উঠতে পারে, শঙ্খ ঘোষের কলমের সেই প্রসাদগুণ আমাদের বারবার মুগ্ধ করেছে।

১৯৭৫-'৭৬-এ রচিত 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থের কবিতা 'আপাতত শান্তিকল্যাণ' :

'পেটের কাছে উঁচিয়ে আছো ছুরি
কাজেই এখন স্বাধীনমতো ঘুরি
এখন সবই শান্ত, সবই ভালো।
তরল আগুন ভরে পাকস্থলী
যে কথাটা বলাতে চাও বলি
সত্য এবার হয়েছে জমকালো।'

জরুরি অবস্থার স্তব্ধরোধিতায় যা লিখেছিলেন, আজ পঁয়তাল্লিশ বছর পর পেরিয়ে যদি পড়ি, মনে হয় বিজেপি শাসিত বর্তমান ভারতের ছবিই তুলে ধরছে লাইনগুলো।

১৯৮৯-এর জানুয়ারিতে দিল্লির বুকে পথনাটিকা চলাকালীন কংগ্রেস-পোষিত দুষ্কৃতীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন তরুণ নাট্যকর্মী সফদার হাশমি। তার ঠিক দুদিন বাদে সফদারের স্ত্রী মালা নাটকের গ্রুপ নিয়ে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেদিনের অসমাপ্ত নাটকটি পুনরাভিনয় করেন। শঙ্খ ঘোষ এই অনন্য ঘটনার প্রেরণায় লিখেছেন 'মালা বা পুনম' :

"তোমার স্বাচ্ছন্দ্য দেখি দূর থেকে।
রঞ্জন্দনরা খুন হলে তুমি বল 'মরেনি ও আমার ভিতরে বেঁচে আছে
কাজের ভিতরে আছে, ধুলোর ভিতরে, পায়ে পায়ে।'...
তোমার স্বাচ্ছন্দ্য দেখি দূর থেকে
তোমার দর্পও দেখি দূর থেকে
যে-জল তোমার চোখে ছিল না কখনো আমি সেই জল ভরে রাখি ঘটে ঘটে।"

সাম্প্রতিক অতীতে সিপিএম সরকারের অন্যায় জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে অশক্ত শরীরে মিছিলে হেঁটেছেন শঙ্খ ঘোষ। বাংলার রাজনীতিতে সে এক উত্তাল সময়। সিপিএম নেতা প্রকাশ্যে প্রতিবাদীদের লাইফ হেল করার কথা বলছেন। বিরোধীদের প্রতি সদম্ভ কটূক্তি, কণ্ঠরোধ করা, গ্রেপ্তারি চলছে দিনরাত। সেই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বর্ষীয়ান কবি লিখছেন 'স-বিনয় নিবেদন' :

'আমি তো আমার শপথ রেখেছি, অক্ষরে অক্ষরে
যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন, দিয়েছি নরক করে।
দাপিয়ে বেড়াবে আমাদের দল, অন্যে কবে না কথা
বজ্রকঠিন রাজ্যশাসনে, সেটাই স্বাভাবিকতা।'

দলমত-নাগরিকসমাজ নির্বিশেষে যাঁরা সেদিন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন,

সিপিএম সরকার তাঁদের দিকে আঙুল তুলে বলেছিল 'বহিরাগত'। শঙ্খ ঘোষ লিখলেন 'বহিরাগত' কবিতা :

'আমার কথা কি বলতে চাও না? নিশ্চিত তুমি বহিরাগত

উঁচু স্বর তুলে কথা বলে যারা জেনে নাও তারা বহিরাগত...

মাঠে মাঠে ধরে যেটুকু ফসল সেসব এখনও বহিরাগত

চালার উপর ঝুঁকে পড়ে চাঁদ বহু দূর থেকে বহিরাগত'

সুদূর আকাশের চাঁদ তার জ্যোৎস্নার সম্ভার নিয়ে উঁকি দেয় গৃহস্থের চালাঘরে। তাকেও কি তাহলে বহিরাগত বলবে? এই যে অনুপম চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ, এই যে ঘটমান সমাজ-রাজনীতির পরিসরে কবিতাকে এমন অপরিহার্য করে তোলা, কবির শক্তি বা কবির প্রয়োজন এখানেই অনুভূত হয় বারবার। সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত সময়ের অভিজ্ঞান হয়ে ওঠার এই ধারাবাহিকতা আমরা পেয়েছি শঙ্খ ঘোষের কবিতায়।

'মাওবাদী', 'মুক্ত গণতন্ত্র' কবিতায় তৃণমূলের অপশাসনের খতিয়ান, 'তিসরা ঝাঁকি'তে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট বিজেপি-র নারকীয় উত্থান :

'গলায় মুণ্ডুর মালা তা থৈ তা থৈ নাচে
গোটা দেশ হয়েছে ভাস্বর
আজ সে পরীক্ষা হবে আমরা শুধু শববাহক
নাকি কোনও সত্যভাষী স্বর!'

দক্ষিণের সংগ্রামী কবি চেরাবান্ডারাজু'র কবিতা যখন শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে পড়ছি (সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সুরে গান হিসাবে অনেকেই শুনেছি আমরা) আশ্চর্যভাবে লাইনগুলো হয়ে উঠছে এই বিভেদকামী সময়ের জীবন্ত স্বাক্ষর—

'কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
মাটি ছেনে যখন ইঁটের পাঁজা বানাচ্ছি
যে ইঁট দিয়ে তৈরি হবে তোমাদের ওই ঘর,
খিদেয় ধুঁকে বইছি যখন শস্য এ বুক ভর।'

দুর্বোধ্যতার দেওয়াল তোলার কোনও প্রচেষ্টা ছিল না বলেই শঙ্খ ঘোষের কবিতা নিছক অ্যাকাডেমিক পরিসরে আটকে থাকেনি, সময়ের সীমারেখা অতিক্রম করে লেখায় নাটকে স্লোগানে পোস্টারে উঠে এসেছে 'পুলিশ কখনো কোনও অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ', 'নিয়ন আলোয় পণ্য হল যা কিছু আজ ব্যক্তিগত' অথবা, 'আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি'র মতো অনেক পঙক্তি, স্তবক।

'আত্মতৃপ্তির বাইরে' প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, 'এই একটা সময়, যখন কবিতার জগৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে সুখী আর ছোট, যখন বড় কোনও আত্মবিস্তারের দিকে এগিয়ে যেতে ভুলে যাচ্ছি আমরা।' আত্মবিস্তারের নিরন্তর সাধনা নিয়েই শঙ্খ ঘোষের কবিতা ছুঁয়ে গেছে জরুরি অবস্থা থেকে মরিচঝাঁপি, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, কেন্দ্রের স্বৈরাচারী শাসন।

রবীন্দ্রনাথের একটি অসাধারণ কথা আছে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলে তবেই তাকে সাহিত্য বলে। সত্যকে শিল্পিত রূপে তুলে ধরার দায়বোধ সাহিত্যের আছে, এই মূল কথাটাকে স্বীকার করে, সাধারণ মানুষের দুঃখবেদনার সাথে সম্পৃক্ত থেকে যাঁরা সাহিত্যসাধনা করে গেছেন, শঙ্খ ঘোষ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এই ক্ষয়িষ্ণু সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা যেন মনে রাখি। □

গল্প

লকডাউন ও দুই চোর

চঞ্চল ঘোষ

জয়পুল গ্রামটা যশোর রোডের দুই ধারে ছড়িয়ে আছে। গ্রাম বললে যে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, জয়পুলের কোথাও তার ছিটেফোঁটাও চোখে পড়বেনা। পাড়া, গলি আর কলোনী মিলে মোটামুটি একটা মফস্বল। যে হাজার দশেক লোক সেখানে থাকে তাদের কেউ চাকরী করে, কেউ দোকানদার, কেউবা দিনমজুর। এককালে যে গ্রাম ছিল তার চিহ্নস্বরূপ কয়েক ঘর কৃষিজীবীও আছে। রাস্তার পশ্চিমদিকের বসতি হিন্দুপ্রধান, আর পূর্বদিকের লোকালয়ে মুসলিমরাই সংখ্যায় বেশী। কিন্তু এদের সকলেই একডাকে চেনে ছিদে আর ফলুকে। শ্রীদাম থেকে ছিদাম, তার থেকে ছিদে, আর ফজলু থেকে ফলু — নামে কিবা আসে যায়। দুজনেই চোর। চুরি করাই তাদের প্রধান পেশা, 'কাজ' না পেলে তখন অন্য কিছু করে।

ছিদে পুরানো চোর। চুরি করাটা তার কাছে একটা শিল্প। এত নিঃশব্দে কাজ সারে যে কেউ কিচ্ছুটি টের পায়না। মোড়ের মাথায় পটলার চায়ের দোকানে সেবার মানিকবাবু ছিদেকে অনেক করে বোঝালো, ছিদে চুরি করিস না। চুরি করা পাপ। স্কুল মাস্টার মানিকবাবু রিটায়ার করার পর বোষ্টম হয়েছেন, গলায় কণ্ঠির মালা। ছিদে সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে বলল, ওসব ছেড়ে দিয়েছি ঠাকুরমশাই। গদগদ মানিক গোস্বামী আশীর্বাদ করে বললেন - থাক বাবা, থাক। ধর্মে-কর্মে যেন মতি হয়। তা ধর্মে না হলেও কর্মে যে ছিদা মেরমতি আছে সেটা বোষ্টম ঠাকুর টের পেলেন একটু পরেই। সাষ্টাঙ্গেপ্রণাম করার ফাঁকে তাঁর নতুন চটি জোড়া কখন গায়েব করে দিয়েছে ছিদে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুলুক-সন্ধান যিনি করে বেড়াচ্ছেন, নিজের চটি খুঁজে পাননা তিনি। গজগজ করতে করতে বললেন — আঃ, ছিদেটার স্বভাব গেলনা!

ফলু পেশায় নতুন। তাও বছর পাঁচেক হয়ে গেল। ধর্মে আলাদা হলে কি হবে, ছিদেকেই সে গুরুমানে। কাজটা ফলু ভালোই শিখেছে, কিন্তু বড্ড অলস। বউয়ের ঠেলা-গুঁতোয় রাতের বেলা কাজে বার হয় সে। ছিদের বাড়ি গিয়ে বলে — গুরুচলো, ঘরে চাল বাড়ন্ত। হাতে কোঁচ নিয়ে ছিদেকে বেরোতে দেখে ফলু বলে, ওটা কেন?

— আঃ চলনা, বকবক করিস না।

তাদের দেখে গৃহস্থরা গরমকালে জানলা বন্ধ করে, খিড়কির দরজায় খিলের সাথে তালাও লাগায়। পশুপতি তার সারের দোকানের ঝাঁপ ফেলছিল। ওদের দেখে বলে, কিরে শাকরেদকে নিয়ে সিঁধ কাটতে বেরোলি।

— ছিছি, রামরাম। ওসব কাজ অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি দাদা। জিভ কাটে ছিদে। বলে, দেখছোনা কোঁচ নিয়ে বেরিয়েছি, দেখি যদি খালে শোল, ল্যাটা, কুচে পাই দু-চারটে।

— তা হ্যাঁরে, খালে জল আছে নাকি?

— কমে গেছিল। বিষ্টি হলো দু'দিন, একটু জল বেড়েছে। বিড়ি থাকে তো দাওনা একখান, খাই।

চোর হোক, বিড়ি -আগুন থাকলে চাইলে দিতেই হয়। ট্যাঁক থেকে বিড়ির প্যাকেট আর দেশলাই-বাক্সটা বার করে দেয় পশুপতি। সারের দোকানের দাওয়ায় বসে বিড়ি খায় দুজনে। পশুপতিও তাদের পাশে বসে। পুরানো দিনের গল্প করে। — সেই যখন বর্ষার পর বিলের মাঠে যেতুম। চুবড়ি দিয়ে মাছ ধরতাম — পুঁটি, মোরলা, খলসে। কারো পুকুর ভাসলে — পোনা, মাগুর, কই পাওয়া যেত। নালার মুখে ঘুনি-জাল বাঁধতাম। এখন তো মাগুর মানে হাইব্রিড।

বিড়ি শেষ হলে ছিদে বলল — চল ফলু, খালপাড়ে যাই।

খানিক তফাতে আসতে ফলু বলে, গুরু আজ কাজ করবে না?

— শুরু করে দিয়েছি।

— কখন!

— বিড়ি খেতে খেতে পশুপতির ট্যাঁক ফাঁক করে

দিয়েছি। ব্যাটা চড়া দামে চাষীদের সার বিক্রি করে বড্ড ঠকায়। আজ বুঝবে'খন।

— তাহলে চলো বাড়ি ফিরে যাই।

— ফিরে যাই কিরে! ওইটুকুতে দুজনের চলবে?

— কোথায় যাবে?

— মদন বোসের বাড়ি, ব্যাটাচ্ছেলে রেশন দোকান করে অনেক কামিয়েছে। চল যাই সেখানে।

কিন্তু মদনের বাড়ি গিয়ে দেখে তখনও লোকজন জেগে আছে। ছিদে গজগজ করে — এই লোকগুলোর জ্বালায় শান্তিতে যে একটু কাজ সারবো তার উপায় নেই। মাঝরাত অবধি টিভি দেখছে। কী দিনকাল পড়লরে বোবা! ফলু বলে — ছিদেদা তুমি তক্কে তক্কে থাকো, আমি ততক্ষণে একটু ঘুমিয়ে নিই। বলেই মশার কামড় থেকে বাঁচতে নিজের লুঙ্গিটা দিয়ে অদ্ভুতভাবে মুখটা ঢেকে পাঁচিলের ধারে শুয়ে পড়ল ফলু। একটুপরেই নাক ডাকতে থাকল তার। ছিদের চামড়া মোটা, মশার কামড়ে কিছু হয়না। মদন বাড়িতে কুকুর পুষেছে। চোর তাড়াবার কুকুর নয়, স্প্যানিয়েল। ছিদাম বলে — তুলোর বল। যতই শৌখিন হোক, কুকুর বলে কথা। বিজাতীয় গন্ধ নাকে ঢুকতেই গরগর করে। ছিদাম মনে মনে হাসে, বলে — দাঁড়াও বাবা, তোমার ওষুধ আমার কাছে আছে। কোঁচেগেঁথে কোত্থেকে কী-একটা মাছ নিয়ে এসে কোলাপসিবল গেটের ফাঁক গলিয়ে ছুঁড়ে দেয়। ব্যাস, কুকুর কুঁইকুঁই করে লেজ নাড়ে। ছিদাম হেসে বলে — খাও বাবা, মদন ঘোষের চাল-গম ঢের আছে, তারপরেও মাছের জন্য নোলা কসকস করে! ঘুষ পেয়ে কুকুর মুখ বন্ধ করল, কিন্তু ঝামেলা বাঁধালো বিড়াল। ঘুমন্ত ফলুর হাত ধরে এক টান মেরে মা বিপত্তারিণীর নাম জপতে জপতে তার ঘুরিয়ে তালা খুলে ছিদে ভিতরে তো ঢুকল। সব ঘর থেকে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে নাক ডাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। পা টিপে টিপে ভাঁড়ার ঘরের দিকে এগোতেই কাণ্ড ঘটল একখানা। ঘুম চোখে অন্ধকারে ফলুর পা গিয়ে পড়েছে পোষা মেনিটার ল্যাজে। ক্যাঁও করে বিড়াল দিয়েছে এক লাফ, আর ভয় পেয়ে ছিদে গিয়ে পড়েছে ডাইনিং টেবিলে। সঙ্গে সঙ্গে হুলুস্থুলু ব্যাপার। সবাই চিৎকার করছে — ধরধর!! মারমার !! কিন্তু কে ধরে, কে মারে ? সবাই নিজের নিজের ঘরে বন্দী, চুরি— মহাবিদ্যালয়ের ক্লাস ওয়ানের শিক্ষা অনুযায়ী ছিদে সব ঘরের শিকল তুলে দিয়েছে আগেই। হৈ-চৈ শুনে দু'জনে চোঁ-চা দৌড় দিয়েছে। খানিক দূর গিয়ে ছিদে দেখে আরে ফলু তো নেই ! হঠাৎ নজরে পড়ে কালী বোসের গোয়ালের পিছনে বসে সে ঝিমোচ্ছে। এদিকে হায় হায়!!! ধরা পড়লে নির্ঘাৎ বেদম পেটাই খাবে ছেলেটা। ফলুর জন্য রাগ হয়, আবার মন কেমনও করে। কী করা যায়? বিপদে পড়লে ছিদের মাথায় বুদ্ধি খেলে। সে তাড়াতাড়ি হাতের কোঁচটা দিয়ে জানলায় গোঁত্তা মারল। পাড়ায় চিৎকার- চেঁচামেচি শুনে বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙেই ছিল। ঘরের জানলায় আওয়াজ পেয়ে তারাও রে-রে করে উঠল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। দরজার বাইরে হ্যাচ বোল্টটা টেনে দিয়েছে ছিদে। তারাও চেঁচাতে লাগল — চোর-চোর, ডাকাত-ডাকাত — বাঁচাও !!! যে লোকেরা মদন ঘোষের বাড়ির দিকে দৌড়েছিল, তারা এবার লাঠি-সোঁটা নিয়ে কালী বোসের বাড়ির দিকে ছুটল। আর সেই ফাঁকে ছিদে এসে ফলুর কান পেঁচিয়ে বলল — হতভাগা, কাজ করতে এসে ঝিমোনো ! কানের বারান্দায় এমন একটা দেবো না যে বাপের নাম ভুলে যাবি। এমনই অলস ফলুটা।

লকডাউনের প্রথম দুই সপ্তাহ ফলু বাড়িতেই বসে রইল। বৌ বকবক করলে ফলু বলে — আমার কাজ ও লকডাউন।

— কেন? টিভিতে বলেছে বুঝি, লকডাউন বলে চুরি করা যাবেনা? বৌ মুখ ঝামটা দেয়।

— আরে বোঝনা, করোনা ভয়ঙ্কর রোগ। কে জানে কার বাড়িতে কী হয়ে আছে?

— তুমি তো কাউকে ছুঁতে যাচ্ছনা।

— আহা, পকেটে যে হাত ঢোকাবো সেখেনে যদি সর্দি-মাখা রুমাল থাকে?

— আমায় বুঝিওনা, বিয়ের পর থেকে দেখে আসছি গতর খাটাতে গেলে তোমার গায়ে জ্বর আসে।

— মেলা বকোনা। লোকের কাছে পয়সা নেই, খাবার নেই। কী চুরি করবে শুনি!

— তুমি দেখে বসে আছো। যাওনা বাজারে গিয়ে দেখো, মাংসের দোকানে লম্বা লাইন। তোমার মুরোদ নেই তাই ঘরে বসে আছো। ট্রেন চললে আমি ঠিক অন্য কোথাও কাজে যেতুম।

— দুত্তেরি! রেগেমেগে ঘাড়ে গামছা ফেলে ছিদের বাড়ির দিকে পা বাড়ায় ফলু।

ছিদে রাতের খাওয়া খেয়ে ঝাঁটার কাঠি ভেঙে দাঁত

খোঁচাচ্ছিল। ফলু বলল — মাংস খেলে নাকি ছিদেদা, দাঁত খোঁচাচ্ছ যে বড়?

—নারে, পুঁইডাঁটার আঁশ দাঁতের ফাঁকে আটকে গেছে। মাংস কোথায় পাবো? ডাল —ভাতই রোজ জুটছে না। পলানদের ক্ষেত থেকে লুকিয়ে একটু শাক-ডাঁটা এনেছিলুম তার চচ্চড়ি আর রেশনের চালের ভাত খেলুম আজ।

— সেই তো। আমারও একই অবস্থা। কচু - ঘেঁচু খেয়ে দিন কাটছে। কদ্দিন যে ভালো-মন্দ খাই না! এদিকে বাবুদের যেন মোচ্ছব লেগে গেছে। আপিস নেই, বাড়ি বসে মাইনে পাচ্ছে আর ভালো-মন্দ সাঁটাচ্ছে। আর আমাদের বেলায় হরিমটর। তোমার বৌমা যাদের বাড়ি কাজ করে তারা সব্বাই আসতে মানা করে দিয়েছে। ব্যাস, ইনকাম বন্ধ। চলো না গুরু, কাজে বেরোই।

—যাবি বলছিস, চ'; কিন্তু যাই কোথা বলতো? লোকের যা অবস্থা... সেদিন একা একা বেরিয়েছিলুম। কিচ্ছুটি পেলাম না! এই প্রথম খালি হাতে ফিরলুম। বউনি হল না।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে 'বান্ধব পল্লী'র মধ্যে দিয়ে বড় রাস্তায় উঠেছে। এমন সময় ঘ্যাঁস করে পুলিশের জিপ এসে থামল। - কিরে কোথায় যাচ্ছিস?

ছিদে দমবার পাত্র নয়। বলল, খাওয়ার পর জোর বেগ পেয়েছে — মাঠের দিকে যাচ্ছি স্যার।

— তোর? একই ব্যাপার, না অন্যগল্প?

—খুড়োর সাথে যাচ্ছি, রাত-বিরেতে সাপখোপ বেরোয়... এখন গরম পড়েছে।

—মুখে মাস্ক কোথায়?

পুলিশের এই এক রোগ। একটা না একটা ফ্যাঁকড়া বার করবেই। ছিদেও কম যায়না। বলল, আমার আবার এই সময় বিড়ি না খেলে ঠিকমত হয়না। মাস্ক পরে ওটা খাওয়া যায় না স্যার।

পুলিশ অফিসার রসিক মানুষ। যাওয়ার আগে বলে গেল, এবার থেকে বিড়ির জন্য মাস্কে একটা ফুটো করে নিবি।

একটা কালভার্টের ওপর বসে পড়ে ছিদে। ফলু অবাক হয়ে বলে — গুরু বসলে যে?

—কাজে বাগড়া পড়ল দেখলি না। গাড়ির সামনে বিড়াল রাস্তা কাটলে যেমন একটু দাঁড়িয়ে যেতে হয়, আমাদের কাজে বেরোবার সময় পুলিস রাস্তা কাটলে তেমন বসে যেতে হয়।

—এইজন্য তোমায় গুরু মানি। সব কিছু জানো —

— কিন্তু কারবাড়িতে যাই বলতো?

— তপনের বাড়ি চলো, গর্মেন্ট সার্ভিস।

— সে যাওয়া যায়, কিন্তু ওদের বাড়িতে পাশের বিড়া থেকে কুটুমরা এসে উঠেছে। কোনোরকমে চলছে। থাক এখন যাওয়া ঠিক হবে না।

— তবে প্রদীপের বাড়ি চলো, মাস্টার।

— ধ্যাত, টিউশনি করে, তাও এখন বন্ধ। তুই কোনো খবর রাখিসনা। স্কুল মাস্টার হলে দেখা যেত।

— তোমার মনটা বড্ড নরম গুরু।

— আহা সবকিছু খেয়াল রাখতে হবে না। দেখিস লকডাউনের পর কী অবস্থা হয়! হয় না খেতে পেয়ে মরবে, আর না হয়. চুরি-চামারি করবে।

— যা বলেছ। কিন্তু কোথায় যাই তাহলে?

— সামনের পাড়ায় একটা নতুন বাড়ি হয়েছে, চল সেখানেই যাই।

— তাদের কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই বুঝি?

— আছে হয়তো, কিন্তু আমি তো জানিনা। না জানলে পাপ নেই।

— তুমি পাপ-পুণ্যি মানো, না?

— আমাদের ধর্মে আছে পাপ করলে ভগবান শাস্তি দেয়। তোদের ধর্মে নেই?

— আছে, কেয়ামতের দিনে আল্লাতালা সাজা দেয়।

— তুই মানিস এসব?

— তুমিও তো মানো?

ছিদে খানিক চুপ করে থাকে। তারপর মুখ খোলে — ওসব পাপ-টাপ কিছু নেই বুঝলি। না হলে এদ্দিনে জগত উল্টে যেত। মান্যিগন্যি লোকেরা কে চুরি করে না বলতে পারিস? সকলে আমাদেরটাই দেখে।

— তাহলে যে বললে জেনে চুরি করলে পাপ হয়?

— পাপ নয়রে, মনটা কেমন করে। চল, যাই।

বাড়িটা গলির শেষ মাথায়। নতুন হয়েছে, এখনও জামা পরেনি, মানে প্লাস্টার হয়নি। ফলু বলে — এখনকার ঘরবাড়িগুলো কেমন ধারা সব — দেশলাই বাক্সের মত।

কোদ্দিয়ে যে ঢুকি?

— কেন, ছাদের ঘরের দরজা তো রয়েছে! কবে যে কাজ শিখবি?

ছিদের বকা খেয়ে ফলু তরতর করে ছাদে উঠে পড়ে। দেহটা তার পালকের মত হাটা। ছিদে ওঠে আমগাছের ডাল বেয়ে। হাঁপায়।

—দম লাগল নাকি গুরু?

— তোদের মত বয়স থাকলে কি আর ...

—জানলা খোলা থাকলে লগা দিয়ে টেনে আনতুম। গরমকালে কেন যে জানলা বন্ধ করে শোয় জানি না বাপু!

—চুরির ভয়ে। এখনো গ্রিল লাগায়নি বোধহয়।

কথা বলতে বলতে দরজার ফাঁক দিয়ে করাতের ব্লেডের মতো সরু একটা টিনের পাত গলিয়ে খিলটা নিঃশব্দে খুলে ফেলে ফলু। ছিদে খুশী হয়ে পিঠ চাপড়ে দেয়। ফিসফিস করে বলে — সাবাস! সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে একতলায় নেমে এসে দেখে পাশাপাশি দুটো ঘর ভেতর থেকে বন্ধ করা। একটা ইঁদুর দৌড়দৌড়ি করে খেলছিল, তাদের উপস্থিতিতে ভয় পেয়ে সিঁড়ির তলায় রাখা বস্তার পিছনে লুকোতে খচরমচর করে উঠল।

— কে? কে সিঁড়ির ওখানে? ঘরের ভেতর থেকে মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল।

ছিদে আর ফলু ভয়ে কাঠ, পালাবে কিনা ভাবছে। এমন সময় একটা পুরুষের গলা শোনা গেল, ইঁদুর-টিদুর হবে বোধহয়।

—আর চোর এলেইবা কী চুরি করবে? আছে কী আমাদের!

—বাড়িটা করতে গিয়েই তো ব্যাংকের সব টাকা —

—দু' দিন ধরে ছেলে-মেয়েগুলো শুধু নুন-ভাত খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। ছেলেটা না হয় বড়, মেয়েটা ক্কমাত্র তিন বছর বয়সেই এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হল ওকে... কান্নায় গলাটা বুজে আসে মায়ের।

—এই সময় রেশন কার্ডটা থাকলেও খানিকটা চাল-আটা পাওয়া যেত। ট্রান্সফারের ফর্ম ভরেও কিছু লাভ হলনা।

— ছোট কার্ডেরও তো ফর্ম ভরেছিলে?

—ডিজিটালকার্ড? ভরেছিতো... একবার লাইনে দাঁড়িয়ে মারামারি করে, আর একবার অনলাইনে... কিসুই হলনা।

— তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবেনা।

— মেজাজ দেখিওনা। রাস্তা-ঘাটে বেরোও, বুঝবে চারদিকে কী-সব চলছে! কাল বাদুড়িয়ায় হাঙ্গামা হয়েছে, পরশু হাওড়ায়। কাগজ পড়ো?

—আমার পড়ে কাজ নেই — কাল রাঁধবো যে, একটুও চাল নেই, সেই কথা ভাবো!!

— চোদ্দ বার এক কথা শোনাচ্ছ... চাল নেই জানি... পাবো কোত্থেকে? চুরি করে আনবো?

—চুরি কেন করবে...? ছেলে-মেয়ের জন্য ভিক্ষে করে আনো —

—ভিক্ষে করবো! জানো আমরা কোন বংশের —

—রাখো তোমার বংশ। বাচ্চাগুলো না খেয়ে মরছে, আর উনি উচ্চ-বংশ দেখাচ্ছেন!!! ক্লাবের ছেলেরা তো চাল-ডাল-আটা-সোয়াবীন দিচ্ছে, আনতে পারো তো —

—লাইনে দাঁড়িয়ে আমি আনতে পারবো না — পষ্ট বলে দিচ্ছি।

—আমি মা, মেয়েটা ক'দিন ধরে শুকনো ভাত খাচ্ছে... একটু দুধ নেই, এক টুকরো মাছ নেই, একটা তরকারী নেই — একমাস ধরে পাতলা ডাল আর ভাত, খেয়েছেও কোনোদিন এইভাবে! আমি আর পারছিনা!!! ডুকরে কেঁদে ওঠে মা। ঠিক আছে। তুমি না পারো, আমি যাবো — তোমার ঠুনকো প্রেস্টিজ নিয়ে তুমি থাকো।

—না, যাবেনা বলে দিচ্ছি! খবরদার যাবেনা!!!

—তাহলে একটু বিষ এনে দাও — ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে বিষ খেয়ে মরি।

—আমি বাদ যাই কেন —? আনলে চার জনের জন্যই আনব।

নিথর হয়ে কথাগুলো শুনছিল দুই চোর। অনেকক্ষণ চুপচাপ। ঘরের লোকগুলো হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে, কিংবা আকাশ-পাতাল ভাবছে। নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় ছিদে আর ফলু।

পরদিন নতুন বাড়ির বৌ দরজা খুলে দেখল সিঁড়িতে এক বস্তা চাল আর একটা থলেতে ভর্তি ডাল, আলু, সবজি রাখা আছে। দূর থেকে রাস্তার মাথায় হল্লা শোনা গেল। কারা যেন ক্লাবের তালা ভেঙে চাল-আলু চুরি করে নিয়ে গেছে।

গল্প

হিয়ার মাঝে

নিশাস্মৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোর ছ'টা। অ্যালার্ম বাজছে। কোনোরকমে হাত বাড়িয়ে অ্যালার্মটা বন্ধ করে হিয়া। পাশে শুয়ে আছে হিয়ার চার বছরের গাঙুর। খাটের অর্ধেক এর বেশি জায়গা এখন তার দখলে। হিয়ার মনেরও। আর একটু পরেই হলদেটে আলোর আভা নামবে গাঙুরের গালে। এই আলোর খেলা হিয়া রোজ দেখে, পুরনো হয় না। ঘোর কাটে না যেন। অনিমেষের সঙ্গে প্রথম দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘার আলোর মুকুট পরার দৃশ্য মনে পড়ে। প্রবল আবেগে অনিমেষের হাত চেপে ধরে হিয়া বলেছিল — ''এসব সত্যি অনিমেষ? পৃথিবী এত সুন্দর? তবে জীবন সুন্দর নয় কেন?'' ''সব সুন্দর হবে হিয়া'', সেই সূর্যোদয়ের মতোই সত্য ছিল অনিমেষ হিয়ার কাছে। সব সুন্দর হয় না, হিয়া জানে, তবু অনিমেষের সাথে সে অসুন্দরের সঙ্গে আপস করবে! ভোরে এই সময়টায় অঘোরে ঘুমায় অনিমেষ। ওকে বড় ক্লান্ত দেখায়। বড় খাটুনি ওর। ঘুমন্ত সব মানুষের মুখই মায়াময়। অনিমেষ মুখ গুঁজে ঘুমায়। অনিমেষের ঘুমন্ত মুখে কী লেগে থাকে, হিয়া জানে না, আচ্ছা, ঘুমও তো এক ধরনের সাময়িক 'মৃত্যু'। মৃত মানুষের মুখেও কি মায়া থাকে? রাস্তায়, বস্তিতে, অফিসে, দোকানে, কারখানায়, ফুটপাতে লাইন দিয়ে মরে যাওয়া লোকেদের মুখেও কি মায়া থাকে? হিয়া ভাবতে থাকে। হিয়া আজকাল অনেক কিছু ভাবে। ঘুমন্ত গাঙুর জড়িয়ে ধরেছে হিয়ার হাত। বড় মায়া ...বড় বাঁধন ...কেন জানে না এই সাতসকালে হিয়ার চোখে জল চলে আসে। সবকিছুতেই বড় বেশি কান্না পায় হিয়ার। এত ভীতু মেয়ে, এত ভীতু হিয়া...

দুই

ছ'টা কুড়ি। রোজ এমন করেই সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সময় গড়িয়ে যায়। এবার উঠে পড়তে হবে। এসি.টা অফ করে হিয়া। ঠাণ্ডা ঘর থেকে বাইরের উষ্ণতায় বেরিয়ে আসে। এই বাড়িটা এখন অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবে। গাঙুরের তাড়া নেই। অনিমেষেরও আজ ছুটি। আর অতিমারির অতিরিক্ত ছুটিতে এখন হিয়ার জীবন জেরবার। হিয়া স্কুলে পড়ায়। মেয়েকে অন্য মানুষের জিম্মায় রেখে, এক বুক উৎকণ্ঠা নিয়ে তিন ঘন্টা দূরে মফঃস্বলের স্কুলে যায়। রোজ ঘড়ির সাথে You hit, I win game খেলে হিয়া। সেই খেলায় বিরতি চলছে আজ ছ'মাস। তবুও হিয়ার জন্য বাড়ির সবার তরফে চাপিয়ে দেওয়া একটা ঘড়ি আছে। হিয়া এখন তার সঙ্গেই দৌড়য়। দৌড়ের ট্র্যাকটা পাল্টেছে। দৌড়টা ঠিকই বজায় আছে হিয়ার। হিয়াদের দৌড় থামে না। তবুও এই সকালটার সঙ্গে রোজ কিছু ব্যক্তিগত আহ্লাদের মুহূর্ত কাটায় হিয়া। খুব ভালো লাগে, যে কথা কাউকে বলেনি, যে মারোয়ার বন্দিশ সে দুপুর বেলায় বার বার চালিয়ে শুনেছে, চাপা গলায় তার রেওয়াজ সারে গুণগুণ করে। যে শব্দদের পাশাপাশি সাজিয়ে লুকিয়ে সে কবিতা বানিয়েছে রাতভর, এই নিভৃত অবকাশে তাদের সে উচ্চারণ করে। গাঙুরকে কোলে নেওয়ার মতোই আনন্দ হয়। অনিমেষের কাছে পালিয়ে আসার দিনগুলোর মতো আনন্দ হয়। এই একলা সময়ে অনেক রাগ করতে ইচ্ছা হয় হিয়ার। অনেক ঝগড়া করে না কেন হিয়া? অনেক মেঘ জমেছে কি সম্পর্কের গায়ে? তবে বৃষ্টি পড়ে না কেন? শুধু শীত করে আর টুপটাপ রক্ত ঝরে রাতভর। তাও খিদে পায় হিয়ার যখন সব একটানে ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে, তখন পরপর গ্রাস মুখে তুলে, পরের বেলার সব কাজ গুছিয়ে রাখে হিয়া। একটা গ্লাসও ভাঙতে পারে না রাগ করে। ভাঙতে বড় মায়া লাগে, ভয়

করে। লক্ষ্মী মেয়ে ...আর খুব ভীতু মেয়ে হিয়া।

তিন

বিগত ছ' মাসের একঘেয়ে জীবনে আজ একটু ছেদ পড়তে চলেছে। আজ হিয়াকে স্কুলে যেতে হবে। এখন থেকে মাঝে মধ্যে স্কুলে যেতে হবে মাস্টারদের। এখন আর কেউ শিক্ষক নয়, সব মাস্টার হয়ে গেছে। মাস্টারগুলো বসে বসে মাইনে পেয়েছে অনেকদিন। এবার চাল, আলু, সাবান বিলি করুক গিয়ে। তা এসবে কোনো আপত্তি নেই হিয়ার, অন্য সময়ও কি এসব বিলোয় না তারা? পড়াশুনার চেয়ে এসবই বিলোয় বেশি। যাক সে কথা। কিন্তু যানবাহনের এই অসুবিধায় সত্তর কিলোমিটার যাওয়া নিয়ে আজ হিয়া একটু বেশিই চিন্তিত। মেয়েকে আজ অনিমেষের জিম্মায় রেখে যেতে হবে। তার উপর কাল সারারাত ঘুমাতে পারেনি হিয়া। রেল স্টেশনে পড়ে থাকা মায়ের মৃতদেহের পাশে, শিশুর সরল মনে খেলাধূলার ভাইরাল ভিডিও ক্লিপটা মানতে পারছে না হিয়া। গাঙুরের চেয়েও বয়সে খানিক ছোট ওই মায়ের সন্তান। ভোরবেলা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে হিয়া। নিজের মৃতদেহ দেখতে পায় সে। গাঙুর, অনিমেষ কাউকে দেখতে পায় না হিয়া। শুধু দেখে দূরে — কাঞ্চনজঙ্ঘায় তখন সবেমাত্র কমলা রঙ ধরেছে।

চার

সব কিছু গুছিয়ে বেরোতে বেরোতে আট'টা বেজে গেল। একটা টোটো ধরে সামলে সুমলে ভয়ে ভয়ে বাসস্টপে এসে পৌঁছলো তখন আট'টা পনের। এবার অপেক্ষা, কতক্ষণ যে বাসের জন্য দাঁড়াতে হবে ঠিক নেই। ট্রেন ছাড়া কখনো স্কুলে যায়নি হিয়া বিগত দশ বছরে। পৌঁছতে পারবে তো? এইসব ভাবতে ভাবতেই আনমনে তাকিয়ে থাকে উল্টোদিকের সরকারি হাসপাতালের গেটে। সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। হাসপাতালের ভিতরের কথা ভাবলেই গা শিউরে ওঠে হিয়ার। মহামারীর আঁতুড়ঘর। নিজের অজান্তেই আরও একবার নিজের হাত জীবানুমুক্ত করে হিয়া, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে কপালে। অবসন্ন লাগে। রাতভর উৎকণ্ঠা আর না ঘুমানোর ফল। বাড়ি ফিরে যাবে নাকি? আধঘন্টা হয়ে গেল, বাসের কোনও দেখা নেই। হঠাৎই সালোয়ার কামিজের ওড়নায় টান পড়ে হিয়ার। একটু কর্কশ গলাতেই চেঁচিয়ে ওঠে হিয়া — ''একি! একি! কি করছেন?'' মুখে মাস্ক নেই, নোংরা শাড়ি পরা, ভাঙা চেহারার এক মহিলা অপ্রস্তুত হয়ে যায়— ''এই ঠিকানাটা একটু বলে দাও না দিদি!'' আরে কী ঠিকানা? কী ব্যাপার? খিঁচিয়ে উঠতে গিয়েও ঢোক গিলে নেয় হিয়া। নোংরা শাড়ি পরা মহিলার কোলে একটি বছর দুয়েকের শিশু, অকাতরে ঘুমোচ্ছে। শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে যায় হিয়ার। রেলস্টেশনে মৃত মায়ের পাশে খেলা করা সেই শিশুটা না? না, না, তা কী করে হবে? মাথাটা যেন আরও ঝিমঝিম করে ওঠে। ভীষণ গা গুলিয়ে উঠছে হিয়ার।

— ''ও দিদি, তোমারও কি শরীর খারাপ লাগছে নাকি গো?''

— না, না ঠিক আছে। কোনও মতে সামলে নেয় হিয়া।

— কী হয়েছে ওর? বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

— অনেক জ্বর দিদি, আমরা অনেক দূরে থাকি। সেই হিঙ্গলগঞ্জে। বারাসাত, দত্তপুকুর সব হাসপাতাল ঘুরে এখানে এসেছি। জ্বর বলে সব হাসপাতাল দেখতে চায় না। এখানে আবার এই কাগজখানা ধরিয়ে দিলে। আর হাতে পয়সা নেই দিদি। এবার কোথায় যাব? তাই তোমায়...

— আচ্ছা, ঠিক আছে। দাও দেখি কাগজটা। হিয়া দেখে এন.আর.এস-এ রেফার করা আছে। দু-এক মুহূর্ত ভাবে। এন.আর.এস.-এ তার পরিচিত ক্লাসমেট ডাক্তার। দুম করে তাকে একটা ফোন করে ফেলে।

— হ্যাঁরে অর্পিতা, এন.আর.এস-এ পেশেন্ট নিয়ে গেলে একটু হেল্প করতে পারবি? একটা বাচ্চার খুব জ্বর।

— আচ্ছা, আচ্ছা। নিয়ে আয়। আজ আমি অন ডিউটি আছি। নাইট শিফটেও থাকবো। চিন্তা করিস না। খুব তাড়াহুড়ো করে ফোনটা কেটে দেয় অর্পিতা।

পাঁচ

— তুমি একাই এসেছ বাচ্চাকে নিয়ে? তোমার স্বামী আসেনি? তখনও হিয়ার দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে

নোংরা শাড়ি, ভাঙা শরীরের মা।

— না দিদি। আমার স্বামী, আমায় এই বাচ্চাশুদ্ধু বাড়ি থেকে বার করে দিলে। আমার একটা আট বছরের মেয়ে আছে। এ ছেলেটা আমার নয়।

আমাদের ঘরে দু'বেলা আসে। মাসী বলে ডাকে। এর বাবাটা জন্মের আগেই মরে গেছে। মা-টা কোনরকমে গায়ে গতরে খেটে চালাতো। আমপান না কি ঝড় এলো! এদের বাড়ি ঘর সব গেল। আমাদের দাওয়ায় এসে উঠলো। ক'টা দিন এভাবেই চলছিল। কারোরই খাওয়া জোটে না ভালো করে। এক রাতে মা-টা খুব কাঁদল দিদি। সকালে দেখি ছেলেটা আমার দাওয়ায় এমন করেই ঘুমিয়ে আছে। মা নেই। নেই তো নেই দিদি। সারাদিন কেটে গেল। সে ফিরলো না। এরপর সাতদিন কাটলো, তবু আর তার দেখা পেলাম না। সবাই এই ছেলেকে তাড়িয়ে দিতে বললে। পুলিশের কাছে খরব দিলাম। কোনও কাজ হল না। বর কতো মারলো। শাশুড়ি তিন দিন খেতে দিল না, মেয়ের সাথে কথা বলতে দিল না। তবু পারলাম না জানো! এই মণিকে ছাড়তে পারলাম না। মানুষ তো বলো! পাপ হবে না? কী করে ছাড়বো, বারান্দায় জলে ভিজে ভিজে ছেলেটার জ্বর এলো, ধুম জ্বর। দু'চারটে যা পয়সা ছিল, নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। কত হাঁটলাম কোলে করে।"

আর কথা বলতে পারছিল না ভাঙা শরীর। ক্লান্ত চোখ বুজে আসছিল জলে। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললো— ''ছেলেটাকে ভালো করে দাও গো দিদি, আবার ফিরে যাবো। মার খাবো। কাজ করবো, বর ঘরে নেয় নেবে, না নিলেও বা কি! মণিকে ছাড়বো না আমি। মানুষ হয়ে মানুষের এত ক্ষতি করতে পারবো না দিদি।" হিয়ার হাত-পা কাঁপছে। উচ্চশিক্ষিত, সরকারি চাকুরে, রবীন্দ্রসঙ্গীত জানা হিয়ার হাত পা কাঁপছে। ভীতু হিয়ার সমস্ত স্নায়ু বিদ্রোহ করছে। এতক্ষণ অপেক্ষার পর, দূরে সব সমস্যার সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসছে হিয়ার স্কুলের বাস। এখনই সবকিছু থেকে পালিয়ে চলে যেতে পারে সে। বাসটা স্টপেজে এসে দাঁড়াল। হিয়ার সমস্ত ভয় তাকে বাসের দিকে ঠেলছে। হিয়া ভাঙছে, ভিতরে ভিতরে অনেক কিছুকে ভাঙছে সে। হেডমাস্টারের কটূক্তিকে ভাঙছে, অনিমেষের উপেক্ষাকে ভাঙছে, মেয়ের নিরাপত্তাকে ভাঙছে, সবকিছুকে গুছিয়ে রাখার বদ-অভ্যাসকে ভাঙছে। হিয়ার ভয় করছে না। একটাই কথা শুধু কানে বাজছে। ''মানুষ তো বলো দিদি? পাপ হবে না?" একরাশ ধুলো উড়িয়ে চলে গেল দূরপাল্লার বাস। হিয়া ব্যাগ থেকে টিফিন বার করলো। হাসিমুখে বললো, ''হাত ধোও, এটা দু'জনে খাও।" এবার একটা ওলা বুক করতে হবে। হিয়া আজ এন.আর.এস-এ যাবে।□